মধুরাংশ

মধুরাংশ

* * *

শ্রী সুবোধ কুমার চক্রবর্তী

* * *

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৬৪

৪'৫০ ন. প. (চার টাকা পঞ্চাশ ন. প. মাত্র)

প্রচ্ছদপট :
পরিকল্পনায়—
সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
অঙ্কনে—
সুভাষ সিংহ রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত উষাকুমার দাস

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মাস্টারমশাই,

হাতের লেখার সঙ্গে সঙ্গে গল্প লেখাও শিখিয়েছিলেন। এই সত্যটুকু প্রকাশ করে দিয়ে আজ আনন্দ পাচ্ছি।

১৫ পিয়ার্স রোড,
লিলুয়া

স্নেহধন্য
সুবোধকুমার

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি।

—কালিদাস

সুন্দর নেহারি শুনি সুমধুর গান
উৎকণ্ঠায় শিহরে যে সুখতৃপ্ত প্রাণ।
অজ্ঞাত মিলন স্মৃতি জন্মান্তর হতে
ছুটে যেন অনাহত বাসনার পথে॥

—রবীন্দ্রনাথ

এই লেখকের লেখা

রম্যাণি বীক্ষ্য
রূপম্ ?

১

যমুনার তীরে দিল্লী শহর। কিন্তু তুফান এক্সপ্রেসে নতুন দিল্লী ছেড়ে যমুনার পোল দেখতে পেলুম না।

দিল্লীতে প্রথম যমুনা দেখেছিলুম ফিরোজ শাহ কোটলায় অশোক স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে। দূরে সেই জলস্রোত দেখেই ভয়ে শিউরে উঠেছিলুম। মামা তার আগেই যমুনার গল্প বলেছিলেন আমাদের : যমুনাকে ফাঁকি দিয়েই তো জ্ঞানশঙ্করের আজ এমন দুর্গতি।

ফাঁকি দিয়েছেন যমুনাকে ?

আমরা আশ্চর্য হলুম।

দিয়েছেই তো।

বলতে বলতে খোলা মাঠের মধ্যে মামা নেমে এলেন।

আমরাও এলুম। একটা চমকপ্রদ গল্প শোনবার আশায় সবাই তাঁকে ঘিরে বসলুম।

শিরশিরে হাওয়ায় বাউলির জল তখন কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমার বুকের ভেতরটাও কেঁপে উঠল। জ্ঞানশঙ্করবাবুর ভাগ্যের সঙ্গে নিজের জীবনটাকে যে হঠাৎ জড়িয়ে ফেলেছি, সেই কথাটাই তখন মনে পড়ে গেল।

রবিবারের সকালে আমরা দিল্লী ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। আমরা মানে রায়সাহেব অঘোর গোস্বামী এম. পি. বাঙলা দেশের জমিদার, মিসেস গোস্বামী আর তাঁদের মেয়ে স্বাতি। সঙ্গে আছে দিল্লীর ছেলে রাণা, কমার্স মিনিস্ট্রির নতুন অফিসার, আর তার বোন মিত্রা। কলকাতা থেকে আমি এসেছিলুম এলাহাবাদে, এখানে এসেছি বেড়াতে। রক্তের সম্বন্ধ নেই, তবু মামা। তাই অন্যত্র উঠি নি।

কিছুদিন থেকে পার্লামেন্টের সেসন চলছে। কাল কী একটা ছুটি ; তাই নিজের গাড়ি এনে রাণা আমাদের শহর দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। রয়ে বসে ধীরে সুস্থে দিল্লী দেখব। রাণার সঙ্গে আছে এক গোছা কাগজপত্র ম্যাপ গাইড-বই, মায় একখণ্ড 'দৃষ্টিপাত' পর্যন্ত। এই বাউলির ধারে মাটিতে বসে চা খেতে খেতে আমাদের প্রোগ্রাম তৈরী হবে।

যমুনা তো গঙ্গা নয় : মামা বললেন : যে সারা জীবন পাপ কাজ করে মরণকালে গঙ্গাযাত্রা করলেই সশরীরে স্বর্গলাভ হবে। যমুনা হলেন সূর্যের কন্যা আর যমের ভগিনী। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সংসারে কারও নিস্তার নেই। সেই যমুনাকে ফাঁকি দিয়েছে মূর্খ জ্ঞানশঙ্কর।

মামা উত্তেজিত হলেন। বললেন : কেন আজ তার বংশ লোপ পাচ্ছে? গোটা কয়েক ছেলেমেয়ে জন্মেই মারা গেল, সন্তানই হল না দ্বিতীয় পক্ষের। ভাইয়ের ছেলে পোষ্য নিল। সে বাঁচল না। উপযুক্ত সংসারী ছেলে আনল বোনের কাছে চেয়ে। অসুখ নেই বিসুখ নেই, টুপ করে একদিন মরে গেল।

আমার দিকে চেয়ে বললেন : এবারে তোমাকে ডেকেছে, তাই গোড়াতেই সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে।

মামী তাঁর ফ্লাস্ক আর খাবারের জায়গাগুলো চাকরের হাত থেকে সংগ্রহ করছিলেন, রাণা সুযোগ খুঁজছিল তার মানচিত্র খোলবার। এঁদের উপেক্ষা করেই মামা তাঁর গল্প শুরু করলেন।

তাঁদের যৌবনের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে গঙ্গা-যমুনার উৎস দেখতে বেরিয়েছিলেন দুই বন্ধুতে—তিনি ও জ্ঞানশঙ্করবাবু। কলকাতা থেকে এলাহাবাদে এলেন বন্ধুর কাছে, সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে দেরাদুন। তারপর মসুরী।

আমি হিমালয় দেখি নি। পাহাড় আমাকে টানে, পয়সার অভাব আমার প্রতিবন্ধক। শখ মেটাই ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে। বললুম : সেসব কথা আপনার মনে আছে কি আজও?

মামা তাঁর স্মৃতিশক্তির গর্ব করেন, বললেন: আছে বৈ কি! আজকের আনন্দ লোকে কাল ভুলে যায়। গভীর দুঃখও ভোলে মানুষে, তবে তার জন্যে সময় লাগে। কিন্তু হিমালয় ভোলা যায় না একবার দেখলে। এক সন্ন্যাসী একবার বলেছিলেন—জন্মান্তরেও তার স্মৃতি জেগে থাকে, আকর্ষণ করে চুম্বকের মত। ভগবান কোথায়? কে দেখেছে ভগবান? হিমালয়ের টানেই তো মানুষ সন্ন্যাসী হয়। নয়তো এই ঘোর বস্তুবাদের দিনেও এত সন্ন্যাসী কেন হিমালয়ের বুকে। এখানে ত্যাগ কোথায়? প্রাণ ভরে এখানে সবাই সৌন্দর্য ভোগ করছে।

'মনসা হিমালয়ং গচ্ছতি'—ব্যাকরণের উদাহরণ মুখস্থ করেছিলুম ছেলেবেলায়। আজ মামার দৃষ্টিতে সেই সত্য উপলব্ধি করলুম। মনে হল, তিনি আবার তাঁর যৌবনে ফিরে গেছেন। পিঠে ঝোলাঝুলি, হাতে লাঠি নিয়ে পাহাড় ভাঙতে শুরু করেছেন যমুনার উৎস সন্ধানে।

সে কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা! মসুরী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে ধরাসু গ্রাম, ভাগীরথী তীরে। মূলধারা নামে আর একটি ধারা এসে মিলেছে এখানে। কী অবিরাম তরঙ্গভঙ্গ, কী গভীর কলোচ্ছ্বাস! মানুষে মন্দিরে, নদীতে সঙ্গমে, পাহাড়ে পাইনে একটি মায়াচ্ছন্ন সুন্দর গ্রাম।

যমুনার দেখা পাওয়া যায় আরও পঁচিশ মাইল উত্তরে হেঁটে, গাঙ্গনানিতে। এই শস্যশ্যামল গ্রামখানি ঠিক যমুনার তীরেই। গাড়োয়াল রাজ্যের স্ত্রীপুরুষ কুৎসিত নয়, কিন্তু এমন রূপ বুঝি এ তল্লাটে নেই। এই শ্রী তাদের অন্তরেও খানিকটা প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষকে তারা শ্রদ্ধা করে, অতিথিকে ভাবে নারায়ণ।

যমুনোত্রী এখান থেকে মাইল চব্বিশেক। চার মাইল পথ বাকি থাকতে খরশালি গ্রামে রাত্রিবাসের বিধি। যমুনোত্রীর প্রচণ্ড শীতে রাত্রিবাস অসাধ্য বলেই বুঝি এমনি বিধি হয়েছে। পথে যমুনা

উত্তীর্ণ হতে হয় দুবার। খরস্রোতা যমুনার কলভাষণ এখানে শোনা যায় না, শোনা যায় গর্জন। নিচে খাদের ভেতর থেকে তার গর্জন গুমরে গুমরে ওপরে উঠে আসে। বেশ বর্ধিষ্ণু এই খরশালি গ্রাম। দোকানে বাড়িতে মন্দিরে ধর্মশালায়, সহায় (গাইড) ও পাণ্ডাতে সারাক্ষণ গমগম করছে।

এর পরের পথটুকু বুঝি স্বর্গের সিঁড়ি। সমস্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। চার মাইল পথ মনে হবে চারশো মাইল। কী কঠিন চড়াই, মানুষকে মনে হবে পিঁপড়ের মত দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠছে। আর পাহাড়ের শিখরে উঠেই কি পথের শেষ হয়? যমুনা বয়ে যাচ্ছে অনেক নিচে খাদের ভেতর দিয়ে। সেইখানে মন্দির আর ধর্মশালা। সেই পথহীন পাহাড় ভেঙে যমুনার তীরে নেমে দেখা গেল, ধর্মশালায় পৌঁছতে আবার খানিকটা চড়াই ভাঙতে হবে।

সমুদ্রতল থেকে এ স্থান প্রায় এগার হাজার ফুট ওপরে। চার পাঁচটি প্রবল ধারায় যমুনা প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। সেই অপ্রশস্ত ধারাগুলি পেরিয়ে যমুনোত্রীর ক্ষুদ্র মন্দির। গল্পের শেষে যেমন তার ক্লাইম্যাক্স, তীর্থের শেষে তেমনি মন্দির। ক্লাইম্যাক্স জানবার জন্যে আমরা গল্প.পড়ি, তেমনি মন্দির পৌঁছতে ভাঙি পথ নদনদী ও পর্বত। সত্যিকার রসিক যে, তার অন্য দৃষ্টি। শেষের পরেও সে আরও কিছু চায়। যমুনোত্রী পৌঁছেও মনে হবে, সবই যেন বাকি রয়ে গেল। মন্দিরের পেছনে ঐ যে চিরতুষারের রাজ্য, ঐশ্বর্য লুকনো আছে তারই দুর্গমতার ভেতর। মনে হবে, এখান থেকে ফিরে গেলে সে হবে একটা মস্ত পরাজয়।

যারা তীর্থলোভী, তারা পূজা ও শ্রাদ্ধাদি শেষ করে বেলাবেলি খরশালিতে ফিরে যায়। আমরা রয়ে গেলুম : বললেন মামা : মন্দিরের পূজারীর কাছে আশ্বাস পেয়েছিলুম আশ্রয়ের।

অল্প নিচে একটা গুহার ভেতর তিনি থাকেন। তার নিচে দিয়ে পাঁচ ছটি উষ্ণ জলধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এই শীতের রাজ্যে

পূজারীর গৃহকে বাসের উপযোগী করে যমুনার ধারার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে এই ধারাগুলো। আগুনে চাল সেদ্ধ করবার প্রয়োজন হয় না এখানে, কাপড়ে বেঁধে এই কুণ্ডের জলে ফেলে দিলেই তা ভাত হয়ে ভেসে ওঠে।

উত্তরে বরফের যে বিপুল বিস্তার, যমুনার ধারা তার তলা দিয়ে গলে আসছে। তুষারের ওপর দিয়ে মাইল খানেক এগিয়ে দেখা যায় যে, সামনের পাহাড় থেকে নেমেছে তিনটি জলধারা। মহাদেবের ত্রিশূলের মত তারাই মিলিত হয়ে পায়ের নিচের বরফের তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখতে পাওয়া যায় বন্দরপুঁছ পর্বতচূড়া আর তার পাশের চম্পা সরোবর। এই হ্রদেই জন্ম নিয়েছে কালিন্দী যমুনা।

মামা বললেন: রাতে আমরা পূজারীর গুহাতেই আশ্রয় পেলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল সারাদিন। এবারে পেঁজা তুলোর মত তুষার পাত শুরু হল। বাইরে নিস্তব্ধ নির্জন পৃথিবী। দেবাদিদেবের ডমরুর মত যমুনার গর্জন আসছে গুহার ভেতর। আগুন জ্বেলেছেন ভক্ত পূজারী। মনে হল জগতে বুঝি এমন আরামের বাসস্থান আর নেই।

মামী তখন পেয়ালায় ঢেলে ঢেলে চা এগিয়ে দিচ্ছিলেন। একটা পেয়ালা হাতে আসতেই মামা যেন জেগে উঠলেন। ঘন ঘন চায়ে কয়েকটা চুমুক দিয়ে বললেন: সকালে উঠে জ্ঞানশঙ্কর কী বলেছিল জান?

নিজেই উত্তর দিলেন। বললেন: তার স্বপ্নের কথা বলেছিল আমাদের। দেখেছিল যমভগিনী যমুনা তার সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। দুহাত বাড়িয়ে কিছু চাইছেন তার কাছে। এই স্বপ্নের কথা শুনে অভিভূত হয়েছিলেন সেই গাড়োয়ালি ব্রাহ্মণ পূজারী পণ্ডিত। বলেছিলেন, প্রয়াগে তোমার বাড়ি। যদি কখনো সন্তান হয়, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে তোমার প্রথম সন্তান উপহার দিও।

আবার খানিকটা চা খেলেন মামা, তারপর বললেন: জ্ঞানশঙ্কর কিছুই দেয় নি আমি জানি। পূজারীর কথা শুনে সেদিন সে হেসেছিল, তার স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে আজও সে হাসে। লোকটা নাস্তিক নয়। বেশি পড়াশুনো করে সংস্কারে বিশ্বাস হারিয়েছে।.

বুঝলে গোপাল: মামা আমার দিকে চাইলেন: বিশ্বাসে যুক্তি নেই, কিন্তু সুখ আছে। গভীর দুঃখের দিনেও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে খানিকটা শান্তি পাওয়া যায়। ভগবানের প্রয়োজন তাই কোনদিন ফুরবে না।

আমি ভাবছিলুম অন্য কথা। সংস্কারে বিশ্বাস যদি তাঁর এতই প্রবল তবে কেন আমায় নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছেন! জ্ঞানশঙ্করবাবুকে আমার সন্ধান তো তিনি নিজেই দিয়েছেন, নিজেই আমাকে ডেকে এনেছেন কলকাতা থেকে। এক অপরিচিত আত্মীয়ের পোষ্যপুত্র হতে আমি তো তাঁরই আগ্রহে স্বীকৃত হয়েছি। তবে কি—

হয়তো তাই। আমার ঔদ্ধত্যেরই শাস্তি দিচ্ছেন। আমি তাঁর নকল ভাগনে। তাঁর পাতানো দিদির ছেলে। একসঙ্গে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করে এসে আমি তাঁর অনুগ্রহ নিয়ে বড় হতে অস্বীকার করেছি। কিন্তু তার জন্যে দায়ী কে? ঐ যে মেয়েটা নিঃশব্দে স্যাণ্ডুইচ চিবোচ্ছে, সে-ই কি আমায় বারণ করে নি? সেদিন সে-ই কি আমায় সাহায্য করে নি মামার প্রলোভনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে? আজ সে-ও যেন দূরে সরে দাঁড়িয়েছে।

রাণা তখন তার গাইড-বই খুলে বসেছে আর মিত্রা গল্প শুরু করেছে স্বাতির সঙ্গে। আমার মনে পড়ল কন্যাকুমারীর কথা।

কোজাগরী পূর্ণিমার আগের রাতে সমুদ্রতটের বড় পাথরখানার ওপর বসে ছিলুম। এক সময় অলক্ষিতে স্বাতি আমার পাশে এসে বসেছিল। কথা হয়েছিল অপ্রয়োজনীয় অনাবশ্যক। সেদিনের অত জল অত আলো, অমন আকাশ অমন অসীম উদার পরিবেশের

ভেতরেও স্বাতি নিজেকে হারাতে পারে নি। বলেছিল: 'গোপালদা, একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে। দেশে ফিরে বাবার অনুগ্রহ নিয়ে নিজেকে ছোট কোরো না।'

আমি তার উত্তর দিই নি, কিন্তু অনুরোধ রক্ষা করেছি। মামার জমিদারী গেল, কিন্তু ব্যবসা আছে। সেই ব্যবসায় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিতে চেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন, আমার দশটা-পাঁচটার খাতা লেখা বন্ধ হলে সম্বন্ধটা আরও ঘনিষ্ঠ করা যেতে পারে।

আমি রাজী হই নি। মামা তাতে শুধু ক্ষুব্ধই হন নি, অপমানিতও বোধ করেছিলেন। বলেছিলেন: গোপাল, এ তোমার দোষ নয়, তোমার পৈতৃক গুণ। তোমার বাবাও আমায় উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু কেন করেছিলেন তা কোনদিন বলেন নি।

আমি জানি, স্বাতি খুশী হয়েছিল সেদিন। তার চোখের দৃষ্টিতে মনের পরিচয় পেয়েছি খানিকটা। খুশিতে সিক্ত একটা কোমল মনের মৌন পরিচয়। মনে হয়েছিল এমন পাওয়া বুঝি কখনো পাই নি আগে।

এবারে দিল্লীতে অন্য এক স্বাতিকে দেখছি। নতুন এক স্বাতি—পুরনো পরিচয়ের কোন বালাই সঙ্গে আনে নি। নীরব থেকে অস্বীকার করছে আমাদের অতীতটাকে। কেন করছে, এই সত্যটুকু জেনে নেবার সুযোগ এখনো পাই নি।

মনে হয়েছিল তার বিয়েটা ভেঙে গিয়ে সে সুখী হয়েছে, সুখী হবারই কথা। মনে পড়ছে, সে-ই একদিন আমায় বলেছিল যে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে যে লোক, তাকে সে মানুষ ভাবে না। লোকটা আট বছর বিলেতে কাটিয়েছে, মনুষ্যত্ব বিকিয়ে সাহেবিআনা এনেছে সেখান থেকে। তার সহধর্মিণীর প্রয়োজন নেই, আছে সঙ্গিনীর—আর সে প্রয়োজনটাও নিতান্ত জৈব। কেন বিয়েটা ভাঙল, সে খবরও আমি জানতে পারি নি।

রাণা তখন বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছে। খসখস করে কী সব

টুকে ফেলছে তার চামড়ার নোট বুকে। চশমার ফাঁক দিয়ে সেদিকে একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে মিত্রা বলল: দাদার জন্যেই আজ এলুম। কিছুতেই ছাড়ল না। নইলে দিল্লী আমরা একশো আটবার দেখেছি।

দিল্লী আমরাও দেখেছি: স্বাতি জবাব দিল: গোপালদা কিন্তু না দেখেও হয়তো আমাদের চেয়ে বেশি জানে।

মিত্রা আড় চোখে আমায় একবার দেখে নিয়েই মৃদুস্বরে একটা বক্রোক্তি করল, বলল: কলকাতার একজন হিরো বলে শুনেছি।

কথাটা আমার কানে যাবে জেনেই যে বলেছে তাতে সন্দেহ নেই। চোখ ফিরিয়ে দেখলুম, স্বাতির শাদা কানের ডগা হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

মিত্রাদের সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র একটি সন্ধ্যার। আমি দিল্লীতে নেমেছিলুম পরশু বিকেলে, আর কাল সন্ধ্যায় এরা বেড়াতে এসেছিল। বৃটিশ আমলের দুঁদে সিভিলিয়ান ব্যানার্জি সাহেবের পুত্রকন্যা, রাণা ও মিত্রা। মামার পুরনো পরিচিতও বটে। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই বেড়াতে এসেছিল নর্থ অ্যাভেন্যুর সরকারী কোয়ার্টার্সে। মিত্রা খুশী হয় নি, কিন্তু ভাল লেগেছিল রাণার।

দিল্লী দেখেন নি, গোপালবাবু? আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব।

বলে তাকিয়েছিল স্বাতির দিকে।

কাল রবিবার, কালই ব্যবস্থা করা যাক, কী বলেন? আমার ছোট গাড়ি, কাল বাবার নতুন গাড়িটাই নিয়ে আসব। সবাই মিলে পা ছড়িয়ে বসলেও অনেক জায়গা থাকবে।

রাণার উৎসাহেই এই দিল্লী দেখার ব্যবস্থা। সেই আমাদের গাইড, সেই আমাদের গার্ডিয়ান। তার কাজ শেষ হলেই আমাদের উঠতে হবে।

এক সময় হলও তার কাজ শেষ। তারপর পকেটে কলম গুঁজে এক চুমুকে নিঃশেষ করল ঠাণ্ডা চা-টুকু।

এখনও হয় নি আপনাদের ?

কথাটা আমাকেই বলল। আমিই আর একটু চা চেয়ে নিয়েছিলুম মামীর কাছ থেকে।

মামী তখন সব গুছিয়ে তুলছিলেন। তাড়াতাড়ি চা-টুকু গলাধঃকরণ করে পেয়ালাটা আমি ফিরিয়ে দিলুম।

ধীরে সুস্থে পাইপ ধরিয়ে মামা ওঠবার চেষ্টা করলেন। পেছনে একটা হাত দিয়ে বেশ একটু কসরৎ করেই উঠে দাঁড়ালেন।

দুপুরে বাড়ি ফিরেই খাওয়া যাবে: বলে মামী জিনিসপত্র শুদ্ধ চাকরকে ছুটি দিলেন।

রাণার সঙ্গে মিত্রা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। স্বাতি ইশারায় আমায় পিছিয়ে পড়তে বলল। তারপর ভর্ৎসনার সুরে বলল: তোমার কি ইজ্জৎ জ্ঞান কোনদিন হবে না গোপালদা ?

আশ্চর্য হয়ে বললুম: কেন, বল তো ?

তাও আমায় বলে দিতে হবে: ক্ষুব্ধ স্বরে স্বাতি জবাব দিল: তুমি নিজে কিছুই বুঝতে পার না ?

মিত্রার মন্তব্যটুকু যে তার ভাল লাগে নি, তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু তার নেপথ্যের ঘটনা আমার জানা নেই। তাই চুপ করে রইলুম।

স্বাতিও তার অনুযোগটুকু জানিয়ে ফেলল, বলল: কাল নিজের পরিচয়টা অমন ফলাও করে দেবার কী দরকার ছিল।

দরকার ছিল না মানি, কিন্তু ঐটুকুই তো আমার অহংকার। মিত্রা আমার পরিচয় চায় নি, কিন্তু তার দৃষ্টিতে সেই কৌতূহল দেখেছিলুম। তাই নিজেই আমার পরিচয় দিয়েছি—নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। আপনার বলতে দুনিয়ায় কেউ কোথাও নেই। উত্তরপাড়ায় একখানা ভাড়াটে ঘর আছে, আছে নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন, আর ডালহৌসী

স্কোয়ারে আছে সারি সারি টেবলের ভেতর একখানা কাঠের চেয়ার।

অট্টহাস্য করেছিল দিল্লীর অফিসার রাণা, মিত্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আরও একটু ধার দেখেছিলুম যেন। সকলের পেছনে চলতে চলতে স্বাতি আমায় সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিল।

নিজের ত্রুটি মেনে নিয়ে বললুম : এবারে কী করতে হবে বল।

কঠিন ভাবে স্বাতি বলল : পাঁচজনের মান নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই, এইটুকুই তোমায় জানিয়ে দিলুম।

বলে তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে গেল।

২

আমরা যখন এগিয়ে এলুম, রাণা তখন মামা-মামীকে অনেক কিছু শুনিয়ে ফেলেছে। ফিরোজ শাহ কোটলার অশোক স্তম্ভের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। কাছে আসতেই পাকা গাইডের মত বক্তৃতা শুরু করল। বলল : এই রকমের অশোক স্তম্ভ ফিরোজ শাহ দিল্লীতে দুটো এনেছিলেন। মীরাট থেকে যেটা আনেন, সেটা আছে সব্জিমণ্ডির কাছে 'রিজের' ওপর। তার গায়ে উৎকীর্ণ লেখা এখন আর ভাল পড়া যায় না। ফিরোজ শাহ এই স্তম্ভটি এনেছেন আম্বালা জেলার টোপরা থেকে।

বাধা দিয়ে আমি বললুম : টোপরা না খিজিরাবাদ ?

রাণা চট করে একখানা বইয়ের পাতা উল্টে দেখে বলল : খিজিরাবাদ তো নয়, টোপরাই বলেছে এই বইয়ে।

তারপর বলল : এই প্রাসাদ দুর্গ কোটলা নির্মাণ করেন তেরশো চুয়ান্নতে। এর ভেতর স্তম্ভটি কেমন উঁচু করে বসিয়েছেন দেখুন।

চশমার ফাঁক দিয়ে মিত্রা আমায় একবার দেখে নিল। আমি চুপ করে গেলুম। প্রতিবাদ করবার মত জ্ঞান আমার ছিল না।

উঁচু উঁচু ধাপ বেয়ে সাবধানে আমরা ওপরে উঠলুম। ব্রাহ্মী অক্ষরে অশোকের অনুশাসন লেখা আছে স্তম্ভের গায়ে। আজ তা পড়ার মত বিদ্যা আমাদের নেই। আমরা তাই যমুনার নীলধারা দেখলুম। ঝির ঝির করে বাতাস আসছিল সেই দিক থেকে, হঠাৎ শিউরে উঠল দেহটা।

রাণা তখন পাশের মসজিদের ভগ্নাবশেষ দেখাচ্ছিল সবাইকে। সেই দিকেই নিবদ্ধ ছিল সকলের দৃষ্টি। শুধু স্বাতি আমায় লক্ষ্য করেছে, আর লক্ষ্য করেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মসজিদের দিকে।

ওপর থেকে নেমে আসবার সময় রাণা বলল: সাতরাজার রাজধানী দিল্লী, ফিরোজ শাহ কোটলা তার ভেতর পঞ্চম।

পায়ের দিকে দৃষ্টি রেখে সাবধানে নামছিলেন সবাই। একেবারে নিচে নেমে এসে স্বাতি প্রশ্ন করল: প্রথম চারটে রাজধানী কি আরও অনেক পুরনো দিনের?

স্বাতির আগ্রহ দেখে রাণা খুশী হল, বলল: সবই প্রায় সমসাময়িক। প্রথম রাজধানী পৃথ্বিরাজের মেহরৌলিই যা একটু পুরনো, তার সময় হল দ্বাদশ শতাব্দী। এরপর আলা-উদ্-দীন খিলজী সিরিতে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীতে তৃতীয় রাজধানী হল ফিরোজাবাদ। তারপর পাগলা রাজা যে রাজধানী স্থাপন করলেন, তার নাম হল জাহান পন্না।

একটু যেন গোলমেলে ঠেকল আমার, বললুম: হিসেবে একটু ভুল হল না রাণাবাবু? ফিরোজ শাহ তুঘলুকই তো ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠাতা। এই কোটলা নির্মাণের গৌরব তাঁকেই দিতে হলে ফিরোজাবাদকে দিল্লীর তৃতীয় রাজধানী বলা চলে না।

চলতে চলতে সবাই আমার মুখের দিকে চাইলেন। আরও একটু বুঝিয়ে বললুম আমার কথাটা: ফিরোজাবাদের প্রতিষ্ঠাতা

যে ফিরোজ শাহ, তাঁরই প্রাসাদ এই কোটলা। কাজেই আপনার হিসেব মত এই স্থান যদি পঞ্চম রাজধানী হয়, তা হলে তৃতীয় রাজধানী ছিল অন্য কোন স্থান।

এবারে রাণা একটু বিচলিত হল। বলল: ঠিকই তো!

তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে। তার বইয়ের পাতা উল্টে গেল অনেকগুলো। দৃষ্টিপাত করল খানকয়েক পাতার ওপর। তারপর সেখানা বন্ধ করে একখানা ইংরেজী গাইড-বই খুলল।

একটু গোলমেলে লাগছে ব্যাপারটা।

অকপটে স্বীকার করল রাণা।

বললুম: আমার কী মনে হয় জানেন? আলা-উদ্-দীন খিলজী ও পাগলা রাজা মুহম্মদ তুঘলুকের মাঝখানে ছিলেন ঘিয়াস-উদ্-দীন তুঘলুক, তাঁর রাজধানী তুঘলুকাবাদই দিল্লীর তৃতীয় রাজধানী।

রাণা যেন লাফিয়ে উঠল, বলল: ঠিক বলেছেন আপনি। কুতব মিনার থেকে সূর্যকুণ্ড যাবার পথে রাস্তার বাঁয়ে সেই তুঘলুকাবাদ। মাইল সাতেক জুড়ে সেই জায়গাটা। শুনেছি সেখানে নাকি ভারি দেয়ালে ঘেরা ছিল রাজপ্রাসাদ আর শয়ে শয়ে বাড়ি আর মসজিদ।

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: শেষ দুটো রাজধানীর কথা কিছু বললেন না?

এ-কথার জবাব দিল মিত্রা। বাঁ হাতের পুড্‌লটাকে ডান হাতে নিয়ে বলল: চলতে ফিরতে দুবেলা সে-দুটো দেখতে পাচ্ছি—পুরনো দিল্লী শাহজাহানাবাদ আর আমাদের নতুন দিল্লী।

মিত্রার দৃষ্টিতে সেই দৃপ্ত ভঙ্গীটি আবার দেখতে পেলুম। কাল সন্ধ্যে বেলায় মামার বসবার ঘরে তার এই ভঙ্গীটি প্রথম লক্ষ্য করেছিলুম। অনেকক্ষণ ধরে মামী তার হাতের কুকুরটা লক্ষ্য করছিলেন। ফর্সা ধবধবে হাতের কব্জির ওপর তার চেয়েও ফর্সা

একটি জীব। নীল চোখ দুটো মেলে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দেখছে।

খাসা বেরালের বাচ্চাটি তো!

মামী হঠাৎ বলেই ফেললেন তাঁর মনের কথাটা। মিত্রা হাসল। সেই হাসিতে দেখলুম তার ঐ ভঙ্গীটি।

এমন কুকুর স্বাতিও বোধ হয় আগে কখনো দেখে নি। কিন্তু বেরাল যে নয়, তা বুঝতে পেরেছিল। লজ্জা পেল মায়ের প্রশ্নে। মানুষ অনেক কিছুই জানে না, তার জন্যে কারও এতটুকু লজ্জা নেই। কিন্তু আর কেউ যখন সেই অজ্ঞানতা দেখে কৃপা প্রকাশ করে, তখনই আসে লজ্জা। মিত্রার চোখে সেই ভাবটিই বোধ হয় ফুটে উঠেছিল, তাই মামীও লজ্জা পেলেন।

আমি বললুম: ওটা কুকুর মামীমা। চীনা পুড্‌ল্‌ দেখেছেন, ওটা পকেট পুড্‌ল্‌।

ওমা, ওটা কুকুর নাকি! খরগোশ গিনিপিগ বললেও যে লোকে বিশ্বাস করবে!

মিত্রা আরেকটু হেসে বলল: এ জাত এর চেয়ে বড় হয় না।

বলে ব্লাউসের গলায় তাকে ঝুলিয়ে দিল।

রাণা তখন প্রবল উৎসাহে মামার সঙ্গে গল্প শুরু করেছে। বলছে: কদিন থেকেই বাবা আসব আসব করছেন, কিন্তু অফিস থেকে ফিরতে রোজই দেরী হয়ে যায়। যা কাজ! সাহেবরা চলে যাবার পর অফিস একেবারে তছনছ হয়ে গেছে। এ গভর্নমেণ্ট আর বেশিদিন চলবে না। পুরনো লোক বলতে তাঁরাই কয়েকজন আছেন, তাঁরা অবসর নিলেই অফিস বন্ধ।

পাইপে খানিকটা ধোঁয়া উদ্গীরণ করে মামা বললেন: তা বটে।

রাণা বলল: আমরা তো নিজের চোখেই এসব দেখতে পাচ্ছি, বাইরের লোকও আজকাল স্বীকার করছেন।

মামা গভীর ভাবে মাথা দোলাতে লাগলেন।

রাণা বলল : আমার আর কতদিনের চাকরি বলুন। তবু ভাগ্যি যে বৃটিশের শেখানো অফিসার এখনও দুচারজন আছেন, তাঁদের কাছেই কিছু কাজকর্ম শিখতে পাচ্ছি। তাঁরা না থাকলে তো চোখে অন্ধকার দেখতুম।

বলে স্বাতির দিকে তাকাল।

মিত্রার দৃষ্টিতে বুঝি খানিকটা ভর্ৎসনা দেখলুম। তার দাদার বাচালতায় বিরক্ত হয়েছে, এমনি ভাব। রাণা তা লক্ষ্য করেও বিচলিত হল না। আমার দিকে ফিরে বলল : গোপালবাবু কাল এসেছেন, তাই না?

ঠিক তাই।

সংক্ষেপে আমি জবাব দিলুম।

কোন্ পথে এলেন? মথুরা হয়ে, না আলিগড়ের ওপর দিয়ে?

বললুম : বৃন্দাবন থেকে।

বলেন কি : রাণা যেন লাফিয়ে উঠল : এই বয়েসে বৃন্দাবনে নেমেছিলেন নিজের ইচ্ছেয়?

হেসে বললুম : প্রাণের টানে। দ্বাপরে যেখানে লীলা করেছিলুম সেই স্থানগুলো আবার দেখে এলুম।

মিত্রা কঠিন দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে। বুঝতে না পেরে রাণা বলল : সেকি কথা।

আমি যে গোপাল।

আমি উত্তর দিলুম।

সকলের হাসি ছাপিয়ে গেল মামার অট্টহাসি। শুধু মিত্রাকে হাসতে দেখলুম না। সে তার কাঁধ থেকে ঝোলানো চামড়ার থলিটা একবার কোলের ওপর টেনে নিল। একখানা রুমাল বার করে মুছে নিল তার নাকের পাশ দুটো।

আমি হাসি নি, তাই অবসর পেলুম তাকে ভাল করে লক্ষ্য

করবার। থলির ভেতর রুমালখানা পুরে যখন সকলের দিকে চাইল তখনও এই ভঙ্গীটি দেখেছিলুম তার কঠিন দৃষ্টিতে।

গাড়িতে বসে মামা বললেন: এবারে গোপাল কিছু বল।

আমি লজ্জা পেলুম। বললুম: রাণাবাবুর মত পাকা গাইড থাকতে আমি কী বলব বলুন!

মামা অব্যাহতি দিলেন না, বললেন: তোমার কিছু বলবার নেই, এমন হতেই পারে না।

আমি রাণার সঙ্গে সামনে বসে ছিলুম। মামা বসে ছিলেন পেছনে, মেয়েদের সঙ্গে। ফিরে একবার তাঁর মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলুম। আমার সঙ্গে যে তিনি পরিহাস করছেন না তা জানি, স্বাতির চোখেও খানিকটা আগ্রহ দেখলুম। গাড়ি চালাতে চালাতে রাণা বলল: কুতব মিনার এখান থেকে অনেকটা পথ। বলুন না কিছু!

ভাবতে গিয়ে আমার মন গেল অতীতের দিকে, পৃথ্বিরাজের যুগ ডিঙিয়ে অনঙ্গপালের যুগে, দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টম শতাব্দীতে। যদুকুলের শাখা তোমর বংশ। সেই বংশের প্রথম অনঙ্গপাল এলেন ইন্দ্রপ্রস্থের পোড়া মাটির দেশে। ৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের রাজধানী। একান্তভাবে হিন্দুর নগরী। তাঁর উত্তর পুরুষেরা চলে গিয়েছিলেন কনৌজ, কিন্তু দ্বিতীয় অনঙ্গপাল একাদশ শতাব্দীতে আবার দিল্লীতে ফিরে এলেন। এই বংশের রক্ত ছিল পৃথ্বিরাজ চৌহানের দেহে। দিল্লীকে দুর্ভেদ্য করবার জন্যে তিনিই নির্মাণ করেছিলেন কিলা রায় পিথোরা। কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা তখন হিন্দুর প্রতি বিমুখ হয়েছেন, তাই গাড়বাল-রাজ জয়চন্দ্রের কন্যার পাণিগ্রহণ করেও পৃথ্বিরাজ তাঁর আনুকূল্য পেলেন না। কখন কী কারণে তাঁদের বিবাদের সূত্রপাত হয়, ঐতিহাসিকেরা তার কারণ খুঁজে পান নি। শোনা যায়, জয়চন্দ্র তাঁর রাজধানী কনৌজে এক রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই সভাতেই তাঁর কন্যা

সংযুক্তার স্বয়ংবরের ব্যবস্থা হল। ভারতের সমস্ত রাজা এলেন চারিদিক থেকে। নিমন্ত্রণ ছিল না শুধু পৃথ্বিরাজের। জয়চন্দ্র তাঁর পাথরের প্রতিমূর্তি গড়িয়ে দ্বাররক্ষিরূপে স্থাপন করলেন। আর রাজকন্যা সংযুক্তা সেই মূর্তির গলাতেই দিলেন বরমাল্য। ছদ্মবেশী পৃথ্বিরাজ সেইখান থেকেই তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেলেন। ভারতের ইতিহাস লিখতে বসে অনেকে আজ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে জয়চন্দ্রের সাহায্য পেলে পৃথ্বিরাজ হয়তো তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধেও শিহাব্-উদ্-দীনকে পরাজিত করতে পারতেন। মুসলমান একদিন আসত, কিন্তু অত শীঘ্র ভারত পরাধীন হত না।

আমি এই গল্প শোনালুম সবাইকে, শোনালুম যমুনার তীরে ভারতের প্রথম রাজধানীর গল্প, রাজা যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের কথা। খাণ্ডব বন দাহন করে পঞ্চপাণ্ডব প্রতিষ্ঠা করলেন জগতের শ্রেষ্ঠ নগর ইন্দ্রপ্রস্থ। হুমায়ুন যেখানে নির্মাণ করেছেন তাঁর পুরানা কিলা, সেইখানে ছিল পাণ্ডবদের সভামণ্ডপ। আজও পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও দেশ এমন সভা তৈরি করে নি, স্বপ্নেও ভাবে না তৈরি করার কথা। মহাভারতের সভা পর্বে এই মণ্ডপের বর্ণনা আছে। পাঁচ হাজার হাত বিস্তৃত সভায় চারিদিকে ছিল বহুলচিত্রান্বিত রত্নের প্রাচীর আর তার ধারে ধারে সোনার গাছ। নিচে স্ফটিকের সোপান আর শিলাপট্টের বদ্ধ বেদী, উপরে যেন মেঘাবৃত আকাশ। পুষ্পিত বৃক্ষ ছিল, ছিল হংস-চক্রবাক-মুখর কুমুদ-কহ্লার-কীর্ণ স্বচ্ছ জলাশয়। কৃত্রিম পুষ্করিণীও ছিল একটি। তাতে মণির মৃণাল আর বৈদূর্যের পত্র-শোভিত কাঞ্চনকমল। সৌরভ-আকুল মন্দবায়ে আন্দোলিত জলের মধ্যে মৎস্য ও কূর্মের ক্রীড়া দেখে দুর্যোধনের মত অভিজ্ঞ রাজাও ভ্রমে পড়েছিলেন। সভা থেকে ফিরে এসে নিজের অপমানের কথা ব্যক্ত করেছিলেন পিতা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। কৃত্রিম সরোবর দেখে বস্ত্র উৎকর্ষ করেছিলেন, আর শিলাভ্রমে প্রকৃত জলাশয়ে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছিলেন। দেওয়ালকে দ্বার ভেবে রক্তাক্ত করেছিলেন

তুঘলুকবাদ, দিল্লী

মধুরাংশচ
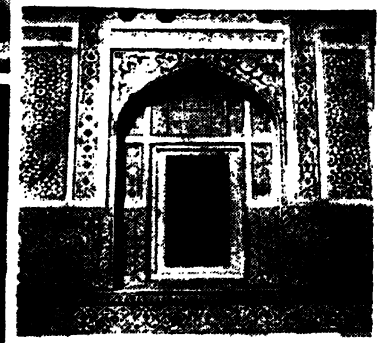
নিজের ললাট, আর পাণ্ডবের শয়ন নিতে হয়েছিল প্রকৃত দ্বারোদঘাটনের জন্য। আরও একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে দেখা যাবে যে, এই সভামণ্ডপ শুধু রত্নালোকিতই ছিল না, তাপ-নিয়ন্ত্রিতও ছিল। সদা উজ্জ্বল সদা স্নিগ্ধ সভামণ্ডপ। ময় দানবের মত ইঞ্জিনিয়ার পৃথিবীতে আজও বোধহয় জন্মায় নি।

দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের একটা সহজাত শ্রদ্ধা আছে; খানিকটা দুর্বলতাও। মনের এই কোমল বৃত্তিটুকুর পুরোপুরি সুযোগ নেবার চেষ্টা করেছিলুম। পেছন ফিরে দেখলুম, খানিকটা বোধ হয় সফল হয়েছি।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। মিত্রা তার চশমা-জোড়া পেছন দিকে একবার ঠেলে দিয়ে বলল: এসব কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

কোন চিন্তা না করেই জবাব দিলুম: করি।

মিত্রার ঠোঁটের কোণে একরকমের অদ্ভুত হাসি দেখলুম। শুধু অবিশ্বাসের হাসি নয়, শিক্ষা পেয়েও আমার কুসংস্কার যে ঘোচে নি, তারই ইঙ্গিত পেলুম সে হাসিতে। মিত্রা কথা না বলেই যেন আমায় বেশি অপমান করল।

পেছন ফিরে সবাইকে আমি একবার দেখে নিলুম। আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল স্বাতি। মনে হল, তার মনের কথাটি যেন আমি পড়তে পেরেছি। বললুম: বেশিদিন নয়, একশো বছর আগে বাহাদুর শাহ বাদশাহর দরবারে সভাকবি ছিলেন আমার এক পূর্বপুরুষ; এক সময় হিন্দুর রামায়ণ শোনার শখ হল বাদশাহর, মুখে মুখে তিনি রামায়ণের অনুবাদ শোনাতে লাগলেন। যেদিন পুষ্পক রথের গল্প তাঁকে বললেন, রাবণ বধের পর রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে সানুজ সানুচর আকাশপথে ফিরলেন অযোধ্যায়, নাক সিঁটকে বাদশাহ বললেন, গাঁজা। সেদিন রামেশ্বরমে স্বাতিকে যখন আমি এই বাদশাহর গল্প বলছিলুম, স্বাতি এই অবিশ্বাসের কথা শুনে

বলেছিল, গাঁজা। অর্থাৎ আকাশে ওড়া যায় না, কী করে বাদশাহ এ কথা ভাবতে পারল।

রাণা বলল: ঠিকই তো। এমন বেকুব বাদশাহর কথা তো আমি শুনি নি।

হেসে বললুম: শুনবেন কোত্থেকে, এ আমার বানানো গল্প।

মামা হেসে উঠলেন। মিত্রার চোখের দৃষ্টি আরও একটু কঠিন হল।

৩

রাণা গাড়ি চালায় ভাল। জনবিরল প্রশস্ত রাস্তার ওপর দিয়ে হাওয়ার মত উড়িয়ে নিয়ে এল কুতব মিনারে। গাড়ি থেকে নেমেই স্বাতি আমায় আক্রমণ করল। রাণার দিকে চেয়ে বলল: সারা রাস্তা ধরে দীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিলেন গোপালদা। কিন্তু আসল কথাটাই জানা গেল না।

প্রচুর কৌতূহল নিয়ে রাণা তার মুখের দিকে তাকাল।

স্বাতি বলল: ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে শুরু করে নয়া দিল্লী পর্যন্ত অনেকগুলো নাম শোনা গেল এই জায়গাটার, কিন্তু দিল্লী নামটা কবে কোথা থেকে এল, সে পরিচয় তো পেলুম না।

সত্যিই তো!

রাণা তখুনি কথাটা মেনে নিল। বলল: খুব ইনটেলিজেণ্ট প্রশ্ন করেছেন, ইণ্টারেস্টিংও বটে। আমার মাথায় আজও এ প্রশ্ন আসে নি।

বলেই তার বইয়ের পাতা উল্টোতে শুরু করল।

মিত্রা তার পকেট পুড্‌ল্‌টাকে ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলল: ওতে নেই।

অ্যাঁ, নেই এতে ?

দুর্ভাবনায় যেন দমে গেল রাণা।

দিল্লী—দিল্লী : রাণা সশব্দে ভাবতে লাগল : যতদূর মনে পড়ছে, ইতিহাসের গোড়া থেকেই তো দিল্লী নাম।

এগোতে এগোতে মামা বললেন : গোপাল কী বল ?

আমি আবার লজ্জা পেলুম : আমায় কি আপনি এনসাইক্লপিডিয়া পেয়েছেন ?

কথা না বলে তিনি হাসলেন একটুখানি।

সেই হাসিটুকু লুফে নিয়ে স্বাতি বলল : নিজেকে তো তুমি সবজান্তা ভাব, চুপ করে রইলে কেন।

স্বাতির মুখে এমন ব্যঙ্গ আমি আশা করি নি। তবু হাসলুম। হেসে বললুম : যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

মানে ?

ঘাড় ফিরিয়ে স্বাতি আমায় প্রশ্ন করল।

বললুম : ঠিকই বলছি। শ্বাস থাকতে হার স্বীকার করব না, এই আশটুকু দিনে দিনে বাড়িয়েই এনেছি। একে আমার অহংকার বললে আমি একটুও আপত্তি করব না।

কথা না বলে মিত্রা কঠিন ভাবে আমার মুখের দিকে চাইল। রাণা বলল : ঠিকই বলেছেন আপনি, সামান্য কারণে কেন হার স্বীকার করবেন।

তখন আমরা কুওও-ও-তুল ইসলাম মসজিদের আঙিনায় পুষ্করণ-রাজ চন্দ্রবর্মণের লৌহস্তম্ভের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। একেবারে খাঁটি লোহার স্তম্ভ। তেইশ ফুট আট ইঞ্চি উঁচু আর ব্যাস ষোল ইঞ্চি। দেড় হাজার বছরের রোদে জলেও এতটুকু মরচে পড়ে নি কোনখানে।

আমি হেসে বললুম : "কিল্লি তো ঢিল্লি ভই।

তোমর ভয় মত হিল।"

মামাবাবু বললেন : সে আবার কী ?

মিত্রা শুধু কটমট করে চাইল আমার দিকে।

বললুম : কিল্লি মানে স্তম্ভ তো ঢিল্লি মানে ঢিলে রয়ে গেল। তোমরের ইচ্ছে আর পূর্ণ হল না। এই তোমর আমাদের কানিংহাম সাহেবের প্রথম অনঙ্গপাল যিনি ৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে ইন্দ্রপ্রস্থের শ্মশানের ওপর আজকের দিল্লী নির্মাণ করেন। এঁদের বংশপরম্পরায় যে প্রবাদ চলে আসছে তাতে জানা যায় যে ব্যাসদেব রাজাকে এই স্তম্ভের কথা বলেন। বলেন, এর দৃঢ়তার ওপরই রাজলক্ষ্মীর অচলতা নির্ভর করছে। তাঁরই কথায় পঞ্চাশফুট দীর্ঘ এই স্তম্ভটি অতি যত্ন সহকারে মাটিতে পোঁতা হল। পরীক্ষা করে ব্যাস বললেন যে চমৎকার পোঁতা হয়েছে, স্তম্ভের পাদমূল একেবারে বাসুকির মাথায় গিয়ে ঠেকেছে। স্তম্ভ অচল এবং রাজলক্ষ্মীও অচল হলেন। কিন্তু রাজার এ কথা ঠিক বিশ্বাস হল না। ব্যাসের অলক্ষ্যে মাটি খুঁড়েই তাঁর চক্ষুস্থির, সত্যিসত্যিই বাসুকির রক্ত লেগে আছে স্তম্ভের পাদমূলে। আবার পুঁতলেন সেটা, কিন্তু আগের মত আর শক্ত হল না। ব্যাস এসে বললেন :

"কিল্লি তো ঢিল্লি ভই।
তোমর ভয় মত হিল।"

এ বংশের রাজলক্ষ্মী অচিরেই সচল হবে। হলও তাই। আর এই 'ঢিল্লি' থেকেই দিল্লী নাম।

মামা বললেন : শাবাশ !

কিন্তু মিত্রার বিশ্বাস হল না এই কাহিনী, বলল : তৈরি গল্প !

বললুম : যা তৈরি নয়, তাও বলি। এই দিল্লী বা দিল্লীপুর নামের উৎপত্তি খ্রীস্টজন্মের পঞ্চাশ বছর আগে। জেনারেল কানিংহাম ফেরিস্তার মত সমর্থন করে বলেছেন যে রাজা দিল্লীর নামেই নগরের এই নাম। যুধিষ্ঠিরের পর তাঁর অধস্তন ত্রিশ পুরুষ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করেন। তারপর এই সিংহাসন অধিকার করেন

পাণ্ডব মন্ত্রী বিসর্ব। এঁরই বংশে পঞ্চদশ গৌতম রাজা হলেন পাঁচশো বছর পরে। গৌতম বংশের পর ময়ুর বংশ। ইন্দ্রপ্রস্থে ময়ুর বংশের শেষ রাজা দিলু।

স্বাতির মুখের দিকে চেয়ে আমি হেসে ফেললুম। বললুম : এই স্তম্ভের গায়ে সংস্কৃত অনুশাসন। এর পাঠোদ্ধার করেছেন প্রিন্সেপ সাহেব। মনে হয় খ্রীস্টীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে রাজা ধাব তাঁর নিজেরই কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। গুপ্তযুগের অনুরূপ অক্ষর দেখে কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে ধাবের কাল সম্ভবতঃ ৩১৯ খ্রীস্টাব্দ।

স্বাতির এ গল্প পছন্দ হল না। মুখ ফিরিয়ে বলল : কী কী দেখবার আছে এখানে ?

রাণাও যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তা বোঝা গেল তার আচরণে। বলল : দেখবার ? তা অনেক কিছু আছে বৈকি !

বলেই তার পকেট-বই খুলে ফেলল। গুন্‌গুন্‌ করে পড়ল : কুতব মিনার, আলাই মিনার, কুও-ও-তুল ইসলাম মসজিদ, আয়রন পিলার, আলাই দরওয়াজা, ইলতুৎমিশের কবর, মাদ্রাসা আর খাজা কুতব-উদ্‌-দীনের দরগা।

নোট-বই বন্ধ করে বলল : আসুন একে একে সব দেখিয়ে দিই আপনাদের।

আমরা কথা না বলে সবাই তার কাছে সরে এলুম।

পেশাদার গাইডের মত রাণা বলল : এই যে প্রাঙ্গণের মধ্যে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি, এটা কুও-ও-তুল মসজিদের প্রাঙ্গণ।

খানিকটা এগিয়ে একটা খিলানের সামনে এসে বলল : এইখানে ফার্সীতে লেখা আছে ১১৯৩ খ্রীস্টাব্দে কুতব-উদ্‌-দীন আইবেক এই মসজিদ নির্মাণ করেন। চারদিকের শিল্পকলা লক্ষ্য করছেন তো! এই থামগুলোর কারুকার্য। পাঠান স্থাপত্যের নমুনা এসব নয়।

হিন্দুদের তৈরি সাতাশখানা বাড়ি থেকে এসব সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল।

আলাই দরওয়াজার দিকে অগ্রসর হয়ে রাণা বলল : কুতবের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুলতান ইলতুৎমিশ আফগানিস্থান আর পারশু থেকে কারিগর আনলেন এই মসজিদের বিস্তারের জন্য। নতুন জোড়াতাড়াগুলো চিনতে পারছেন স্বাতি দেবী?

বলে স্বাতির দিকে চাইল রাণা ব্যানার্জি।

কয়েকটা থাম দেখিয়ে স্বাতি বলল : এগুলো অপেক্ষাকৃত নতুন মনে হচ্ছে।

আমি বললুম : চেনবার সহজ উপায় হচ্ছে অন্য। একবার সেই সূত্রটি ধরতে পারলে কোথাও আর কষ্ট হবে না। হিন্দুদের ছাদ সমতল, আর্চ সমান্তরাল আর স্তম্ভ চতুষ্কোণ। তার গায়ে ফুল-লতা-পাতা আর দেবদেবীর নানা কারুকার্য।

জিজ্ঞেস করলুম : অঙ্কের সেকেণ্ড ব্র্যাকেট মনে পড়ছে? তাকে উপুড় করে ফেললে যা হয়, মুসলমানের আর্চ তেমনি। আর ছাদ গম্বুজওয়ালা। দেয়ালে কোরানের বাণী আর ইউক্লিডের জ্যামিতি। এইবারে মিলিয়ে নাও।

স্বাতি একবার আমার মুখের দিকে চাইল, তারপর তাকাল অর্ধসমাপ্ত আলাই দরওয়াজার দিকে।

রাণা বলল : আলা-উদ্-দীন চেয়েছিলেন এই মসজিদটাকে আরও বড় করতে, কিন্তু এর বেশি আর কিছু করতে পারেন নি।

মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে সুলতান ইলতুৎমিশের কবর দেখাল রাণা, বলল : এই কবরটাকে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন কবর মনে করবেন না। তাঁর ছেলের কবর তৈরি হয়েছিল এরও আগে, ১২২৮ খ্রীস্টাব্দে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে স্বাতি চাইল রাণার দিকে।

মসজিদের দক্ষিণে আমরা মাদ্রাসার ভগ্নাবশেষ দেখলুম। রাণা

বলল: এও আলা-উদ্-দীন খিলজীর তৈরি। লোকে বলে, আলা-উদ্-দীনের সমাধিও আছে এরই ভেতর। তাঁর আরও একটি কীর্তি আছে কাছে।

বলে আমাদের আলাই মিনারের কাছে নিয়ে এল। বলল: বাদশাহর শখ ছিল দ্বিতীয় কুতব তুলবেন অদ্বিতীয়, আকারে ও উচ্চতায় তা প্রথম কুতবের দ্বিগুণ হবে। নিজের জীবনটাকেও দ্বিগুণ করতে পারলে হয়তো একদিন সফল হতেন।

বললুম: কুতবকে যাঁরা হিন্দুর কীর্তি বলেন তাঁদের মত অন্য। তাঁরা বলেন যে পৃথ্বিরাজ নিজের গঙ্গা দর্শনের জন্য এই মিনার নির্মাণ শুরু করেছিলেন।

সকলের কাছেই এ কথা বুঝি নতুন ঠেকল। বললুম: কুতবকে যে যমুনা স্তম্ভ বলা হয় তা সবাই জানেন। পৃথ্বিরাজ-কন্যার গুরুর আশ্রম ছিল যমুনাতীরে। এই যমুনা স্তম্ভে চড়ে তিনি প্রত্যহ যমুনা ও তার তীরবর্তী গুরুর আশ্রম দর্শন করতেন। অনেকে বলেন, পৃথ্বিরাজ নিজে প্রত্যহ গঙ্গার দর্শন চাইতেন। সেই উদ্দেশ্যেই এই স্তম্ভ নির্মাণ করেন। কিন্তু নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে দেখলেন যে গঙ্গা এত দূরে যে তার জন্যে আরও উঁচু স্তম্ভের প্রয়োজন। তাঁর অকালে মৃত্যু না হলে এই মিনারে চড়ে আমরাও আজ গঙ্গার শোভা দেখতুম, প্রণাম করতুম সেই পাপনাশিনীকে।

রাণা ফ্যালফ্যাল করে চাইল আমার মুখের দিকে। মিত্রার চোখের দিকে চেয়ে দেখলুম, এ কথাও তার বিশ্বাস হয় নি।

কুতব মিনারের কতগুলো সিঁড়ি রাণাবাবু? স্বাতি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

তিনশো উনআশি: রাণা জবাব দিল। বলল: উঠবেন নাকি ওপরে?

উঠব বৈকি।

বলে তরতর করে এগিয়ে গেল স্বাতি।

তবেই হয়েছে।

বলে মামা পেছু হঠতে লাগলেন। মামীও তাঁর সঙ্গে রইলেন।

মিত্রা বলল: ও ছেলেমানুষী আমার নেই।

বলে সেও দাঁড়িয়ে রইল।

রাণা হাসিমুখে এগিয়ে গিয়েছিল। পেছন ফিরে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বাতি বলল: গোপালদা কি ভয় পেলে নাকি?

বললুম: ট্রিচির রক টেম্প্‌ল্‌ কি এর চেয়ে নিচু হবে?

সে হিসেব পরে করব, এবারে চলে এস তো।

বলে স্বাতি ভেতরে ঢুকে গেল।

আমিও এগিয়ে গেলুম।

ভেতরে ঢুকেই রাণা একটা সিগারেট ধরাল, বলল: উঃ, হাঁপিয়ে উঠেছিলুম।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে বললুম: সিগারেট খান, তাতে সঙ্কোচ কিসের?

রাণা বলল: বাবার বন্ধু, তায় একেবারে কনজারভেটিভ মানুষ। সিগারেটের লোভে ঠ্যাঙানি খাব?

ওপরের ধাপ থেকে স্বাতির হাসির শব্দ পেলুম।

দোতলার বারান্দায় এসে আমরা হাঁপাতে লাগলুম। মামা-মামীকে দেখতে পেয়ে স্বাতি তার হাত দুলিয়ে দিল। বলল: কতদূর উঠলুম রাণাবাবু?

রাণা বলল: দুশো আটত্রিশ ফুটের ভেতর মাত্র পঁচানব্বুই ফুট।

আমি কুতবের গা দেখছিলুম ভাল করে। আমাকে বলল: নিচের তিনটে তলার সঙ্গে ওপরের দুটো তলার তফাৎটা দেখবেন ভাল করে। নিচের দিকটা কুতব-উদ্‌-দীন আইবেক গেঁথেছেন ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে আর ওপরটা তৈরি করেছেন ফিরোজ শাহ তুঘলুক ১৩৭০

খ্রীস্টাব্দে। নিচে লাল পাথর, তার গা ঢেউখেলানো। ওপরটা ছোট বটে, কিন্তু মার্বেল পাথরের।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা আবার উঠতে লাগলুম। দোতলা থেকে তিনতলা, তারপর চারতলা। একবার করে বারান্দায় বেরিয়ে নিচের লোকজন আর চারিদিকের দৃশ্য দেখে নিচ্ছি। এক-সময় পাঁচতলার ওপরেই পৌঁছে গেলুম।

ভাল করে কিছু দেখবার আগেই স্বাতি হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল, বলল : ওপরটা দুলে উঠল যে!

সকলের পেছনে উঠছিল রাণা। সে কেমন হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আমি বললুম : কই, দুলেছ না তো!

ততক্ষণে স্বাতি আমার ডান হাতটা টেনে ধরে সিঁড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে। বলল : শিগগির নেমে এস গোপালদা, আর এক মুহূর্তও ওপরে নয়।

পেছন ফিরে আমি রাণাকে ডাকলুম।

স্বাতি আমায় টেনে নামাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে পাশ দিয়ে যাঁরা উঠছিলেন, শশব্যস্তে তাঁরা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। একবার ধাক্কা লাগলে আর রক্ষে নেই, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

শ দেড়েক সিঁড়ি নেমে স্বাতি দাঁড়াল, বলল : এসো, একটু বিশ্রাম করা যাক।

বলে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল। রাণা তখনও এসে পৌঁছয় নি।

খানিকটা দম নিয়ে স্বাতি বলল : কী ভয়ই পেয়েছিলুম!

আমি হেসে ফেললুম।

তুমি হাসছ : স্বাতি চটে উঠল : তোমার নিজের মাথাই তখন দুলছিল কিনা, বাইরের দুলুনি তাই টের পাবে কী করে!

গম্ভীর হয়ে বললুম : সত্যিই তো!

উঁকি মেরে স্বাতি একবার সিঁড়ির ভেতরটা দেখে এল। ফিরে এসে বলল : বড্ড অহংকারী ঐ মেয়েটা, কাল নাক সিঁটকেছিল তোমার পরিচয় জেনে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি গোপালদা, ওর অহংকার তুমি ভেঙে দাও।

খচ করে একটা দেশলাই জ্বালার শব্দে পেছন ফিরে তাকালুম। রাণা একটা সিগারেট ধরিয়েছে।

কিছু না ভেবেই আমি স্বাতিকে আশ্বাস দিলুম : তাই হবে।

৪

তাই হবে, কিন্তু কী করে তাই হবে!

কুতব থেকে নেমে মামা-মামীর পাশেই ঘাসের ওপর বসে পড়লুম। স্বাতি বসল মিত্রার কছে। রাণা বসতে এসেও বসল না, বলল : একটু চায়ের চেষ্টা দেখি।

স্বাতিকে মামী কী একটা প্রশ্ন করলেন, আমার কান সেদিকে গেল না। আমি ভাবছিলুম আমার সংকল্পের কথা। না ভেবে চিন্তে স্বাতিকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেললুম, কী করে তা রক্ষা করব।

কাল সন্ধ্যেবেলার কথা আমার হঠাৎ মনে পড়ল। মনে হল, আমিও যেন মিত্রাকে কাল লক্ষ্য করেছি। গাড়ি থেকে যখন নেমেছিল, তখন খানিকটা কৌতূহল দেখেছিলুম আমার সম্বন্ধে। কঠিন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে আমার আপাদমস্তক। আমার ওঠাবসা কথাবার্তা নিরীক্ষণ করে গেছে পরীক্ষকের মত। এই কৌতূহলটা বোধহয় স্বাভাবিক ছিল। মামার কাঁচি ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবির পাশে আমার মোটা খদ্দরের জামাকাপড় বড় বেয়াড়া দেখায়। তার চেয়েও বেমানান দেখাচ্ছিল রাণার পাশে। তার সাটিন ড্রিল আর

শার্কস্কিনের চাকচিক্য খানিকটা বিদ্রূপ ছড়াচ্ছিল। রাণা তাদের পরিচয় ঘোষণা করেছিল বেশ একটু গর্বের সঙ্গে, আর আমার পরিচয় দিতে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্য থেমে পড়েছিলেন মামা। সামলে নিয়ে বলেছিলেন : গোপাল আমার ভাগনে।

তাঁর সেই দ্বিধাটুকু আমার নজর এড়ায় নি। তাই স্পষ্ট করে সম্বন্ধটা জানিয়ে দিয়েছিলুম, নকল ভাগনে। নিজের ভাগনে নেই বলে অনাত্মীয় হয়েও আমি তাঁর স্নেহের অধিকারী হয়েছি।

মামা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, খুশী হয়েছিলেন কিনা বুঝতে পারি নি। স্বাতি আমার সামনে বসে ছিল, তার দৃষ্টিতে ছিল প্রসন্নতা।

আমার সম্বন্ধে মিত্রার তখনও খানিকটা কৌতূহল ছিল। নিজের পরিচয়ের সবটুকুই তো বাকি রয়ে গেছে। সাধারণ সৌজন্য রক্ষায় সেটুকু জানতে চাওয়া চলে না। আমাব মনে হয়, এই রহস্যটুকু ভেদ কবার জন্যে কিছু অস্থিরতা জেগেছে মিত্রার মনে। তাই গায়ে পড়ে নিজের পরিচয়টা ঘোষণা করে দিলুম।

রাণা জিজ্ঞেস করেছিল : কদিন থাকবেন এখানে ?

আমি সহজ ভাবে বলতে পারতুম, দু-চারদিন। কিংবা কবিত্ব করে, যতদিন ভাল লাগে। তা না বলে উত্তর দিয়েছিলুম : কিছুদিন থাকলেই হল। আমি তো নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। আপনার বলতে দুনিয়ায় কেউ কোথাও নেই। উত্তরপাড়ায় একখানা ভাড়াটে ঘব আছে, আছে নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন, আর ডালহৌসী স্কোয়ারে আছে সারি সারি টেবলের ভেতর একখানা কাঠের চেয়ার।

শেষের দিকটা যে নিতান্তই অবান্তর তা নিজের কাছেই ধরা পড়েছিল। ধরা পড়েছিল স্বাতির কাছেও। রাণার উচ্চকিত অট্টহাসিতেও তার ক্লিষ্ট দৃষ্টিটুকু আমার নজর এড়ায় নি।

মিত্রার পরিবর্তনটা আরও স্পষ্ট। তার সমস্ত কৌতূহল যেন

নিমেষে নিঃশেষ হয়ে গেল। কাঁধের পুড্‌ল্‌টা হাতে নিয়ে বলল: অনেক রাত হল দাদা, এবারে ওঠা যাক।

ও মা, এখুনি উঠবে কি: বলে মামী লাফিয়ে উঠেছিলেন: এই তো এলে। একটু বোসো, জলটল খাও।

জলটলের ব্যবস্থা করতে মামী যখন সত্যিই বেরিয়ে গেলেন, তখন আপত্তি সত্ত্বেও তাদের অপেক্ষা করতে হল।

আমি তো লক্ষ্য নই, উপলক্ষ্য। সেদিন এই ভেবে আমার আশ্চর্য লেগেছিল যে আমি কেন প্রাধান্য পেলুম। তারা তো আমার কাছে আসে নি। এসেছিল তাদের বাপের বন্ধুর কাছে। তবু আমার জন্যেই এই দিল্লী দেখার ব্যবস্থা হল—এই আয়োজন আর এই পরিশ্রম। রাণার ক্লান্তি নেই, কিন্তু সম্মতি দেখছি না মিত্রার। তার সংযত ব্যবহারে কোথায় যেন একটুখানি অবজ্ঞার আভাস পাচ্ছি।

এই ভাবটি স্বাতির ভাল লাগছে না, বরং পীড়া দিচ্ছে। ফিরোজ শাহ কোটলায় তার এই মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, স্পষ্ট ভাষায় এখানে তার বাসনা জানিয়ে দিল। স্বাতির সঙ্গেও আমার পরিচয় দীর্ঘকালের নয়। তবে অল্পদিনের অন্তরঙ্গ মেলামেশায় ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছি। একদিন তার স্বচ্ছ মনটি দেখেছি দর্পণের মত। জেনেছি তার আদর্শের কথা। মানুষকে সে ভালবাসে মানুষ বলে, শ্রদ্ধা করে তার ব্যক্তিত্বকে। লৌকিক সংস্কার আর সামাজিক প্রতিষ্ঠার ওপর তার আস্থা সামান্য। বলেছিল, গোপালদা, সূর্য জ্যোতির্ময় বলেই আমাদের দেবতা, তাঁর সৃষ্টির ইতিহাস আমাদের কাছে মূল্যহীন। স্বাতি রোমান্টিক, এ তার বয়সের ধর্মে। মিত্রার নির্বাক অবজ্ঞায় আজ সে যথার্থ আঘাত পেয়েছে।

কিন্তু আমি কী করতে পারি! সেই ভাবনায় খানিকটা অস্থিরতা এল, চমক ভাঙল রাণার কণ্ঠস্বরে। রাণা বলল: ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি গোপালবাবু? এই নিন, একটু চা খেয়ে নিন। গায়ে আবার জোর পাবেন।

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে পেয়ালাটা হাতে নিলুম। দেখলুম, মিত্রা চকিতে তার চোখ ফিরিয়ে নিল।

এক চুমুক চা মুখে নিয়েই স্বাতি আমাদের পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল, বলল: কুতব-উদ্-দীনের নাম থেকেই কি কুতব মিনার নাম রাণাবাবু?

মিত্রা হাসল।

রাণা বলল: কুতব-উদ্-দীনের বিজয়-স্তম্ভ যে!

স্বাতির দিকে চেয়ে দেখলুম। প্রশ্নটা করে ফেলেই সে অপ্রস্তুত বোধ করছে। রাণার জবাবটা আমার খারাপ লাগে নি, খারাপ লাগল মিত্রার হাসিটা। বললুম: আমরা যা জানি, তা কি সত্য। কানিংহাম সাহেব বলেন যে সন্ন্যাসী কুতব-উদ্-দীন উশীর নামে জামা মসজিদের নাম কুতব-উল-ইস্লাম আর তাঁর 'আজান' দেবার 'মাজিনা' স্তম্ভের নাম কুতব মিনার। এই জামা মসজিদ যে শাজাহানের বিখ্যাত জামা মসজিদ নয় তা সহজেই বোঝা যায়। কেন না চতুর্দশ শতাব্দীর আবুল ফেদা আর শামসি সিরাজের লেখাতেও কুতব মিনারের উল্লেখ আছে জামা মসজিদের মাজিনা বলে। এই শতাব্দীতেই লেখা ফতুহাত-ই-ফিরোজশাহী। এই ইতিহাস বলে যে মুইজ-উদ্-দীন শাহর মিনার বজ্রাঘাতে ভেঙে পড়ে। তার সংস্কার ও বিস্তার করেন ফিরোজ শাহ। এই সময়েই ভারতের প্রথম উর্দু কবি আমির খসরু লিখেছেন যে ফিরোজ শাহর ভাঙা চূড়াকে নতুন করে গাঁথেন আলা-উদ্-দীন খিলজী। আর যাঁরা ফার্সী পড়তে পারেন, তাঁরা বলেন যে এই কুতবের গায়েই আছে শিলালিপি যা পড়ে জানা যায় যে গজনীর রাজা মহম্মদ-বিন-শাহর আমলে এর নির্মাণ শুরু করেন কুতব-উদ্-দীন আইবেক আর কুড়ি বছর পরে ১২২০ খ্রীস্টাব্দে এর প্রথম চার তলা নির্মাণ শেষ করেন সুলতান ইলতুৎমিশ।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে রাণা আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল,

বললুম : আরও একজনের হাত আছে এই কুতব মিনারে, তা লর্ড বেন্টিঙ্কের। ১৮০৩এর ভূমিকম্পে গেট সমেত এর চূড়া আর বারান্দাটা ভেঙে পড়ে। লর্ড বেন্টিঙ্ক বিলিতি কায়দায় তা মেরামত করিয়ে দেন ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে।

স্বাতি যে খুশী হয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারলুম। কিন্তু ভাবান্তর দেখলুম না মিত্রার। চোখের চশমা খুলে সে তার শাড়ির আঁচলে মুছছিল পরিষ্কার কাঁচ দুটো, বলল : সন্ন্যাসীর নামে কুতব নাম, এতে কি তাই প্রমাণ হয় ?

বললুম : হয় না।

কিন্তু মিত্রা তার পরবর্তী প্রশ্ন নিক্ষেপ করবার আগেই বললুম : তবে সুলতান কুতব-উদ্-দীনের নামে কুতব মিনার নাম হয়ে থাকলে আজ এর নাম হত বেন্টিঙ্ক মনুমেণ্ট, কিংবা আলাদিন মিনার।

কেন ?

মিত্রা আমার দিকে একটা কঠিন দৃষ্টিক্ষেপ করল।

বললুম : কুতব মিনারের পর নাম হত ইলতুৎমিশ মিনার, তারপর ফিরোজ মিনার—

কথা শেষ করবার আগেই মামা হেসে উঠলেন।

রাণা বলল : ঠিক বলেছেন। সন্ন্যাসীর নামে নাম বলেই এ নাম এতদিন টিঁকে আছে।

মিত্রা বিরক্ত হল, বলল : তাজমহলের নাম বদলে গেছে, না, বদলেছে ফিরোজ শাহ কোটলার নাম !

বললুম : দশচক্রে ভগবান ভূত, আর পাঁচজনের হাত পড়লে ও নামের কী হত, তা কি বলা যায় ?

মিত্রা কথা কইল না, হাসল স্বাতি।

মামা তাঁর পকেট ঘড়ি বার করে সময় দেখছিলেন। সেদিকে লক্ষ্য করে রাণা বলল : এবেলা বাড়ি ফেরার আগে এদিকের দ্রষ্টব্যগুলো দেখে নেয়া যাক।

বলে তার ম্যাপ খুলে বিছিয়ে বসল ঘাসের ওপর। আমি কাছেই ছিলুম, আরও একটু ঘন হয়ে বসলুম। স্বাতিও সরে এল।

রাণা বলল: আমরা এখন এইখানটায় কুতব রোডের ওপর। মেহরৌলিও এইখানেই, পৃথ্বিরাজের প্রাচীর বেরুচ্ছে মাটি খুঁড়ে। এই যে রাস্তাটা পুবদিকে বেরিয়ে গেছে দিল্লী-মথুরা রোডের দিকে, সূর্যকুণ্ড যেতে হয় এই পথে। খানিকটা এগিয়ে বাঁ ধারেই তুঘলুকাবাদ। সেখানে আদিলাবাদ ফোর্ট আর ঘিয়াস-উদ্-দীনের সমাধি।

স্বাতি বলল: সূর্যকুণ্ডে কী দেখবার আছে?

রাণা হেসে বলল: মজুরি পোষায় না। তুঘলুকাবাদ থেকেও প্রায় মাইল তিনেক দূরে একটা পাথুরে জায়গার ওপর একটা বিরাট কুণ্ড। রাজা অনঙ্গপালের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এর কাছেই।

আমি অন্য কথা শুনেছিলুম। হিন্দুযুগের সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে বড় স্মৃতিস্তম্ভ এইখানেই। ভারতে সূর্যের মন্দির মাত্র অল্প কটি, তার একটির চিহ্ন আছে এখানে। পাছে অসৌজন্য প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে কথা কইতে সাহস পেলুম না।

রাণা বলল: ফেরার পথে রাস্তার ডান দিকে পড়বে জাহান-পন্না, সিরি আর বিজয় মণ্ডল। গাড়ি থেকে নেমে খানিকটা পুবে হাঁটলে দেখতে পাব খিড়কি মসজিদ, বেগমপুর মসজিদ আর রোশন চিরাগ দিল্লীর দেওয়াল। রাস্তার বাঁ ধারে ফিরোজ শাহর কবর আর হাউজ খাস। মথ কি মসজিদ আরেকটু এগিয়ে রাস্তার ডান ধারে।

মামা বললেন: রোদ যেমন তাতিয়ে উঠছে, তাতে বেশিক্ষণ ঘোরা যাবে না।

মামী বললেন: যাবার সময় বাড়িও পৌঁছতে হবে।

রাণা তার হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল: তা হলে চলুন, হাউজ খাস দেখেই বাড়ি ফেরা যাক।

চলতে চলতে স্বাতি বলল : হাউজ খাস দেখেছি কিনা আমার মনে পড়ছে না।

রাণা বলল : মারাত্মক এমন কিছু নয়। বিরাট একটা পুকুর, সিরিতে জল সরবরাহের জন্যে আলা-উদ্-দীন খিলজী এটা নির্মাণ করেছিলেন। ফিরোজ শাহরও এ জায়গাটা ভাল লেগেছিল। তাই একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। এইখানেই তাঁর সমাধি।

একটু থেমে রাণা বলল : পাঠানদের ভেতর ফিরোজ শাহই ছিলেন শ্রেষ্ঠ রাজা। শুধু বিদ্বান ধর্মপরায়ণ নন, প্রজাবৎসলও ছিলেন। সেই অত্যাচারের যুগে কী করে এমন সম্ভব হয়, তার একটা সদুত্তর পাওয়া যায়। ইনিই ভারতের প্রথম মুসলমান রাজা, যাঁর ধমনীতে হিন্দুর রক্ত ছিল। তাঁর মা ছিলেন রাজপুত রমণী।

আমি বললুম : ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। ঘিয়াস-উদ্-দীন তুঘলুক ছিলেন ফিরোজ শাহর জ্যাঠামশাই, তাঁর মা ছিলেন জাঠ-কন্যা। কাজেই ঘিয়াস-উদ্-দীনই সে গৌরবের প্রথম অধিকারী।

রাণা খানিকটা বিচলিত হল। বললুম : প্রজাহিতকর যত কাজই করে থাকুন, ফিরোজ শাহকে আমি প্রজাবৎসলও বলব না, ধর্মপরায়ণও না। হিন্দু প্রজার উপর তাঁর অত্যাচারের সীমা ছিল না। হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করে সেই প্রাঙ্গণেই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। হিন্দু প্রজার ওপর ছিল জিজিয়া কর। ধর্মান্তরিত হলে কর দিতে হবে না—এই আশ্বাসে শত শত প্রজার ধর্ম নষ্ট করেছেন।

কী একটা মনে পড়তেই রাণা দাঁড়িয়ে পড়ল, একখানা বই খুলে ফেলল তাড়াতাড়ি। কয়েকখানা পাতা উল্টে খানিকটা পড়ে ফেলেই বলল : তাহলে তো ভুলই লিখেছে এই বইএ। কিন্তু আশ্চর্য! কেউই কোন প্রতিবাদ করেন নি এসব ভুলের।

বললুম : ইতিহাসের বই হলে ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয়ই আপত্তি করতেন।

আমি মিত্রার দিকে চাইলুম। আমার কথা তার বিশ্বাস হয়েছে কিনা বুঝতে পারলুম না।

স্বাতি বলল : তুমি প্রতিবাদ কর না কেন?

বললুম : যারা খ্যাতি চায়, বাদানুবাদ তারাই করুক।

গাড়ির কাছে পৌঁছে রাণা তখন পেছনের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে গেছে। মামা বললেন : তোমার সঙ্গে এইখেনে আমার মতের মিল নেই। আমার বিশ্বাস যে খ্যাতির প্রয়োজনবোধ যার ফুরিয়ে গেছে, সংসারে তার আর প্রয়োজন নেই।

আপত্তি করে বললুম : আমি শিখেছি অন্যরকম। সংসারে খ্যাতির মোহ যাদের নেই, তাদের প্রয়োজনই অপরিহার্য।

মিত্রার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আমার ওপর, বললুম : মোহ স্পর্শ না করলেই সাধনা হয় নিষ্কণ্টক। আমার এখন জানবার সময়, আমাকে সব কিছুই নিঃশব্দে শুনে যেতে হবে।

গাড়িতে মামী উঠলেন সকলের আগে, তার পর মিত্রা আর স্বাতি, সকলের শেষে মামা নিজে। দরজা বন্ধ করবার আগেই আমি উল্টো দিকে ঘুরে গেলুম।

গাড়ি চালাতে শুরু করে রাণা বলল : পাঠান যুগের সবকিছুই প্রায় দেখা হয়ে গেল। লোদি গার্ডেন আর নিজাম-উদ্-দীনের দরগা দেখিয়ে দেব ওখলা যাবার পথে। বাকি যা থাকবে তা না দেখলেও চলবে। কালান মসজিদ, কুশ্‌ক্‌-ই-শিকার বা টিন বুর্জ এমন কিছু দ্রষ্টব্য বস্তু নয়।

স্বাতি হেসে বলল : আপনার মত গাইড বোধহয় সারা দিল্লীতে মিলবে না।

মিত্রা বলল : কাল অনেক রাত অবধি দাদা নিজের যোগ্যতা বাড়িয়েছেন।

রোদে তখন উত্তাপ ঝরছে, বাতাসেও লেগেছে তার স্পর্শ। সোজা সমতল পথে বায়ুর বেগে গাড়ি ছুটিয়েছিল রাণা ব্যানার্জি।

হঠাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। নিঃশব্দে যে গাড়ি চলে, সে হঠাৎ বিপুল রবে গর্জে উঠল, কিছুতেই থামতে চায় না। আতঙ্কে রাণার মুখ গেল শুকিয়ে, পেছন থেকে মেয়েদের আর্তনাদ শুনলুম। কিছু ভেবে না পেয়ে চাবি ঘুরিয়ে আমি ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিলুম। শব্দ থেমে গেল। আরও খানিকটা এগিয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল রাণা। আমরা দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়লুম।

রাণা প্রথমেই আমায় ধন্যবাদ জানাল, বলল : আপনিই আজ প্রাণ বাঁচালেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে মিত্রা বলল : ভেবেছিলুম ইঞ্জিনটা বুঝি ফেটেই যাবে।

হেসে উত্তর দিলুম : ইঞ্জিন ফাটে না। বেগড়ালে অচল হয় শুধু।

চিন্তিত ভাবে রাণা বলল : নতুন গাড়ি নিয়ে যে এমন বিপদ হবে কে জানত! ধারে কাছে একটা টেলিফোনও নেই যে ড্রাইভারকে ডাকতে পারি।

আমি সাহস দিয়ে বললুম : আসুন না, আমরাই চেষ্টা করে দেখি।

আশ্চর্য হয়ে মামা বললেন : তুমি মোটরের কাজও জান নাকি?

আমি লজ্জা পেলুম, বললুম : ছি ছি, কী যে ভাবেন আমাকে।

তবে সারাবে কী করে?

মামা হতাশ হলেন।

স্বাতির সাহস খানিকটা ফিরে এসেছিল, বলল : বুদ্ধি দিয়ে।

ঠাট্টা করছ : আমি জবাব দিলুম : কিন্তু ঐটেরই দরকার সকলের আগে।

তারপর পাঞ্জাবীর হাত গুটিয়ে বললুম : বনেটটা খুলতে পারেন রাণাবাবু?

রাণা বনেট তুলল।

বললুম : আপনার ঐ অ্যাক্সিলারেটরের তারটা একবার দেখুন তো। খুলে টুলে যায় নি তো?

রাণা খানিকক্ষণ উঁকি ঝুঁকি মেরেই চেঁচিয়ে উঠল, বলল : সত্যিই তো, এই তারটাই খুলে গেছে।

খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে বলল : কিন্তু পারব কি ঠিকমত লাগাতে।

উৎসাহ জানিয়ে বললুম : কেন পারবেন না।

আরও খানিকক্ষণ কাজ করে বলল : দেখুন তো, ঠিক লাগল কিনা।

আমি কিছুই জানি না। তবু উঁকি মেরে বললুম : দিব্বি লেগেছে। এইবারে উঠে আসুন।

আড়ষ্ট ভাবে মিত্রা বলল : আমার ভয় করছে কিন্তু দাদা।

আপনারা নিচেই থাকুন : আমি উত্তর দিলুম : আমরা একবার স্টার্ট দিয়ে দেখি।

স্টার্ট দেবার আগে রাণা আমাকেও তার পাশে বসাল। কিন্তু কোন বিপদ হল না। আমি বললুম : আস্তে আস্তে ফিরলেই হবে।

সবাই উঠে বসলেন বটে, কিন্তু বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত কেউ আর কোন কথা কইলেন না। রাণা টেলিফোন তুলে প্রথমেই ডাকল তাদের বাড়ির ড্রাইভারকে।

৫

মুখ হাত ধুয়ে খাবারের টেবিলে বসেই স্বাতি বলল : মিত্রাদি কী বলছিলেন জান গোপালদা ?

মিত্রা বোধহয় বাধা দিতে যাচ্ছিল, বললুম : কী করে জানব বল।

স্বাতি বলল : বলছিলেন যে মোটরের কারখানায় তুমি নিশ্চয়ই কখনো কাজ করেছ।

আপত্তি করে মিত্রা বলল: কারখানায় কাজ করেছেন নয়, মোটরের কাজ যে নিশ্চয়ই শিখেছেন তাতে আমাদের সন্দেহ নেই।

বললুম: সে একই কথা, তবে কারখানার কাজ আমি অসম্মানের মনে করিনে।

অসম্মানের তুমি কিছুই মনে কর না: স্বাতি জবাব দিল: করলে ভাল কিছু করবার চেষ্টা থাকত।

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

রান্নাঘরে মামী তখন খাবার সাজাচ্ছিলেন, আর কাপড় ছেড়ে মামা বসেছিলেন পাশের ঘরে আহ্নিক করতে। রাণা বলল: খেয়ে উঠে কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো।

প্রবল ভাবে আপত্তি জানাল মিত্রা, বলল: তোমার জ্ঞানের বহর দেখে ইতিমধ্যেই আমি ঘেমে উঠেছি। এ বেলা বিশ্রাম করতে দাও।

আমি বললুম: সত্যিই তো, দিল্লী দেখার সিদ্ধান্ত যখন নেয়া হয়, ঠিক হয়েছিল যে শহরটা শুয়ে বসে রয়ে সয়ে দেখা যাবে। কিন্তু এখন দেখছি অন্যরকম। বেড়াবার আনন্দ ছাপিয়ে গেছে আমাদের দেখবার নেশা। একটু রাশ টানাই ভাল।

স্বাতি বলল: তোমার কচকচি আমার ভাল লাগে না। সন তারিখ খ্রীস্টাব্দ শতাব্দ শুনিয়ে মেরে ফেলেছিলে দক্ষিণ ভারতে। এখানেও তাই শুরু করেছ। বাড়িতে বসে থাকলে তোমার বিদ্যা জাহিরের চেষ্টা থেকে অন্তত নিষ্কৃতি পাবে।

স্বাতির এই কথাটা যে কত সত্যি তা আমার চেয়ে সে বোধহয় বেশি জানে না। একবার কলেজ পত্রিকার জন্যে আমার কাছে একটা প্রবন্ধ চেয়েছিলেন আমাদের সম্পাদক বন্ধু। 'সৃষ্টিকর্তার জন্ম' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম, লেখাটা ছাপা হয় নি। ফেরৎ দেবার সময় সম্পাদক বলেছিলেন, এই প্রবন্ধটা বোঝাবার জন্যে আরেকটা প্রবন্ধ লেখ।

রাণারা সশব্দে হেসে উঠল। আমি বললুম: আপনারা হাসছেন কিন্তু আমি জানি এই দোষটিই আমার চরিত্রে চারিদিক থেকে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। আমি সহজ হতে পারিনে। সহজ ভাবে কথা কইতে বা মিশতেও পারিনে মানুষের সঙ্গে। আমাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমার অহংকার।

স্বাতিকে বিষণ্ণ দেখাল। আঘাত দিয়ে কি সে দুঃখ পেয়েছে?

রাণা বলল: এই তো বেশ সহজ ভাবেই মিশছেন আমাদের সঙ্গে।

অসংলগ্ন ভাবে স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: আপনার ড্রাইভার কখন আসবে রাণাবাবু?

আমার মনে হল, সে আমাদের আলাপের মোড় ফেরাতে চায়। পাঁচজনের সামনে নিজেদের নিয়ে আলোচনায় তার স্পষ্ট অসম্মতি লক্ষ্য করেছি। তার জন্যে নাকি স্থান কাল পাত্রের বিচার আছে। একদিন বলেছিল, যখন দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুখে দুখী, আর আকাশে জল ঝরে অনিবার, তখন মনের আগল খোলা যায় অসংকোচে। কেননা সে কথা শুনিবে না কেহ আর। আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ তার এই কথাটি বিশ্বাস করে ফেললুম। চৈত্রের এই রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে এই সরকারী কোয়ার্টারের খাবার টেবিলে বসে মনে হল, এই দুটি স্বল্প-পরিচিত তরুণের সামনে আমার চারিত্রিক দোষগুণ বিশ্লেষণ করে শুধু নির্বুদ্ধিতার কাজই করেছি। তারা আমাকে জানতে আসেনি, এসেছে বেড়াতে। সেই সত্য কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে মনে মনে স্বাতিকে ধন্যবাদ জানালুম।

রাণা বলল: এই এসে পড়ল বলে।

আহ্নিক সেরে মামা এসে টেবলে বসলেন, ঠাকুর খাবার আনতে লাগল থালায় করে। আমি আর স্বাতি বসে ছিলুম এক ধারে, অন্য ধারে রাণা আর মিত্রা। মামার সামনের চেয়ারটা পড়ে রইল, মামী বসলেন না। তিনি বসবেন না আমি জানতুম, কিন্তু রাণারা তবু অপেক্ষা করতে লাগল।

এস শুরু করি।

বলে মামা ভাত ভাঙলেন। রাণা ও মিত্রা তবু হাত গুটিয়ে বসে রইল। মিত্রা ঘন ঘন চাইতে লাগল রান্নাঘরের দরজার দিকে।

বললুম: মামী বসবেন না এখন।

ওমা, মার জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি!

বলে স্বাতি হেসে ফেলল।

না না, অপেক্ষা করব কেন!

বলেই রাণা খেতে শুরু করল।

অল্পক্ষণ পরেই মামী বাইরে এলেন। চেয়ারখানা আরও একটু তফাতে টেনে খাওয়া দেখতে বসলেন।

মিত্রা তার কুকুরকে টেবলে বসাবে না মাটিতে, ভেবে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত নিচেই রাখল। দু টুকরো মাংস মেখে একমুঠো ভাত দিল নিচে। বড় বড় চোখে মামী দেখছিলেন তার কাণ্ড। আমি জানি, পরে তিনি সমস্ত ঘরটা জল দিয়ে ধোয়াবেন।

মিত্রা ঠিক আমার সামনেই বসে ছিল। প্রথমটায় টেবলের ওপর কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করল, তাতে ব্যর্থ হয়ে খেতে শুরু করল। দেখছিলুম, তার সরু সরু আঙুলের ডগা দিয়ে শাক শুক্ত সরিয়ে রাখল। এক টুকরো মাছ ভেঙে ছেলেমানুষের মত কাঁটা বাছতে লাগল।

রাণা বলল: খাবার কষ্ট পেয়েছিলুম বিলেত গিয়ে। সে কষ্ট জীবনে ভুলব না।

সে কি, সে দেশে খাবার কষ্ট!

মামী দুঃখ প্রকাশ করলেন।

শ্রোতা পেয়ে রাণা বলল: আর বলেন কেন! এক বুড়ির বাড়িতে পেয়িং গেস্ট ছিলুম। সব খাবার একেবারে মাপা জোখা। নিজেরাও কম খায়, আমাকেও না খাইয়ে মেরেছে।

মামীর চোখের দৃষ্টি সিক্ত হল। বেশ বুঝতে পারলুম যে মনে মনে তিনি রাণার খাবার কষ্ট অনুভব করতে পারছেন। বললেন: কেন কম খায় তারা?

রাণা বলল: যুদ্ধের সময় কণ্ট্রোল ছিল সবকিছুরও পর। কম খাবার অভ্যাসকে তারা আজও বাঁচিয়ে রেখেছে।

মামী বললেন: কিন্তু কম খেয়ে শরীর কী করে চলবে?

রাণা তখুনি জবাব দিল, বলল: আমার চলত না, বাইরে কিছু খেতেই হত।

এত বড় একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল দেখে মামী বেশ আশ্বস্ত হলেন। বললেন: ঠাকুর, আর দুটি ভাত দাও তো এই পাতে।

রাণা আপত্তি করে উঠল, বলল: না না, আর ভাত নয়, এ কটাই খেতে পারব না দেখছি।

মামা হেসে বললেন: অনেকদিন কম খেয়েছ কিনা, তাই উনি তোমায় পুষিয়ে নিতে বলছেন।

আমরাও হেসে ফেললুম।

মিত্রার নিজের খাওয়ার চেয়ে কুকুরের খাওয়ার ওপর দৃষ্টি ছিল বেশি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অল্প কটি ভাত মুখে দিয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য করে মামী বললেন: তুমি যে কিছুই খাচ্ছ না মা!

মিত্রা তার ঠোঁটের ওপর আঙুল চাপা দিয়ে একটা ঢেকুর তুলল। বলল: দেখছেন, খেয়েছি!

মামী হেসে ফেললেন: ছেলে মানুষ করনি কিনা, তাই ওই ঢেকুরের মানে জান না।

আমরা তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

মামী বললেন: ছোট ছেলেকে কোলের ওপর ফেলে যখন ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াবে, তখন এক বাটি খাওয়াবার পর ছেলেকে একটু উঁচু করে আলতো ভাবে নাড়া দেবে। একটা ঢেকুর উঠলেই নিশ্চিন্ত মনে আরেক বাটি খাওয়াও।

আমরা হাসলুম, কিন্তু মিত্রার মুখ হল রাঙা। এমন ধরনের কথা শোনায় সে বুঝি আদৌ অভ্যস্ত নয়। এর পর আর কথা কইল না অনেকক্ষণ।

মামা বললেন : দু বাটি দুধ খাওয়াবার নমুনা তো দেখতে পাচ্ছি!

স্বাতি একটু জড়োসড়ো হয়ে বসল। শরীর তার রোগার দিকেই, কিন্তু ফ্যাকাশে নয়। জীবনের চাঞ্চল্য আছে দেহের রক্তবিন্দুতে। নতুন লোকের সামনে নিজের প্রসঙ্গ এড়াতে চায় বলেই চুপ করে রইল। কিন্তু নিজের কথারই জের টানলেন মামা, বললেন : ঝড়ের টানে উড়েই যাচ্ছে।

আমি বাধা দিলুম, বললুম : কেন ওর দিকে নজর দিচ্ছেন মামাবাবু!

বলে ডান হাতের এঁটো কড়ে আঙুলটা দাঁতে কাটলুম।

রাণা হেসে উঠল, মিত্রা আরও গম্ভীর হল। স্বাতির চেয়েও সে বেশি রোগা, বেশি ফর্সা। পায়ে চঞ্চলতা নেই, মুখে নেই বাচালতা। চশমার কাচের ভেতর দিয়ে তার যে দৃষ্টি দেখি তাতে স্নিগ্ধতাও নেই। কাচের ওপর আলো পড়ার মত দৃষ্টিটা সারাক্ষণ তীব্র দেখায়। তাকে একটু আরাম দেবার জন্যে বললুম : আপনার কুকুরটার পেট ভরেছে তো?

মিত্রা স্বস্তি পেল কিনা জানিনে, তবে আবার নিচের দিকে তাকাল।

মামী বললেন : ওমা, ভুলেই গিয়েছিলুম তোমার কুকুরটার কথা। খানিকটা দুধভাত মেখে দেব?

মিত্রা বলল : না না, কী দরকার অত হাঙ্গামা করবার!

মামী উঠে এসেছিলেন, বললেন : কিছুই যে খায় নি!

বলে বেরিয়ে গেলেন।

রাণা বলল : খাওয়ার ফষ্টি নষ্টি ঠিক তোরই মত। মাংসে একটু মসলা আর ঘি পড়েছে, মুখে রুচবে কেন?

মামী একটা শান্‌কিতে খানিকটা দুধভাত এনে কুকুরের মুখের সামনে রাখলেন।

আমরা দইএর প্লেট টেনে নিয়েছিলুম। মিত্রাকে মামী বললেন: তুমিও তো কিছুই খেলে না মা, দুটি ভাত মেখে দইটা খাও।

আড় চোখে মিত্রা একবার টেবিলের ওপরটা দেখে নিল। আমার মনে হল, হাত দিয়ে খেতে তার অসুবিধে হচ্ছে। বললুম: একখানা চামচে চাই?

তার উত্তরের আগেই মামী কয়েকখানা চামচে এনে দিলেন।

৬

রাণাদের ড্রাইভার এসে বাইরে অপেক্ষা করছিল, খেয়ে উঠেই তারা চলে গেল। পাইপে অনেকখানি ধোঁয়া উদ্গীরণ করে মামা বললেন: একটা কথা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগছে।

আমি একখানা চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা লবঙ্গ চিবোচ্ছিলুম, কোন প্রশ্ন না করে তাঁর মুখের দিকে চাইলুম।

ঘরে আর কেউ ছিল না। স্বাতি সামনে বসে মামীর খাওয়া দেখছে। মুখে আরও খানিকটা ধোঁয়া নিয়ে মামা বললেন: নীতীশ বাঁড়ুয্যের কথাই ভাবছিলুম। প্রেসিডেন্সী কলেজে একসঙ্গে পড়েছি, সেইখেনেই সম্বন্ধের শেষ। বি-এ পাশ করে সে বিলেত গেল, ফিরল সিভিলিয়ান হয়ে। আমি বাপের জমিদারী দেখছি শুনে বলল, ফুল। সম্পত্তি দেখছে, না, অধঃপাতে গেছে। আস্কারা দিয়ে গভর্নমেণ্ট এক গুষ্টি অপদার্থ পুষছে।

মামা একটু থেমে বললেন: বাঙলার জমিদারদের সম্বন্ধে এই তার মনোভাব। কিন্তু এই মনোভাব বদলাবার মত কোন কারণ ঘটেছে বলে তো শুনিনি।

ম্যাক্সী খেতে খেতে মেয়ের সঙ্গে কথা কইছিলেন। তাঁদের টুকরো কথা কানেও আসছিল। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে মামার মনটি যেন দেখতে পেলুম। তাঁর কলেজের বন্ধু ব্যানার্জি সাহেব আজ হঠাৎ কেন ভাব করতে চাইছেন, সেই প্রশ্নই তাঁর মনে জেগেছে। অনেক ভেবেও একটা সদুত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না।

মামা বললেন : এই বনের মোষ তাড়ানো কাজে দিল্লীতে যাতায়াত তো কম দিন করছিনে, সেও এখানে আছে দীর্ঘদিন। হঠাৎ এই ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে খোঁজ খবর নেয়া দেখে মনে কেমন খটকা লাগছে।

খটকা তিনি আমার মনেও লাগিয়ে দিয়েছেন। তবু ব্যাপারটা হাল্‌কা করবার জন্যে বললুম : বুড়ো হয়েছেন তো, হয়তো পরিবর্তন এসেছে। অবসর নিতে আর কতই বা দেরী।

মামা বললেন : তুমি জান না গোপাল, আমাদের প্রতি কত গভীর ঘৃণা ওরা বুকের ভেতর পুষে রেখেছে। যাদের চালচুলো ছিল না, আর যাদের প্রচুর ছিল, তাদের দু দলকেই ওরা ঘৃণা করে। সরকারী প্রতিপত্তিওয়ালা বন্ধুমহলে যা বলে, তাও জানি। সে সব নোংরা কথা আর নাই বা শুনলে।

শুনতে আমি চাই নি। আর সে সম্বন্ধে যা ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভাবতে ভাবতে মামা বললেন : যদি একটা উপযুক্ত ছেলে থাকত তা হলেও বা ভাবতুম—

বলে তিনি থেমে গেলেন।

উপযুক্ত ভাগনে আছে, এ কথা ভাববার সাহস আমার হল না। শুধু বিদ্যায় ও বয়সে উপযুক্ত হলেই হয় না। পাত্রের প্রথম যোগ্যতা হল তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সেখানে আমার যোগ্যতার অঙ্ক শূন্য। ব্যানার্জি সাহেব যে তাঁর মেয়ে নিয়ে জলে পড়ে যান নি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম। তবু একটা প্রশ্ন এল মনে। বললুম : জ্ঞানশঙ্করবাবুও কি আপনার সহপাঠী ছিলেন?

এ কথার জবাব না দিয়ে মামা খানিকটা ধোঁয়া নিলেন মুখে আর গভীর ভাবে চিন্তা করলেন অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে আমার সন্দেহকেই সমর্থন করলেন, বললেন : তোমার কথাই হয়তো ঠিক। জ্ঞানশঙ্করও পাশ করেছে আমাদের সঙ্গে, তারপরে চাকরি না করে বাপের ব্যবসা দেখতে এসেছিল এ দেশে। নীতীশকে কোন কালেই আমল দেয় নি, আর এইজন্যেই নীতীশ তাকে শ্রদ্ধা করেছে। জ্ঞানশঙ্করকে সে আজও টাকার কুমীর বলে জানে।

পাইপের আগুন শেষ হয়ে এসেছিল। বড় ছাইদানীর ভেতর ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন : তোমাকে পোষ্য নিচ্ছে, সেই খবর হয়তো কারও কাছে পেয়েছে।

স্বাতি এসে পাশে দাঁড়িয়েছিল। মামা শোবার জন্যে উঠলেন। বলে গেলেন : এ কথা আগে মনে হলে যমুনার গল্প তাদের শোনাতুম না।

স্বাতি মামাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না, আমার পাশে একখানা চেয়ারে বসে বলল : কী কথা গোপালদা ?

চারিধারটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললুম : তোমার বিয়ের কথা।

স্বাতি একটুও লজ্জিত হল না, বলল : চমৎকার কথা তো! তা আমার আড়ালে কেন ?

হেসে যোগ করল : কতদূর কী হল শুনি।

বলে চেয়ারটা ঘুরিয়ে আমার মুখোমুখি বসল।

কথার ভেতর বেশ একটু গাম্ভীর্য এনে বললুম : রাণাকে পছন্দ হয় ?

স্বাতিও তেমনি গম্ভীর হয়ে বলল : আমার আবার পছন্দ কী, তোমাদের পছন্দেই আমার পছন্দ।

বললুম : মামা বলছিলেন যে অমন ভাল ছেলে নাকি তিনি আজও পর্যন্ত দেখেননি। যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আর এইটুকু

বয়সেই অতবড় অফিসের ভেতর আলাদা ঘর পেয়েছে। একদিন হয়তো সারা অফিসটারই মালিক হয়ে বসবে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার বল তো ?

স্বাতি বলল : বিলেত-টিলেত তো ঘুরেই এসেছে, কিছুই বিচিত্র নয়।

খুব উৎসাহ দেখিয়ে বললুম : যা বলেছ।

স্বাতি বলল : কিন্তু মা কী বলছিলেন জান ? বলছিলেন, ভাগ্য তোর গোপালদার। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যে পেল রাতারাতি। মিত্রাদিকে পছন্দ হয়েছে তো গোপালদা ?

অর্ধেক চোখ বুজে বললুম : আহা !

স্বাতি সশব্দে হেসে উঠল, আমিও যোগ দিলুম তার হাসিতে।

তার পরেই তার বিষণ্ণ মুখ দেখলুম।

কী হল ?

আমি প্রশ্ন না করে পারলুম না।

তুমি রাজী হয়ে গেছ গোপালদা ?

স্বাতি প্রশ্ন জানাল, তার স্বরে বেদনার আভাস পেলুম

কিসে বল তো ?

কেন, জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র হতে ?

সত্যি কথা লুকোবার ইচ্ছা ছিল না, বললুম : রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমায় রাজী হতে হয়েছে।

গল্পটা কী ভাবে শুরু করব ভাবছিলুম। স্বাতি বলল : বাজীতে আমি হেরে গেছি। বাবা যখন চিঠি লিখছিলেন তোমাকে, আমি জোর গলায় বলেছিলুম যে এমন প্রস্তাবে গোপালদা কিছুতেই রাজী হবে না। বাবা বিশ্বাস করেন নি আমার কথা, বলেছিলেন যে আর্থিক সচ্ছলতা এমন জিনিস যে তার জন্যে সকলেরই কিছুটা মোহ আছে। সেই মোহ যার নেই, সে অতি-মানুষ। তেমন মানুষ দুনিয়ায় আজ বিরল। এরই সঙ্গে যোগ করেছিলেন যে জ্ঞানশঙ্করের পুরো

ইতিহাসটা শুনলে কী করবে বলা শক্ত, ভয়ে হয়তো পিছিয়েও যেতে পারে। আমি জোর দিয়ে বলেছিলুম যে ভয়ে পেছপা হবার ছেলে গোপালদা নয়। গোপালদা রাজী হবে না অন্য কারণে।

স্বাতি চুপ করল। আমিও আর কথা খুঁজে পেলুম না। মনে হল, স্বাতিই শুধু হেরে যায়নি, আমিও হেরে গেছি। বিত্তের যূপকাষ্ঠে আদর্শকে বলি দিয়ে আমি নিজের পরাজয় বরণ করেছি শোচনীয় ভাবে। আমার নূতন ভাগ্যোদয়ে আর যারাই করতালি দিক, পরিষ্কার বুঝতে পারলুম যে এই ছোট মেয়েটির কাছে আমি আজ নিশ্চিতরূপে অপদার্থ প্রতিপন্ন হয়ে গেছি।

এমন যে হবে আমি ভাবতে পারিনি। যখন রাজী হয়েছিলুম, তখন কি নিজের স্বার্থের কথা ভেবেছি! মনে পড়ে না। হয়তো ভেবেওছি, তাতে আপত্তির কিছু ছিল না। দুনিয়াটা আজ চাঁদির পেছনে ছুটেছে। ধর্ম মোক্ষ সম্মান প্রতিষ্ঠা সবই আজ চাঁদির খেলায়। কিন্তু চাঁদি পেয়ে যে চাঁদ হারাতে হবে, তা কি সেদিন ভেবেছিলুম!

গভীর ভাবে বললুম: তুমি আমায় ভুল বুঝলে?

স্বাতি সে কথার উত্তর দিল না, বলল: বাবা তোমাকে সবই দিতে পারতেন, দিতেনও। প্রত্যাখ্যান করে তুমি যে ধাক্কা দিয়েছিলে তাতেও আমরা মুগ্ধ হয়েছিলুম তোমার মর্যাদাজ্ঞান দেখে। বাবা বিষয়ী লোক, খানিকটা সন্দেহ ছিল তোমার আচরণে। বলেছিলেন, আমার কাছে মাথা নোয়াল না, নোয়াবে পরের কাছে। জগতের রীতিই এই। যত আপন, তার সঙ্গে তত লুকোচুরি। সংসারের অভাব অভিযোগ দুনিয়ার লোকে দেখে যাক, তাতে বাধা নেই। আত্মীয় বন্ধুতে দেখলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হল। তোমাকে যখন আসতে লিখেছিলেন, আমার মনে হয় যে বাবা বিশ্বাস করতেন তুমি রাজী হবে।

মনে মনে আমিও মামার কথাটা মেনে নিলুম। যত আপন, তার সঙ্গে তত লুকোচুরি। দুনিয়ার লোক কে কী ভাবছে আমি

গ্রাহ্য করি না। আমি মরে গেলুম স্বাতি কী ভেবেছে মনে করে। মনে হল, আজ এই মুহূর্তে যদি স্বাতির কাছে এই সত্যটা গোপন রাখতে পারতুম, তা হলে চিঠি লিখে জ্ঞানশঙ্করবাবুকে আমার মতের পরিবর্তন জানিয়ে দিতে দ্বিধা হত না। কিন্তু হাতের ঢিল গেছে বেরিয়ে, তাকে আর ফিরিয়ে আনার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ থেমে অনেকটা সঙ্কোচ নিয়ে বললুম: কেন রাজী হতে হয়েছে সে কথা যদি শোন তো, আমি নিশ্চয়ই জানি, তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে।

স্বাতি হেসে বলল: সে কথা কি আজ অবান্তর নয় গোপালদা? আর কৈফিয়ৎ কিসের! তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবারই বা আমার কোন্ অধিকার!

এ তার অভিমানের কথা। বললুম: অধিকার দানের জিনিস নয় স্বাতি, অধিকার জবরদস্তি দখলের। ইচ্ছে করে কেউ অধিকার ছাড়ে না, অতর্কিতে আক্রমণ করে অধিকার কেড়ে নিতে হয়। অধিকারের লোভ থাকলে জোর খাটাতেই হবে।

লোভ আর কিসের রইল গোপালদা?

স্বাতি তখুনি আবার জবাব দিল।

সত্যি কথা। এর পর আমার আর বলার কিছু নেই।

অনেকক্ষণ পরে স্বাতি কথা কইল, বলল: তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম ইউনিভার্সিটির কনভোকেসনে। গোড়ার দিকে তুমি এম-এর ডিগ্রী নিলে। তখন তোমাকে চিনতুম না, কিন্তু ভুলতেও পারিনি তোমাকে। তোমার ভঙ্গিতে একটা দৃঢ়তা ছিল, একটা সৌম্য ব্যক্তিত্বের ছাপ, যা আর কারও ভেতর দেখিনি। দ্বিতীয় দিন তোমাকে দেখলুম, আমাদের দোতলার বারান্দা থেকে। বাবার সঙ্গে দেখা করে ফিরে গেলে। বাবার কাছে সেদিন তোমার পরিচয় পেলুম। আজ লুকোব না গোপালদা, তোমার ঠিকানা জানলে আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে যেতুম, আমাকে বেহায়া ভাবলেও

তোমায় বলে আসতুম যে তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমার রূপকে নয়, তোমার বিদ্যাকেও নয়, তোমার মর্যাদাবোধকে। সেই মর্যাদাবোধ আজ তুমি টাকার লোভে খোয়ালে !

স্বাতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর বলল : তৃতীয়বার তোমার দেখা পেলুম হাওড়া স্টেশনের ভিড়ের ভেতর। রাম খেলাওন হারিয়ে গেছে। সঙ্গে একজন লোক না নিয়ে কন্যাকুমারীর পথে পাড়ি দেবার সাহস ছিল না বাবার। বাবার অনুরোধে তুমি রাজী হওনি, কেন হয়েছিলে আমি তা অনুমান করতে পারি। সেদিন তোমার মনের খানিকটা পরিচয় পেলুম। তার পর—

তার পরের ঘটনা আমার জানা। কয়েকটা দিন একসঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাঁরা যেমন আমায় চিনেছিলেন, আমিও চিনেছি তাঁদের। স্বাতিকে চিনতেও আমার ভুল হয়নি। অসাবধানতায় শুধু একটু হিসেবের ভুল হয়ে গেছে।

তার পরের ঘটনা কি তুমি সব ভুলে গেলে গোপালদা ?

বড় করুণ শোনাল তার প্রশ্নটা। বললুম : ভুলে গেলে কি আজ এইখেনে এমন করে তোমার গল্প শুনতে আসতুম।

গল্প শুনতেই এসেছ : স্বাতি জবাব দিল : আর গল্প বলতে। তার বেশি কিছুর সম্ভাবনা আজ শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে কি আর শ্রদ্ধা করতে পারব ?

বড়লোককে কি শ্রদ্ধা করা যায় না স্বাতি ?

যাবে না কেন : স্বাতি উত্তর দিল : চাঁদ আমাদের ভাল লাগে, কিন্তু শ্রদ্ধা করি সূর্যকে। মানুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি তার নিজের কৃতিত্বের জন্যেই।

একটু থেমে বলল : চাঁদও আমাদের ভাল লাগে—ক্বচিৎ কদাচিৎ। কিন্তু জীবনে তার প্রয়োজন নেই। আজ সারা সকাল ধরে যা দেখে এলুম, তা দেখতে আমাদের ভাল লাগে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের মত সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেই বা কতটুকু

অতিবৃদ্ধি হত। একটি সকাল আমাদের ঘরে বসে কাটত, এই তো।

বড় রোমান্টিক মনে হচ্ছে তোমাকে।

আমি জবাব দিলুম।

স্বাতি বলল: ঠিক উল্টো। আমি আর রোমান্টিক হতে পারছিনে।

বাইরে চৈত্রের বাতাসে লেগেছে উত্তাপ, মনে হল ঘরের ভেতরটাও যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মামার নাক ডাকছিল একটানা ভাবে, হঠাৎ তা থেমে যেতেই স্বাতি উঠে দাঁড়াল, বলল: যাই রাম খেলাওনকে ডেকে দিই চায়ের জন্যে।

বলে বেরিয়ে গেল।

৭

মুখে খানিকটা জল দিয়ে মামাবাবু এসে বসবার ঘরে বসলেন। তামাকের পাউচ আর পাইপ সংগ্রহ করতে করতে বললেন: তুমি একটু গড়ালে না গোপাল, সারা দুপুর এমনি করে চেয়ারে বসে কাটালে?

বললুম: দুপুরে গড়ানোর অভ্যাস আমার নেই।

সে কথা কানে না তুলে মামা বললেন: স্বাতি কোথায়?

বললুম: রাম খেলাওনকে জাগাতে গেছে।

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে মামা আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললুম: চায়ের সময় হয়েছে।

সত্যিই তো: মামা জবাব দিলেন: গলাটা শুকিয়ে উঠেছে যে।

রাম খেলাওনকে জাগিয়ে স্বাতি ফিরে এল, বলল : এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে দেব বাবা ?

জল ?

মামা মুখ বাঁকালেন, বললেন : দিল্লীর জল বড় বিস্বাদ লাগে মা। তার চেয়ে গরম জলই ভাল।

স্বাতি বসল মামার কাছ ঘেঁষে। যুৎ করে তিনি তাঁর পাইপ ধরালেন, গভীর ভাবে টানলেন কিছুক্ষণ, তারপর গল্প শুরু করলেন : তুমি আসার পর থেকে নেই-কাজে এমন জড়িয়ে আছি যে কিছুই শোনা হল না তোমার কাছে।

একটু থেমে বললেন : জ্ঞানশঙ্কর কী করছে আজকাল ?

বললুম : চন্দ্রমল্লিকার কালচার।

সে কি !

মামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

বললুম : তাই তো দেখে এলুম এলাহাবাদে। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি কয়েক শো গাছের পরিচর্যাতে মেতে আছেন। এখন মবসুম নয়, তাইতেই একটু ফুরসৎ। নইলে চাবা তৈরির সময় এলে তাঁর নাওয়া খাওয়াব সময় থাকবে না।

স্বাতিও অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, বললুম : সত্যিই তাঁর এখন ছুটির দিন। ফুল যা ফোটবার তা শীতের শেষেই শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু মাথা-ছাঁটা শক্ত গোড়াগুলো। নিচে থেকে ফ্যাকড়া বার করবাব জন্যে প্রবল উৎসাহে জল ঢালাচ্ছেন। বেবিয়েছেও কিছু। সে কি এক আধটা মামাবাবু, পেছনে একটা গোটা ক্ষেত, সামনে কয়েক শো টব। বলছেন, একা আর পেরে উঠছেন না। একটি কাজ মালিদের ওপরে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি নেই। ভুল করবেই তারা, ভুল করবার জন্যেই যেন জুটেছে তাঁর বাগানে। সত্যি বলছি, ভুল আমিও করব, যে কেউ করবে। গোড়ায় কাঠি পুঁতে পুঁতে গাছের নাম আর জাত লেখা হচ্ছে। তার জন্যে লেখাপড়া-জানা লোক

রাখা হয়েছে একজন। সেও ভুল করছে। একটার লেবেল আরেকটায় লাগাচ্ছে। টের পেলেই জাত-ধর্ম গেল বলে তিনি কুরুক্ষেত্র বাধাচ্ছেন। আমায় বলছেন, গোপাল, এখনি এরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, মরসুমে যে কী করবে সেই দুশ্চিন্তায় মরে যাচ্ছি। তার ওপর নতুন গাছ আনাচ্ছি এ বছর।

হেসে বললুম: সেই চারার নামধাম শুনে আমারও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে। জাপানে এখন নাকি সাত শো জাতের চন্দ্রমল্লিকা। উনি লেখালেখি করিয়ে তাকে তাদের ধর্ম ও গুণ অনুসারে সত্তর জাতে ভাগ করিয়েছেন। আর তাদের প্রত্যেক জাতের দুটি করে চারা আসছে এবারের মরসুমে। প্লেনে আসবে টোকিও থেকে কলকাতা, আর কলকাতা থেকে এলাহাবাদ। গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে ইমপোর্ট লাইসেন্স না পেলে লুকিয়ে পাইলটের হাতে আনাবেন, সে ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গেছে। বলে আমায় বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে গেলেন, বললেন, এই দেখ সারের ব্যবস্থা কেমন করেছি। বোকার মত আমি সেই ব্যবস্থা দেখলুম। সারি সারি কবরের মত বড় বড় চৌকো গর্ত, তার মাথায় কালো টিনের পাতে শাদা অক্ষরে সারের নাম লেখা—গোবর সার, পাতা সার, রাবিশ গুঁড়ো, মিহি বালি। ছোট ছোট গর্তও আছে, তার ওপরে লেখা—কাঠের ছাই, কাঠকয়লার গুঁড়ো, হাড়ের গুঁড়ো, রান্নাঘরের ঝুল। আরও নানারকম সার আছে ছাগল, মুর্গী, পায়রার। সে এক বিচিত্র স্থান।

মামা স্তম্ভিত হয়ে গেছেন, আর কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্বাতির মুখ।

একটা চালার নিচে শয়ে শয়ে টব রাখা আছে, নানা আকারের নানা আকৃতির। বললুম: এ-ই সব নয়। চার ইঞ্চি টব, উনি বললেন, প্রথম কাটিঙের জন্যে। মাটিশুদ্ধ পুরনো টব উল্টে শেকড়-শুদ্ধ কোঁড় লাগিয়েছিলেন হাপরের মাটিতে। সেখান থেকে তুলে

প্রথম কাটিং লাগাবেন এইসব টবে। তার জন্যে মাটি তৈরি হচ্ছে। দুভাগ পলিমাটি, একভাগ পাতা সার, আধভাগ রাবিশ গুঁড়ো, সিকি ভাগ মিহি বালি, সিকি ভাগ কাঠের ছাই, হাড়ের গুঁড়ো আর রান্নাঘরের ঝুল।

খিল খিল করে স্বাতি হেসে উঠল, বলল: রান্নাঘরের ঝুলও আবার সার নাকি?

হেসে বললুম: ওটা প্রথম কাটিং পর্যন্তই, তারপর আর লাগে না। দ্বিতীয় কাটিঙের জন্যে লাগে দুভাগ দোআঁশ মাটি, একভাগ পাতা, আধভাগ গোবর সার, সিকি ভাগ রাবিশ গুঁড়ো, সিকি ভাগ হাড়ের গুঁড়ো আর কাঠের ছাই। বর্ষার কিছু আগে আগে, তার জন্যে চাই ছ ইঞ্চি টব।

আমার জ্ঞানের বহর দেখে মামা হেসে ফেলেছিলেন, বললেন: এ সব শিখলে কোথায়?

বললুম: এলাহাবাদ পৌঁছে অবধি তো এই সবই শিখছি। আর তাড়াতাড়ি শিখে ফেলছি বলেই তো এত আদর পেলুম। কর্তা কী বলছেন জানেন? বলছেন, আমার নাকি প্রতিভা আছে। এক ডজন লোককে কয়েক বছরে যা শেখাতে পারেননি, আমি নাকি কয়েক দিনেই তা শিখে ফেলেছি।

স্বাতি হেসে ফেলল, বলল: ধন্যি তোমার প্রতিভা। রাম খেলাওনের বদলিতেও তুমি তোমার প্রতিভা দেখিয়েছিলে।

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম: জান, এবারের শীতে আমার কত কাজ? লক্ষ্মীছাড়া মালিগুলো সমস্ত ফুলের নাম ওলট-পালট করে ফেলেছে। আর সেই আনাড়ি বাবুটি। হলদে ফুল দেখেছে কি তার ওপর সেঁটে রেখেছে 'বারবারা ফিলিপ্‌স্‌' নাম। আরে হলদে কি শুধু একটা? 'সান' হাল্কা হলদে, তারপর রোজার্স টম্পসন, বি. স্টকার্ট, মিসেস ডব্লু সণ্ডার্স। গাঢ় হলদে চাই? আছে ডাচেস অব সাদার্ল্যাণ্ড, অস্টিন চেম্বারলেইন। একটু কমলা লেবুর

রঙ মিশিয়ে দিলেই এডিথ ক্যাভেল, আর তামা মেশালেই পল, আর লালের ছিটে পড়েছে কি রেডিয়ান্স।

বড় বড় চোখে মামা আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হেসে বললুম: শাদারই কি শেষ আছে? মর্ণিংগ্লোরি, পকেট্‌স্ পোল্‌সন্, উইলিয়াম টার্নার, জাপানীস্ হোয়াইট। তবে তুলনা নেই জেনারেল পেতাঁর।

স্বাতি এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে ছিল। হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল: কি করে সেখানে থাকবে গোপালদা?

তার ভাবনার কথা শুনে আমি হেসে ফেললুম, বললুম: এ তো শুধু দিনের বেলার গল্পই শুনলে, যতক্ষণ সূর্যের আলো থাকে আকাশে সেই সময়ের কথা।

মামী কখন এসে গল্প শুনতে বসেছিলেন টের পাইনি। তাঁর উপস্থিতি জানলুম তাঁর প্রশ্ন শুনে, বললেন: গিন্নী কী করেন সারাদিন? পুজো অর্চনা নিয়েই থাকেন বুঝি?

বললুম: পূজোই বটে, তবে দেবতারও নয় মানুষেরও নয়। কয়েকটি শিশু শৈশবেই মারা যাবার পর বড় গিন্নী বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন, আর এলাহাবাদে ছোট গিন্নী এক দঙ্গল কুকুর পালন করছেন। চন্দ্রমল্লিকার আগে কর্তার কুকুরের সখ ছিল। নানা দেশের নানা জাতের কুকুর। অগুনতি কুকুর, গোটাকয়েক মেথর নিয়ে কর্তা নাকি সারাদিন সেগুলোরই পরিচর্যা করতেন। রাতারাতি এ কাজ ছাড়লেন এক বন্ধুর কথায়। বন্ধু বললেন, মানুষই বল আর কুকুরই বল, তার পরিচর্যার দায়িত্ব মেয়েদের। তোমার অন্য 'হবি' চাই। আর তোমার যোগ্য 'হবি' আমার জানা আছে। কালই কিছু চন্দ্রমল্লিকার চারা পাঠিয়ে দেব। পাঠিয়েছিলেন ফুল-ফোটা গাছ—লাল মিসেস ডব্লু রীড, বেগনে পিঙ্ক টার্নার, আর নানা রঙের জুলু। কর্তা একদিনেই মুগ্ধ হলেন। কুকুর ছেড়ে ফুল ধরলেন রাতারাতি। শোনা যায় গিন্নী তখন টাট পুষ্পপাত্র আর কোশাকুশি

কিনে ঠাকুরের পায়ে মনোনিবেশের চেষ্টা ধরেছিলেন। কুকুরের কান্না শুনলেন দুদিন, কর্তাকে বকাবকি করলেন চারদিন। শেষে সপ্তাহ না ঘুরতেই নিজের হাতে কুকুরের ভার নিয়ে নিলেন। টাটশুদ্ধ ঠাকুর উঠল তাকের ওপর।

প্রচুর কৌতূহল নিয়ে স্বাতি প্রশ্ন করল: কত কুকুর আছে বাড়িতে?

বললুম: নিতান্ত কম হবে না। কয়েক জাতের টেরিয়ার—স্কচ টেরিয়ার, আইরিশ টেরিয়ার, ফক্স টেরিয়ার, এয়ারডেল টেরিয়ার। আছে গ্রে হাউণ্ড, ব্লাড হাউণ্ড, বুলডগ, আলসেসিয়ান। তার ওপর আছে ককার স্প্যানিয়েল, গোল্ডেন রিট্রাইভার, ডাকশুন আর কয়েক জাতের পুড্‌ল্।

স্বাতি বলল: পুড্‌ল্ কুকুর বুঝি নতুন চিনেছ?

উত্তর না দিয়ে আমি শুধু হাসলুম।

মামীর বিস্ময়ের যেন শেষ নেই। বললেন: মেথর আর কুকুর নিয়েই থাকেন সারাদিন?

বললুম: সাবান দিয়ে চান করায় মেথরেরা। তারপর ঝিএরা গঙ্গাজল ঢেলে শুদ্ধ করে দেয়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত গঙ্গাজলে না ভিজলে তারা বারান্দায় উঠতে পায় না।

আশ্চর্য হয়ে স্বাতি বলল: এত গঙ্গাজল রোজ আসে কোথা থেকে?

বললুম: অন্দর মহলে সিঁড়ির কাছে একটা বাঁধানো চৌবাচ্চা তৈরি হয়েছে। কলের জলে তা ভরে। সকাল বেলায় স্নান সেরে তিনি নিজের হাতে এক ঘটি গঙ্গাজল ঢালেন সেই চৌবাচ্চায়। তারপর কুকুরগুলোকে একে একে সেই চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে তোলা হয়।

মামা অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন, তারপর বললেন: এতই যখন বিচার তখন মেথরের বদলি চাকর রাখলেই তো হয়।

বললুম: কী করে হবে? অমন এক্সপার্ট লোকগুলোকে তাড়িয়ে কতগুলো আনাড়ির হাতে ছেড়ে দিলে ঐসব ভাল ভাল কুকুর কি আর বাঁচবে?

সত্যিই তো!

গম্ভীর হবার চেষ্টা করে মামা উত্তর দিলেন। স্বাতি হাসল তাঁর কথা বলার ধরন দেখে।

হাসছ স্বাতি: আমি বললুম: তাঁদের দুঃখ তুমি জান না। জানলে তোমারও দুঃখ হত। কয়েকটা দিনেই আমি তাঁদের অন্তরের পরিচয় পেয়ে গেছি।

মামী তাঁর বেদনার্ত দৃষ্টি তুলে ধরেছিলেন আমার মুখের ওপর। আমি সেই প্রৌঢ় দম্পতির আরেকটি গল্প শোনালুম তাঁকে, যে গল্প তাঁরা সযত্নে আড়াল করে রেখেছেন সাধারণের চোখের সামনে থেকে। বললুম: কয়েকটা দিন কাটবার পরেই কর্তা আমাকে তাঁর লাইব্রেরি ঘরে নিয়ে গেলেন। সে কী লাইব্রেরি! চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে, ইচ্ছে করে সারাদিন সেই লাইব্রেরি ঘরেই পড়ে থাকি। সে কথা থাক। বলছিলুম কর্তার কথা। আমাকে পাশে বসিয়ে মাসিমার কথা বললেন। মাসিমা, হ্যাঁ মাসিমাই তো। কর্তার প্রথম পক্ষ আমার মায়ের সম্বন্ধে বোন হন। কর্তার মুখেই সে কথা প্রথম শুনলুম। কী বললেন জানেন?

উত্তরের আশা করিনি, তাই নিজেই জবাব দিলুম। বললুম: বললেন, গোপাল, সন্তানের অভাব যে কত বড় অভাব, তোমার মাসিদের দেখলে তা খানিকটা বুঝবে। একজন তো সংসার ছেড়ে বৈরাগী হয়েছেন, আর একজন কুকুর নিয়েই পাগল। সখের জন্যে যে পাগলামি নয়, দুদিন থাকলেই তা টের পাবে। একটা কিছু আঁকড়ে কোন রকমে বেঁচে থাকা। আরেক দিন ঠিক এমনি করে পাকড়ে বললেন: গোপাল, তুমি ভাবছ, আমি আমার নিজের স্বার্থে তোমাকে ধরে রাখতে চাইছি। ভুলেও তা ভেব না। ধর্ম বলে আমি

যা মানি সে কুসংস্কার নয়। আমার মুখে আগুন কে দিল, আর গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি কেউ দিল কি না, সে দুর্ভাবনায় আমার ঘুম বন্ধ হয়নি। আমার দুঃখ তোমার মাসিদের কষ্ট দেখে। তাদের কত সাধ ছিল, কিছুই পূর্ণ হল না। তোমাকে পেলে তোমার মাসিও হয়তো ফিরে আসবেন বৃন্দাবন থেকে।

স্থির দৃষ্টিতে মামী আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। বললুম: একদিন একটু রাতে মাসি এলেন আমার কাছে। বেশ চুপিচুপি নিঃশব্দ পদক্ষেপে। আমি তখন লাইব্রেরি ঘরে একখানা প্রাচীন বই পড়ছিলুম। তাঁর আসাটা লক্ষ্য করিনি। বইএর ওপর ছায়া দেখে চমকে উঠলুম। আরও চমকালুম তাঁকে চিনতে পেরে। উঠতে যাচ্ছিলুম, কাঁধে একটু চাপ দিয়ে তিনি আমায় বসিয়ে দিলেন। নিজে বসলেন পাশের চেয়ারে। বললেন, বাবা গোপাল, তোমার কাছে একটা ভিক্ষে আছে। ব্যস্ত হয়ে বললুম, ছি ছি মাসিমা, একি বলছেন আপনি! বাধা দিয়ে মাসি বললেন, না না, ঠিকই বলছি আমি। তুমিই ওঁকে বাঁচাতে পার। তুমি চলে গেলে উনি কিছুতেই বাঁচবেন না। ওসব ফুলটুল কিছুই নয় বাবা, ওসব ফাঁকি। ওই নিয়ে মেতে আছেন দেখিয়ে আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিচ্ছেন। এতদিন সংসার করছি, ওঁকে চিনতে কি আমার বাকি আছে? পণ্ডিত লোক, পাঁচজনের কাছে মনের দুঃখ লুকোচ্ছেন পাগল সেজে। দুহাত ধরে মাসি একদিন কেঁদেই ফেললেন, বললেন, তুমি আমার ছেলের মত বাবা, তোমার কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি। ওঁকে তোমায় বাঁচিয়ে তুলতে হবে।

একটু দম নিয়ে বললুম: যে মাসিকে সারাদিন একপাল দুর্দান্ত কুকুরের শেকল টেনে বেড়াতে দেখি, তাঁর চোখে জল দেখেছি। তিনি চলে যাবার পরেও বইয়ে মন দিতে পারলুম না। খানিক পরে কর্তা এলেন ঘরে। চুপ করে পাশে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর কথা বললেন, ভেবে দেখলুম, দুটি মানুষের জীবন নির্ভর করছে তোমার

ওপর। নিজের কথা আমি ভাবিনে। বাকি জীবনটা এই লাইব্রেরি ঘরে বই নিয়েই কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তাঁরা বড় অসহায়। তাঁদের জন্যেই আমার ভাবনা। তারপর দুহাত জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি রাজী হয়ে যাও গোপাল, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। পয়সার লোভ তোমার নেই জানি, কিন্তু মানুষের দামও কি তুমি দেবে না? ছলছল করে উঠল কর্তার বড় বড় দুটি চোখ। আমি 'না' বলতে পারলুম না।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মামীর চোখও হঠাৎ ছলছল করে উঠল। শুধু স্বাতির মুখ দেখে তার মনের ভাব পড়তে পারলুম না। রাম খেলাওন চায়ের সরঞ্জাম এনে টেবিলের ওপর রেখেছিল, সেগুলো টেনে নিয়ে স্বাতি চা তৈরি করতে শুরু করল।

৮

বিকেলের রোদ তখন পড়ে গেছে। ঝির ঝির করে বাতাস আসছে সামনে থেকে। মামা আর মামী দুখানা বেতের চেয়ার নামিয়ে বাইরে বসলেন।

এসে অবধি আমি একখানি সেতার দেখছিলুম ঘরের কোণায় টাঙানো আছে। কে বাজায় তা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি। এবারে আবার সেদিকে নজর পড়তেই প্রশ্নটা জানিয়ে ফেললুম। বললুম: কে বাজায় এটা?

জবাব না দিয়ে স্বাতি একটুখানি হাসল।

বললুম: তোমারই সম্পত্তি বুঝি? কিন্তু জানতুম না তো!

স্বাতি বলল: সব কথাই যে জানতে হবে তার কী মানে আছে?

বললুম: একসঙ্গে থেকেও জানিনে, এইটুকুই আপত্তির বিষয়।

স্বাতি বলল: দিন কয়েক একসঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি, সেই কি একসঙ্গে থাকা হল।

তোমাদের বাড়িও তো গেছি অনেকবার। কিন্তু সে তর্ক থাক্‌। এবারে বাজিয়ে শোনাও কিছু।

সঙ্গত করতে পারবে?

তখুনি স্বাতি প্রশ্ন করে বসল।

বললুম: আমার দিক থেকে তার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার বাজনা শুনতে চাই।

সে কি!

আমি সত্যি কথাই বলছি: তাকে জবাব দিলুম: তবলার সঙ্গত না হলেও তোমার হাতের সুর আমি উপভোগ করতে পারব। তোমার দিকে যখন চাই তখন তোমাকেই দেখি, রাণার পাশে তোমাকে কেমন মানাবে সে কথা ভাবিনে।

স্বাতি বলল: সঙ্গীত সম্বন্ধে যে তুমি কিছুই জান না, তারই প্রমাণ দিচ্ছ।

হেসে বললুম: তা হয়তো দিচ্ছি। কিন্তু আমার রসবোধ আছে। সেই বোধ সঙ্গীতশাস্ত্রসম্মত না হলেও তা ভেজাল নয়। তোমার সুরও তেমনি খাঁটি হলে ঠিক জায়গাতেই আঘাত করবে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শুরু করতে পার।

স্বাতি তবু উঠল না, বলল: আরেকটা বাধা আছে। এখন বিকেল, এসময়ের কোন রাগিণী আমার জানা নেই।

বললুম: সুর্যাস্তের সময় এসেছে। তার জন্যে অনেক রাগিণী আছে।

স্বাতি বলল: শ্রীরাগ আমার ভাল লাগে না।

বললুম: বসন্তের কোন রাগিণী বাজাও, চৈত্র এখনও শেষ হয়নি।

স্বাতি বলল: আমার বসন্ত আজ শেষ হয়ে গেছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারব না।

এর উত্তর আমার মুখে জোগাল না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে স্বাতি বলল: রাত গভীর হোক, তোমাকে বেহাগ বাজিয়ে শোনাব। সেই আমার মনের সুর হবে।

এ কথারও আমি জবাব দিলুম না।

এবারে অনেকক্ষণ পরে স্বাতি কথা কইল। বলল: গোপালদা, এলাহাবাদে কী করে তোমার সময় কাটবে ভেবে দেখেছ কি?

বললুম: না।

ভেবে না দেখেই রাজী হয়ে গেলে?

রাজী হয়েছি বোলো না, বল আপত্তি করতে পারিনি।

ওই এক কথাই হল।

এক কথা নয় স্বাতি, এক কথা হলে মনে আরাম পেতুম। অনুরোধে ঢেঁকি গেলার গল্প আছে, এও আমার ঢেঁকি গেলা।

স্বাতি এ কথার উত্তর এড়িয়ে গেল, বলল: সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ফুলের চাষ আর কুকুরের পরিচর্যা করবে। তারপরেও যদি ক্লান্ত না হও তো লাইব্রেরিতে বসবে বই নিয়ে। এই জীবন! এরই জন্যে কি তুমি লেখাপড়া শিখেছিলে?

আমার হাসি এল। বললুম: সারা জীবন বসে খাব, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে!

স্বাতি চটে উঠল, বলল: একে তুমি সৌভাগ্য বল গোপালদা?

সৌভাগ্য নয়?: বাধা দিয়ে আমি বললুম: আজ যারা আমার অবস্থা দেখে নাক সেঁটকাচ্ছে, কাল তারাই আসবে আমায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। রাতারাতি আমার জীবনের মূল্য বদলে যাচ্ছে, সে কি কম কথা!

স্বাতি স্তম্ভিত হল আমার উত্তর শুনে। ক্ষুব্ধও হল। বলল: রাতারাতি তোমার জীবনের আদর্শ বদলে যাবে, এ কথা আমি ভাবতে পারিনি। এই পরিবর্তনের কথা বিশ্বাস করতেও আমার সময় লাগবে।

সেই এক সুর। এক অভিযোগ। মেয়েটা সত্যিই আঘাত পেয়েছে।

একটু থেমে বলল: পয়সার প্রয়োজন আমি অস্বীকার করি না। জীবনধারণের জন্যে তার প্রয়োজন যত, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্যে। তোমার পয়সা থাকলে প্রতিষ্ঠা থাকলে এ পরিবারের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ যে অন্য রকম হত, তাও স্বীকার করি।

মনে মনে আমিও তা অনুভব করি, তাই চুপ করে রইলুম।

স্বাতি বলল: কিন্তু তার জন্যে কি জীবনটা বিকিয়ে দিতে হবে।

আপত্তি জানিয়ে বললুম: বিকিয়ে কোথায় দিলুম?

বিকোনো আর কাকে বলে গোপালদা: স্বাতি জবাব দিল: কোথায় রইল তোমার স্বাতন্ত্র্য, তোমার স্বাধীনতা। জীবনের লক্ষ্যকে অনুসরণ করবার স্বাধীনতাই যদি ঘুচে গেল তো ভারি একটা দেহকে বয়ে বেড়াবার সার্থকতা কোথায়?

বললুম: জীবনের আবার লক্ষ্য কী?

বাধা দিয়ে স্বাতি বলল: আমাকে ঠকাতে চেয়ো না গোপালদা, ঠকাতে পারবেও না। তোমাকে যদি না চিনতাম, তবে এমনি করে ঝগড়া করবার প্রবৃত্তি হয়তো হত না। রাণাবাবু এমন কাজ করলে হাততালি দিয়ে নিশ্চয়ই তাঁকে বাহবা দিতাম।

একজনের মনের ওপর জোর খাটে না আরেকজনের। তাইতেই বোধহয় মন-জানাজানির আকূতি বুকের ভেতর ঠেলে ওঠে। বাইরেটা নিয়ে যে সুখ সে ক্ষণকালের, সেই মোহ উত্তীর্ণ হলেই চাই মনের সংবাদ। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই দেহটা মরে যায়, মনের মরণ নেই। আজ আমার মোহভঙ্গ হচ্ছে। বললুম: রাণার সঙ্গে আমার প্রভেদ তো খুঁজে পাইনি।

স্বাতি তখুনি জবাব দিল, বলল: আজ পাও না, আজ প্রভেদ

নেই বলে। যেদিন ছিল, সেদিন আমি তোমায় দেখেছিলাম। সেদিনের কথা তোমার মত এমন চট করে আমি ভুলতে পারব না।

কান্নার মত করুণ শোনাল স্বাতির গলার স্বর, বলল: এসব গল্প তুমি মিত্রাদির কাছে কোরো। সে তোমার সৌভাগ্যের তারিফ করবে।

আলাপটা লঘু করবার জন্যে আমি হেসে ফেললুম, বললুম: কিছু বলেছে সে?

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে যেন খানিকটা ঘৃণার সন্ধান পেলুম। এমন আদর্শবাদী মেয়ে আজও আছে জেনে আশ্চর্য লাগছে।

যা বলেছে তা শুনতে ভাল লাগবে না।

স্বাতি জবাব দিল।

বললুম: তা না লাগুক। তবু জানবার কৌতূহল আছে।

স্বাতি ভাবল খানিকক্ষণ, তারপর ভ্রূকুটি করে জবাব দিল: যা বলেছে তার সরল মানে হল এই রকম—কুকুর রাজা হলেও সে জুতো কামড়াবে। তুমি যা, তা তো জানতে কারও বাকি নেই। কুবেরের ঐশ্বর্য পেলেও তোমার মনের প্রসার যে হবে না, তাতে তার সন্দেহ নেই এতটুকু।

স্বাতির ক্ষোভের ভেতর এমনি কোন ক্ষতের চিহ্ন আমি দেখছিলুম। মিত্রা যে সংসারে লালিত, তারা চিরদিনই আমাদের এই চোখে দেখেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর উত্তরাধিকার তারা পেয়েছে রাজার জাতের কাছ থেকে। আজ প্রজার জাত হাতে নিয়েছে রাজদণ্ড, তবু তাদের মত বদলায়নি। রাজার জাতের অনুগ্রহ যারা একদিন পেয়েছে, তাদের মত হয়তো বদলাবেও না। হেসে বললুম: এতে দুঃখ পাবার কী আছে? মানুষকে তারা কোনদিন শ্রদ্ধা করে নি। তার জন্যে আরও সময় লাগবে। মানুষকে মানুষ বলে যেদিন

আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখব, সেদিন আমাদের মুক্তি হবে, দীর্ঘদিনের দাসত্ব ঘুচবে সেদিন।

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে স্বাতি তার আপত্তি জানাল, বলল: না না গোপালদা, এসব তত্ত্বের কথা, তর্কের কথা। তুমি নিজের কথা বল, পাঁচ জনের কাছে ছোট হয়ে যাবে, এ আমি সইতে পারব না।

স্বাতি হয়তো আরও কিছু বলত, কিন্তু বাধা পেল মামীর কথায়। ঘরের বাতিটা জ্বেলে দিয়ে মামী বললেন: সন্ধ্যেটা তোমরা অন্ধকারেই কাটালে, বাতি জ্বালবারও দরকার হল না।

আমি লজ্জা পেলুম। ঘরে বসে বাইরের অন্ধকার এতক্ষণ দেখতে পাইনি, আলোয় এবারে তা দেখলুম। দরজার দিকে চেয়েই দেখি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যেন ক্ষুধার্ত জন্তুর মত চৌকাঠের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

স্বাতি অপ্রতিভ হল না, বলল: তোমার সন্ধ্যে হয়েছে মা?

এই তো সারলুম।

মামী জবাব দিলেন।

বাবা কোথায়?

স্বাতির প্রশ্ন শুনে মামী হেসে ফেললেন, বললেন: তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে, এতক্ষণ বাড়ি ছিলি না।

সত্যিই ছিল না। কিন্তু সে কথা বলবার আগেই মামী বললেন: বাইরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছেন।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলুম। বাধা দিয়ে মামী বললেন: তুমি উঠলে কেন, তোমার কাছেই যে এলুম।

আমার আশ্চর্য বোধ হল। মামী গল্প করতে ভালবাসেন, এ কথা আমার জানা ছিল না। বসে পড়ে বললুম: আমার কাছে?

মামী হেসে বললেন: বাইরে বসে আমরা তোমার কথাই আলোচনা করছিলুম। ও বাড়িতে ছেলে কেন বাঁচে না সে সংবাদ—

প্রশ্নটা মামী শেষ করলেন না। আমি বুঝতে পারলুম। সংস্কার যখন বারে বারে সত্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন আর তাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ সমস্যা আমার জীবন-মরণের। বৈজ্ঞানিক প্রথায় তাকে যাচাই না করে হৃদয়াবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার উচিত হয়েছে কিনা, মামী হয়তো সেই কথাই জানতে চাইছেন। বললুম: সেসব জানবার প্রয়োজন তো ফুরিয়ে গেছে মামীমা। রাজী যখন হয়েছি, তখন প্রাণের ভয়ে আর পিছিয়ে আসতে পারিনে।

উত্তরে মামী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

স্বাতি বলল: জীবনের চেয়ে কথার দামই তোমার কাছে বড় মনে হচ্ছে?

বললুম: যতদিন মা বেঁচে ছিলেন, ততদিনই আমার জীবনের দাম ছিল। আজ কে আমার জীবনের দাম দেবে?

স্বাতির কাছে কোন উত্তর পাব না জানি, তবু আমি তার মুখের দিকে তাকালুম। তার চোখের ভাষায় মনের ভাব পড়তে পারি কিনা সেই লোভে। মনে হল, খানিকটা যেন পেরেছি। উত্তর দিতে না পারার বেদনা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল তার দুচোখের দৃষ্টিতে।

আরও কিছু ভাববার আগেই মামীর উত্তর শুনতে পেলুম: বালাই ষাট! অমন কথা মুখে আনতে নেই গোপাল। মা নেই বলে কি আপনার জন তোমার কেউ নেই দুনিয়ায়?

আমি তাঁকে আঘাত দিতে চাইনি, তাই ফিরিয়ে নিলুম নিজের কথাটা। বললুম: আপনাদের স্নেহের কথা আমি কোনদিন ভুলব না।

স্বাতি বলল: সেইটে তো বড় কথা নয় গোপালদা। আমাদের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি চিরদিনের মত চুকে গেছে, যে কয়েকটা মামুলি কথা বলে আমাদের ভুলিয়ে রেখে যাবে? বাবা-মার

কাছে স্নেহ যদি কিছু পেয়েই থাক তো তাঁদের এড়িয়ে যাওয়া তো তোমার চলবে না।

কে বললে আমি এড়িয়ে যাচ্ছি: আমি আপত্তি জানালুম: এড়িয়ে যাবার প্রয়োজন থাকলে আরও সহজে তা সারতে পারতুম। সেধে কৈফিয়ৎ দিতে আসতুম না।

এসব হেঁয়ালি কথা মামীর ভাল লাগে না। তিনি সাদাসিধে মানুষ, সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব চান। তাই আমার কথা মেনে নিয়েই জানতে চাইলেন: জ্ঞানশঙ্করবাবুর কটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল?

এসব খবর আমি বৃন্দাবনে মাসির কাছে পেয়েছি। বললুম: তিনটি। একটু বেশি বয়সে কর্তা বিয়ে করেছিলেন, সন্তানও হয়েছিল দেরীতে। দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে, ভূমিষ্ঠ হয়ে বছর না ঘুরতেই মারা যায়।

বাইরের ভদ্রলোকটি চলে গিয়েছিলেন। মামা ঘরে এসে গল্প শুনতে বসলেন। মামী বললেন: আহা রে!

আমাকে বলছ?

দুচোখ বিস্ফারিত করে মামা প্রশ্ন করলেন।

স্বাতি হেসে উঠল। মামী বললেন: তোমাকে বলব কেন? কথা হচ্ছিল জ্ঞানশঙ্করবাবুর। গোপাল বলছে, প্রথম পক্ষের নাকি তিন তিনটি সন্তান হয়ে মারা যায়, বছরও ঘোরেনি।

এ গল্প মামার জানা। বললেন: কী করবে বল, যমুনা হলেন যমের ভগিনী। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে যে কারও নিস্তার নেই, সে কথা জ্ঞানশঙ্কর বুঝল না।

আক্ষেপ করে মামী বললেন: নিজের ছেলেকে যমুনার জলে ফেলে দেওয়া, সেই বা কে পারে বল?

মামা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বললেন: একটা কথার জবাব দিতে পার গোপাল?

বলুন।

আমি জবাব দিলুম।

মামা বললেন : জ্ঞানশঙ্করের বাড়ীতে তাঁর আত্মীয় কেউ আছেন ?

তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে আমি হেসে ফেললুম।

মামা বললেন : হাসি নয় গোপাল, প্রশ্নটা অত হাল্কা ভেব না।

বললুম : বড় মাসির কাছে সে খবরও জেনে নিয়েছিলুম। তাঁর এক সম্বন্ধে ভাই হরিপদ তাঁর কাছে থেকেই লেখাপড়া শিখত।

জ্বল জ্বল করে উঠল মামার চোখ দুটো, বললেন : তারপর ?

বললুম : বছর তিনেকের মধ্যেই প্রথম ছেলে দুটো মারা গেল। সুস্থ স্বাস্থ্যবান ছেলে হত না, হত রুগ্‌ণ ক্ষীণজীবী ছেলে। ওষুধ আর পথ্য খেয়েই কয়েকটা মাস কাটাত, সাবুর পায়েস খেয়ে হত অন্নপ্রাশন। বছর দুয়েকের ব্যবধানে মেয়ে হল একটি। সরু সরু হাত পা, লিকলিকে রিকেটি চেহারা। প্যান প্যান করে কাঁদে, আর খেতে চায় না কিছুই। বোতলে দুধ ভরে আনে আয়া, মেয়েকে কোলে ফেলে সেই দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করেন মাসি, আর কর্তা নিজে সেই খাওয়ার তদ্বির করেন দূরে একটা মোড়ায় বসে। একদিন—

পরম কৌতূহল নিয়ে মামা তাকালেন মামীর দিকে, তারপর নিজের চেয়ারখানা আরও একটু কাছে টেনে আনলেন। বললুম : একদিন কিছুতেই মেয়েটা দুধ খেতে চাইছিল না। রবারের ফুটো চুঁয়ে যেটুকু দুধ মুখে যাচ্ছিল, সেটুকুও থু থু করে ফেলছিল বাইরে। কর্তা বললেন, দুধে চিনি দেয়নি নাকি ? আয়া দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, দিয়েছি তো মা। মাসির বিশ্বাস হল না, একটুখানি হাতে ঢেলে চেখে দেখলেন। কেমন একটা নোন্‌তা কটু স্বাদ, মিষ্টি নেই তাতে। মাসি বললেন, এ কোন্ চিনি আয়া ? আয়া বলল, সেই বোয়েমের চিনি তো মা, বড় দানার সাদা চিনি। কর্তা পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন সেই চিনি, কিন্তু বোয়েমটি আর

খুঁজে পাওয়া যায়নি। আয়ার চাকরি গেল, আর হরিপদকে তাড়ালেন বাড়ি থেকে। মাসি আপত্তি করেছিলেন, হরিপদর দোষ কী? ঐটুকু ছেলে হরিপদ—! গম্ভীরভাবে কর্তা বলেছিলেন, হরিপদ আর ঐটুকু নেই, দুবার ফেল করেছে থার্ড ক্লাসে। হস্টেলে থেকেই ও পড়ুক। কিন্তু তবু মেয়েটা বাঁচল না। কেঁদে ককিয়ে কয়েকটা দিন বেশি বেঁচেছিল মাত্র।

চিন্তিতভাবে মামা বললেন: হরিপদ এখন কোথায়?

হরিপদর খবর আমি নিয়েছিলুম, বললুম: এলাহাবাদেই কী একটা চাকরি করে।

মামা বললেন: আলাপ হয়েছে তার সঙ্গে?

বললুম: না, তার প্রয়োজন বোধ করিনি।

জ্ঞানশঙ্করেরও কি এই মত?

মামা প্রশ্ন করলেন।

সংক্ষেপে জবাব দিলুম: জানিনে।

মামা ক্ষেপে উঠলেন, বললেন: জানিনে মানে? কিছু না জেনে শুনেই তুমি রাজী হতে পার, কিন্তু আমাদেরও তো একটা মতামত আছে।

স্বাতি খুশী হল মামার কথা শুনে। আমি তার উজ্জ্বল চোখে সেই আনন্দের আভাস দেখতে পেলুম। কিন্তু আমার উত্তরটা একটু কঠিন হয়ে গেল, বললুম: আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন, কোন ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন আমি দেখিনে।

তা দেখবে কেন: মামা যেন গুমরে উঠলেন: তোমার বাপ আমাদের জ্বালিয়েছে, আর তুমি জ্বালাবে না!

এ স্নেহের অভিযোগ। দুর্বল অসহায় তাঁর কণ্ঠস্বর, প্রতিবাদের অপেক্ষা রাখে না।

মামী আপত্তি করলেন, বললেন: ছি ছি, পুরনো কথা কেন টেনে আনছ? যা বলবার গোপালকে বল।

রাগ করে মামা তাঁর পাইপ আর পাউচ বার করলেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে আগুন ধরাতে বসলেন তাতে। আমরা চুপ করে রইলুম।

৯

বাইরে একখানা খাটিয়া নামিয়ে শোবার আয়োজন করছিলুম। মামা বললেন: কথা শোনা তো তোমার কুষ্ঠীতে লেখেনি, তবু বলি কাজটা ভাল হচ্ছে না। বাইরে শোবার অভ্যেস নেই তোমার, শেষটায় অসুখ না করে।

হেসে বললুম: শরীরের নাম মহাশয় মামাবাবু।

তিনি যে বিরক্ত হলেন, তা তাঁর উত্তর শুনেই বুঝতে পারলুম, বললেন: হ্যাঁ, তা ভুগে ভুগেই বাইরে শোবার অভ্যেস হয়ে যাবে।

আমি আর কথার জবাব দিলুম না।

এক সময় রাগ করে তিনি শুতে চলে গেলেন। মামী আগেই শুয়ে পড়েছিলেন। স্বাতির সাড়া পাইনি অনেকক্ষণ, সে যে শোয়নি সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলুম। বাতি নিবিয়ে দরজা বন্ধ করা তার বাকি আছে। আমি শুয়ে পড়লুম।

চোখে ঘুম ছিল না। নানা দুর্ভাবনায় মন আমার অস্থির হয়ে উঠল। এ কোথায় কিসের ভেতর জড়িয়ে ফেলছি নিজেকে! এ জন্যে তো আমার জন্ম হয়নি। বাবার কাছে শিক্ষাও যে পেয়েছি অন্য রকম। আমার আদর্শ কি আজ এমনি করে ভেসে যাবে?

নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছিলেন আমার বাবা। তাঁর ধ্যান জ্ঞান পরম তপ ছিল ছাত্র। বিদ্যালয়ের বাইরে যে জগৎ, সেখানে তাঁর ভয় তাঁর সঙ্কোচ প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে অস্থির করেছে। নিজের গৃহকেও তাই বিদ্যালয়ে পরিণত করেছিলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই

নিয়েই বিয়াল্লিশটা বছর বেঁচে ছিলেন। যে বারে ম্যাট্রিকুলেশন দেব, সেইবারে তিনি মারা গেলেন।

শৈশবের কথা আমার মনে আছে। মা কোনদিন সে কথা ভুলতে দেননি। প্রথম যখন কথা কইতে শিখলুম, সেই আধো আধো গলায় সুর মিলিয়ে স্তোত্রপাঠ করতুম বাবার সঙ্গে। মানে বুঝিনি, কিন্তু মনে গাঁথা হয়ে গেছে। পরে সেইসব শ্লোকের মানে বুঝলুম রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন পড়ে। রবীন্দ্রনাথ পড়ে যে উপনিষদে হাতেখড়ি হয়, সে শিক্ষা আমি তাঁর কাছেই পেয়েছিলুম।

তারপর হাতের লেখা লিখতে শুরু করলুম। ঐক্য বাক্য মাণিক্য নয়, লিখলুম জল পড়ে পাতা নড়ে। লিখলুম, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। লিখলুম, মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে। কটা বছর যেতে না যেতেই লিখলুম, এ পাখার বাণী দিল আনি···পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ। আমার অন্তরেও এল আবেগ, ওড়বার নয় পড়বার। আমি প্রাণ ভরে পড়লুম। রবীন্দ্রনাথ শেষ করে মনে হল, আমার সব পড়া হয়ে গেছে। বাবাকে সেই কথা বলতেই তিনি হেসে বললেন, সব মনে রাখতে পারলেই সব পড়া হয়েছে। তাঁর সেই হাসিটি আমার আজও মনে আছে।

সেদিন রাতে তিনি আমায় একটি গল্প বলেছিলেন। ফ্রান্সের এক শিক্ষকের গল্প। তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল বাছাবাছা কয়েকজন লেখকের বই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাঁরা শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁদেরই শ্রেষ্ঠ লেখা। জগতের সম্মান পাবার আগে কোন লেখকের কোন লেখা তিনি পড়তেন না। শুনতেন একজনের, তাঁর এক ছাত্রের। তখন স্বদেশে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু মাস্টার মশায়ের কাছে তাঁর ভয় ভাঙেনি। দুরু দুরু বুকে তিনি তাঁর লেখা শোনাতে আসতেন। বিশ্বাস করতেন যে মাস্টারমশাই ভাল বললে, সে লেখা সারা বিশ্বের লোক ভাল বলবে। হতও তাই। ছাত্রের কাছে মাস্টার মশায়ের গল্প শুনে একবার দেশের

লোক তাঁর বক্তৃতা শুনতে চাইল। ঘরের বাইরে তিনি কিছুতেই বেরবেন না। শেষে এই সর্তে রাজী হলেন যে তাঁর লেখা কোথাও ছেপে প্রকাশ করা হবে না। তিনি বক্তৃতা দিলেন, স্তব্ধ হয়ে শুনল ফ্রান্সের জ্ঞানী গুণী বিদ্বজ্জন। এমন বক্তৃতা নাকি তাঁরা জীবনে কখনো শোনেননি। বাবা বলতেন, সব কি আর পড়া যায়? বাছা বাছা লেখাই পড়তে হয়। তাতেই হয় সব পড়ার কাজ।

আরও বলতেন, রবীন্দ্রনাথ সেই জাতের লেখক, যাঁকে ভাল করে পড়লে দুনিয়ার অনেক লেখা পড়া হয়ে যায়। তবু আমি দুনিয়ার অনেক লেখকের লেখা পড়তে চেষ্টা করেছি। কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝিনি। কিছুই আসে যায় না তাতে। বাবা বলতেন, বুদ্ধির পেছনে আছে একটা ঘুমন্ত মন, সেইখানে সেই পড়ার ক্রিয়া হয়। আজ যা বোঝা গেল না, একদিন সেই না-বোঝা কথা নিজের কথা হয়ে বেরিয়ে আসবে। তপস্যা তো শরীরের কসরৎ নয়, বুদ্ধির বিকাশ। যতটুকু জানা আছে, তার পরের কথা জানবার জন্যে সাধনা।

আর একজন শিক্ষকের গল্প পড়েছিলুম একখানা ইংরেজী বইয়ে। ম্যাথু আর্নল্ডের পিতা ডক্টর টমাস আর্নল্ডের কথা। তাঁর মৃত্যুর মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে এল, তখনও তাঁর ছাত্রদের কথা তিনি ভুলতে পারেননি। চোখ বন্ধ করে বলেছিলেন, ওরে, সন্ধ্যে যে হয়ে এল, এবার তোরা ঘরে যা। সেই তাঁর শেষ কথা। বাবার মৃত্যুর ক্ষণটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। 'মাই বয়েজ্' বলে তিনি তাঁর ছাত্রদের ডাকেননি সত্য, কিন্তু নির্বাক চোখে খুঁজেছিলেন অনেককে— শুধু আমাকে দেখেই তৃপ্ত হননি। তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ না হয়ে বাষট্টি হলে হয়তো 'মাই বয়েজ্' বলেই ছাত্রদের ডাকতেন।

ম্যাথু আর্নল্ড হতে পারব না জানি, কিন্তু সেই উচ্চাশাই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। পৈতৃক ভিটে আর সামান্য কিছু জমিজমা ছাড়া আর কিছুই বাবা রেখে যাননি। দরকারও হয়নি। ম্যাট্রিকের ফল দেখেই কলকাতার অনেকগুলো কলেজ ডেকে পাঠাল।

কলেজের ফী লাগল না, হস্টেলের খরচা দিতে হল না, বৃত্তির টাকা পাঠাতুম মায়ের কাছে। একবেলা ছাত্র পড়িয়ে আরও কিছু টাকা পেতুম। এতে মার গভীর আপত্তি ছিল। তাঁর আপত্তির কারণ আমি জানতুম। আই. এ.র ফল খারাপ হলে আমার বৃত্তি বন্ধ হবে, তাহলে আর পড়া হবে না। আমার জীবনের ওপর প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ ছিল কারও। সব কটা পরীক্ষাই আমি সসম্মানে পাশ হয়ে গেলুম।

মায়ের মৃত্যু হল এই সময়ে। তিনি বেঁচে থাকলে আমার জীবন অন্য রকম হত। অন্তত অন্য রকম করবার চেষ্টা করতে হত। তাঁর ছেলে জজ হবে কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট, এই রকমের আশা ছিল তাঁর মনে। অনেকবার তাঁর মুখে এ কথা শুনেছি। বলতেন, গোপাল, দিল্লীতে গিয়ে তোকে পরীক্ষা দিতে হবে। ওপর থেকে তোর বাবা তোকে আশীর্বাদ করবেন।

কেন আমি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টা করলুম না, সে কথা ভাল করে ভেবে দেখিনি। পরীক্ষার ভয় ছিল না তা জানি। খরচও জুটিয়ে নিতে পারতুম। তবু কেন গেলুম না! একদিন মনে হয়েছিল, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যে আনন্দ, সে আমার নয়। আমার অন্য পথ, কিন্তু সেই পথ কি আজও খুঁজে পেয়েছি?

এই ভাবটি যে বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলুম, তাতে আজ আমার সন্দেহ নেই। তিনি অহংকারী ছিলেন না, তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল। সেইটেকেই লোকে অহংকার বলে ভুল করত। মামাও ভুল করেছিলেন। বাবার সঙ্গে তাঁর কোন রেষারেষির কথা মায়ের কাছে শুনিনি। তবে মৃত্যুর পূর্বে বাবা যে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন, পরে তা জানতে পেরেছিলুম। বলেছিলেন, জীবনে দুর্যোগ আসে অনেক, কিন্তু ওপরে ভগবান আছেন। দয়ার জন্যে মানুষের দ্বারস্থ যেন আমরা না হই। বাবার এই অনুরোধকে মা আদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং মামার সমস্ত সাহায্য তিনি কঠিন ভাবে

প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এসব আমি জানতুম না। শুনেছিলুম অনেক পরে, রাগের মাথায় মামাই একদিন বলে ফেলেছিলেন। তবু যে তাঁর স্নেহ আমি হারাইনি, এ কথা ভাবতে ভাল লাগে।

অনেকক্ষণ থেকে একটা মিষ্টি সুর কানে এসে লাগছিল। ভাল করে শুনেই বুঝতে পারলুম যে ঘরের ভেতর স্বাতি সেতার বাজাতে বসেছে। ভারি মিষ্টি হাত, মীড় টেনে টেনে আলাপ করে যাচ্ছে আপন মনে। কিন্তু বড় করুণ বড় উদাস সেই সুরটি। ভাবনার জাল আমার ছিঁড়ে গেল, আমি উৎকর্ণ হয়ে তার বাজনা শুনতে লাগলুম।

এক সময় মনে হল, স্বাতি আমার মনের সুরটি যেন ধরতে পেরেছে। একমুঠো কাশ ফুলের মত সেই সুর ভেসে বেড়াচ্ছে দুরন্ত বাতাসে। তার গতির প্রবাহ নেই, স্থিতিও নেই, লক্ষ্যহীন ভাবে জটলা পাকাচ্ছে। একটা শ্রান্ত ঔদাস্যে মন আমার ভরে গেল।

স্বাতিকে আজও আমি চিনতে পারিনি। তার মনের কথাটি আজও আমার অজানা রয়ে গেছে। সে চায়, মিত্রার অহংকার আমি ভেঙে দিই। কিন্তু তার পরিণামটুকু সে ভেবে দেখেছে কি? গায়ের জোরে তো অহংকার ভাঙে না। যে জোরে ভাঙে তার ক্ষমতা আণবিক। সে প্রেম। যুগে যুগে এই অস্ত্রে নারী পুরুষকে জয় করেছে, আর নারীকে পুরুষ। সশস্ত্র মানুষকে জয় করেছে নিরস্ত্র মানুষ। কোটি কোটি পাপীকে উদ্ধার করেছেন এক একজন মহাপুরুষ।

না না, স্বাতি নিশ্চয়ই এ কথা বলেনি। এ কথা সে বলতে পারে না। সে যা বলতে চেয়েছে, তা সে প্রকাশ করতে পারেনি। তার মুখের কথাকে সত্য বলে মেনে নিলে তাকে ভুল বোঝা হবে। সে ভুল বোঝার দিন আমি পেরিয়ে এসেছি।

তান শেষ করে স্বাতি তখন ঝালা ধরেছে। অত্যন্ত দ্রুত

উঠছে ঝঙ্কার। মনে হল, নিজেকে আমি যেন হারিয়ে ফেলছি। আমার চেতনা যেন অবশ হয়ে আসছে। ভুলে গেলুম আমার উত্তরপাড়ার ঘর, ভুলে গেলুম এলাহাবাদের ঐশ্বর্য আর দিল্লীর দরবার। মিত্রা হারিয়ে গেল। জগৎটাকেই আর যেন দেখতে পাচ্ছিনে। স্বাতি সেতার বাজাচ্ছে। আমি কি ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালবেলায় স্বাতি বলল : কাল বাজনা শুনেছিলে আমার? বেহাগ বাজিয়েছিলাম।

১০

ছোট একটা পোলের ওপর ট্রেন উঠতেই বুকের ভেতরটায় ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ে গেল যমুনার কথা। চলতি গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়াবার চেষ্টা করলুম। গরাদে বাধা পেয়ে ফিরিয়ে নিলুম মুখখানা। ডাইনে বাঁয়ে কোন দিকেই যমুনা দেখা যাচ্ছে না।

ভালো করে যমুনা দেখেছিলুম হুমায়ুনের সমাধিসৌধের ওপর থেকে। বিস্তীর্ণ বালির ভেতর দিয়ে শীর্ণ জলধারা ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে, প্রকৃতির সাদা বুকের ওপর পড়ে আছে একফালি নীল কাপড়। বেগ নেই, গর্জন নেই, তবু ভয় পেলুম। যমুনা যে যমের ভগিনী। আর কটা দিন পরে ঐ ধারা বইবে আমার জীবনের ওপর দিয়ে।

পরদিন আমরা একটু সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। গাড়ি নিয়ে রাণারা একটু তাড়াতাড়িই এসেছিল। বলেছিল, ভালো প্রোগ্রাম করেছি, এই বেলা বেরিয়ে পড়লে মোগলদের সব কিছুই দেখা হয়ে যাবে। দিল্লীতে যা কিছু আজ আছে, সবই তো মোগলের।

মামীর তাড়া এতে দেখা যায়নি। তাই যোগ করেছিল : ফোর্টের আর্কেয়লজিকাল অংশটি বন্ধ হয়ে যায় ঠিক এগারটাতেই। আমরা নয়া দিল্লীর দিক থেকে যাচ্ছি কিনা, ফোর্ট সকলের শেষে পড়বে।

স্বাতি তৈরি হয়ে এসেছিল, বলল : কী প্রোগ্রাম করেছেন দেখি।

খুশী হল রাণা, এক নিমেষেই তার মানচিত্রখানা স্বাতির চোখের নিচে মেলে ধরল। বলল : নর্থ অ্যাভিনিউ দেখছেন, যেখানে আমরা আছি? এখান থেকে সোজা আসব সফ্‌দরজঙ্গের সমাধিতে। কাল আমরা কুতব রোড ধরে দক্ষিণে নেমেছিলুম। আজ পশ্চিমে ফিরব, লোদি রোড ধরে হুমায়ুন্‌স্ টুম্ব্। ডান হাতে পড়বে নিজাম্-উদ্-দীনের দরগা। তারপর ধরব দিল্লী-মথুরা রোড। পুরাণা কিলার পাশ দিয়ে ফিরোজশাহ কোটলার সামনে দিয়ে রাজঘাট ডাইনে ফেলে সোজা লালকেল্লার ভেতর।

স্বাতি বলল : চমৎকার, বাজে জিনিস একটিও দেখছিনে তাহলে।

রাণার তাড়ায় তাড়াতাড়িই বেরতে হল।

গাড়িতে বসেই স্বাতি বাচাল হয়ে উঠল, বলল : সফ্‌দরজঙ্গে কী দেখবার আছে রাণাবাবু?

জানা কথার উত্তর দিতে রাণার ভাল লাগে। বলল : সফ্‌দরজঙ্গ ছিলেন একজন মোগল ওমরাহ, অযোধ্যার দ্বিতীয় নবাব। তার আগে ছিলেন দ্বিতীয় আহমদ শাহর উজীর। তাঁরই সমাধি।

এরই সঙ্গে যোগ করল : হুমায়ুনের সমাধিতে মোগল স্থাপত্যের যে উৎকর্ষ দেখা যায়, এইখানে তা শেষ হয়ে গেল।

সফ্‌দরজঙ্গ থেকে নিজাম্-উদ্-দীনের দরগার দিকে যেতে যেতে স্বাতি বলল : আপনার বইগুলো কাল আমাদের কাছে রেখে গিয়ে ভালই করেছিলেন। নিজাম্-উদ্-দীনের দরগার সব কিছুই আমার জানা হয়ে গেছে।

রাণা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। পেছন ফিরে আমি বললুম: জানা হয়নি দেবলাদেবীর কাহিনী। আমির খসরুর কথা আছে, আছে আলা-উদ্-দীন খিলজীর কাব্যরসিক পুত্র খিজির খানের বীরত্বের উল্লেখ। কিন্তু দেবলাদেবীর কথা নেই, যা লিখে আমির খসরু অমর হলেন। কবিতা লিখলেন ফার্সিতে, আজ পূজো পাচ্ছেন উর্দুর প্রথম কবি বলে।

দেবলাদেবী কে গোপালদা?

স্বাতি প্রশ্ন করল।

এখন সে কাহিনী থাক: আমি জবাব দিলুম: তার জন্যে অন্য পরিবেশ চাই।

আমার আপত্তির কারণ বুঝতে না পেরে স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বললুম: আমির খসরুর আরেকটা পরিচয় আছে। তিনি সুগায়ক ছিলেন। তানসেনের জন্ম হয়েছে তাঁরই চেষ্টার ফলে।

কথাটা অদ্ভুত শোনাল। বললুম: প্রকাশ্যে সঙ্গীতের অনুষ্ঠান ছিল ইসলাম ধর্মবিরুদ্ধ। আমির খসরু নিভৃতে সঙ্গীতের অনুশীলন করেছিলেন। আর দরবারে গানের প্রচলন করেছিলেন ঘিয়াস-উদ্-দীন বাদশাহর অনুগ্রহে।

একটু থেমে বললুম: আজ ফকির নিজাম-উদ্-দীন আউলিয়া অমর হয়ে আছেন ঘিয়াস-উদ্-দীন তুঘলুকের সঙ্গে শত্রুতার জন্যে। ঘিয়াস-উদ্-দীন নিজে প্রাণ দিয়ে ফকিরকে অমর করেছেন। সঙ্গীতকেও অমর করে গেছেন। তাঁর স্বল্পায়ু রাজত্বকালে দিল্লীর দরবারে গানের প্রচলন করে না গেলে পরবর্তী কালে তানসেনের জন্ম হত কিনা সন্দেহ। বছরে বছরে মেলা বসে আউলিয়ার পুকুরের পাড়ে, আর আমির খসরুর সঙ্গে ঘিয়াস-উদ্-দীনের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে শিল্পিজনের মনে। ধর্মে অন্ধতা আছে, শিল্পে মুক্তি।

দরগা থেকে আমরা হুমায়ুনের সমাধিতে এলুম। ওপর থেকে

দেখলুম যমুনার ধারা। ঠিক এমনটি আগে দেখিনি, দু তটের বালির বিস্তারের ভেতর এমন ঘন নীল জলধারা। স্বাতি বলল: যমুনার জল এমন নীল কেন রাণাবাবু?

নদীর জল তো নীলই হয়।

রাণা উত্তর দিল।

তাই কি: স্বাতির যেন বিশ্বাস হল না একথা, বলল: প্রয়াগের সঙ্গমে শুনেছি জলের রঙ দেখে যাত্রীরা নদী চেনে। গঙ্গার জল সাদা আর নীল যমুনার। একসঙ্গে মিশেও যেন মেশেনি, যতদূর দৃষ্টি যায় রঙের স্বাতন্ত্র্য তারা বজায় রেখেছে।

রাণা আশ্চর্য হল, বলল: আমি দেখিনি।

মামা আমার মুখের দিকে চাইলেন, লজ্জায় আমি মাথা নিচু করলুম।

মাথা নোয়ালে যে।

স্বাতি জিজ্ঞাসা করল। মিত্রা হাসল তার ভঙ্গী দেখে।

বললুম: আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র নই, বৈজ্ঞানিক কারণ আমি জানিনে।

পৌরাণিক ঐতিহাসিক কিছু বল।

স্বাতি আদেশ জানাল।

বললুম: তা জানি।

তারপর যমুনার উৎপত্তিকথা শোনালুম মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে।

বললুম: হরিবংশে আছে যে সূর্যের তেজে তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞার সুন্দর দেহ জ্বলে গিয়ে বিবর্ণ হয়। এইজন্যই তাঁর পুত্র কন্যা যম ও যমুনার বর্ণ শ্যাম।

মিত্রা এবারে হাসল না, বলল: পুরাণে আপনার গভীর বিশ্বাস, তাই না?

বললুম: যুক্তির শেষ আছে, বিশ্বাসের নেই। যুক্তি দিয়ে যার নাগাল পাইনে, বিশ্বাসে তাকে পূরণ করি। আমি পুরাণ পড়েছি

অন্য কারণে। কিছু গ্রহণ বা বর্জন করবার আগে তার মূল্য যাচাই করে নেয়া দরকার। শুধু একটা ধারণা সম্বল করে আর যাই করা যাক, মামলার রায় দেওয়া যায় না।

মিত্রার মুখ যে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল, তা আমার দৃষ্টি এড়াল না। দেখলুম, স্বাতিও তা লক্ষ্য করেছে। বলল: চল নিচে যাই।

নিচে নামতে নামতে রাণা আমাদের ইতিহাস শোনাল, বলল: হুমায়ুনের মৃত্যুর প্রায় বছর নয়েক পরে তাঁর বেগম হামিদাবানু এই সমাধি নির্মাণ করেন। বেগমের কবরও আছে এর ভেতর, আছে দারা শিকোর কবর, ফারুখসিয়ার আর দ্বিতীয় আলমগিরের কবরও। এঁদের হত্যার কাহিনী মোগলের কলঙ্ক বলে পরিচিত।

একটু থেমে বলল: সিপাহী বিদ্রোহের সময় এইখেনেই আশ্রয় নেন বাদশাহ বাহাদুর শাহ। ইংরেজ তাঁকে এইখেন থেকেই ধরে নিয়ে যায়।

নিচে নেমে এসে আমি সৌধটি দেখছিলুম ভাল করে। লাল পাথরের তৈরি, গম্বুজটি সাদা মার্বেলের। তাজমহলের সঙ্গে কোথায় যেন খানিকটা মিল আছে। রাণা ঠিক সেই কথাই বলল: দেখছেন তো গোপালবাবু, এই মডেল দেখেই তাজমহল তৈরি হয়েছিল।

স্বাতি হেসে বলল: এমন স্বামী স্ত্রী আজকাল আর দেখা যায় না।

এ কথার মানে বুঝতে না পেরে রাণা তার মুখের দিকে তাকাল। মিত্রাও চাইল তার দিকে। আমি বললুম: সেকথা সত্যি। হুমায়ুনের বেগম তাঁর স্বামীর সমাধি গড়লেন আর শাজাহান বাদশা গড়লেন তাঁর স্ত্রীর সমাধি।

মামামামী শুনতে না পান, এমন মৃদু স্বরে বললুম: দাম্পত্য প্রেমের এমন পরাকাষ্ঠা আজকাল দুর্লভ।

মিত্রার মুখ কঠিন হল, কিন্তু রাণা এগিয়ে গেল হাসতে হাসতে।

প্রশস্ত রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েই রাণা একবার আমার দিকে

তাকাল। বলল: দেবলাদেবীর গল্প শোনাতে কীরকমের পরিবেশ চাই আপনার?

পেছন থেকে স্বাতি বলল: চাঁদ জ্যোৎস্না—

আমি ফিরে তার মুখখানি দেখবার চেষ্টা করলুম। মিত্রা হাসছিল মুখ টিপে টিপে। কটাক্ষে রাণাকেও দেখলুম। হাতে স্টিয়ারিং না থাকলে সে হয়তো হেসেই গড়িয়ে পড়ত। নিজেকে সংবরণ করে নিলুম, বললুম: জ্যোৎস্না রাতে দেবলাদেবীকে ঠিক চেনা যাবে না। দিনের আলোতেই সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে।

হাসি থামিয়ে রাণা আমার মুখের দিকে চাইল।

বললুম: কলকাতার রঙ্গমঞ্চে দেবলাদেবীর অভিনয় দেখেন নি?

আশ্চর্য হয়ে রাণা বলল: দেবলাদেবী অভিনেত্রী?

পেছন ফিরে দেখলুম স্বাতি ও মিত্রা দুজনেই খানিকটা আশ্চর্য হয়েছে। এবারে আমার হাসবার পালা। কিন্তু তার আগেই মামা হেসে উঠলেন, বললেন: এ কি আজকের নাটক! ছেলেবেলায় আমরা দেখেছি এর অভিনয়। তখন দেবলাদেবী সাজত—

বলে ভাবতে লাগলেন।

তাঁর ছেলেবেলার কথা আমার জানা নেই।

কে সাজত বল তো?

মামা প্রশ্ন করলেন। আমাকে নয়, মামীকে।

অনাসক্তভাবে মামী উত্তর দিলেন; সে কি আর মনে আছে!

অভিনেত্রীর নাম মনে না থাকলেও গল্প মনে আছে মামার। বললেন: উঃ কী সাংঘাতিক শেষ দৃশ্যটা! বাপের আদেশে ছেলের মৃত্যুদণ্ড হল, আর সেই রক্তমাখা মুণ্ডু বাপকে দেখাতে আনা হল স্টেজের ওপর!

সেই বীভৎস দৃশ্য কল্পনা করে গাড়ির ভেতরেই মামা শিউরে উঠলেন। ভয়ে কে কে চোখ বুঁজলেন, তা দেখতে পেলুম না।

একটু সামলে নিয়ে মামা বললেন: দিল্লীর বাদশাহ আলা-উদ্-

দীন খিলজীর ছেলে খিজির খান। দেবগিরির রাজা বলদেবের সঙ্গে দেবলাদেবীর বিয়ে দিয়ে খিজির খান ফিরে এলেন। তারই শাস্তি হল।

সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছিল স্বাতি, বলল : বাপ হয়ে ছেলের মৃত্যুদণ্ড দিল বিয়ে দেবার অপরাধে ?

সে কি কম অপরাধ : মামা জবাব দিলেন : গুজরাট জয় করে রানী কমলা দেবীকে আনলেন আলা-উদ্-দীন খিলজী, নিজের মহিষী করলেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে দেবলাদেবী পালিয়ে গেল দেবগিরি। কমলাদেবীর অনুরোধে বাদশাহ খিজির খানকে পাঠালেন তাঁর কন্যা উদ্ধারের জন্য। খিজির দেবগিরি জয় করলেন, কিন্তু দেবলাকে আনলেন না দিল্লীতে। এ তাঁর অপরাধ নয় ?

কিন্তু তাই বলে মৃত্যুদণ্ড ?

স্বাতি যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মামা বললেন : আলা-উদ্-দীন বাদশাহ পরওয়ানা পড়ে সই করেননি, কমলাদেবীর অনুরোধে চোখ বন্ধ করে সই করেছিলেন। তবে লোকে বলে, তিনি সব জানেন।

এরপর অনেকক্ষণ আর কেউ কথা কইলেন না।

আমাদের গাড়ি যাচ্ছিল পুরাণা কিলার পাশ দিয়ে। রাণা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, বলল : নেমে দেখলে খারাপ লাগত না, কিন্তু তাতে ফোর্ট দেখা সম্ভব হবে না।

বলে গাড়িতে বসেই পুরাণা কিলার গল্প শুরু করল। বলল : পুরাণা কিলার পৌরাণিক কাহিনী শুনিয়েছেন গোপালবাবু। একদিন এইখানে ছিল পাণ্ডবের ইন্দ্রপ্রস্থ। এখনও এই গ্রামের নাম ইন্দর পথ। পনরো শো তিরিশ সালে হুমায়ুন বাদশাহ এই কিলার নির্মাণ শুরু করেন। বছর দশেক পর শের শাহ এটি শেষ করেন। এর ভেতর যে কিলা-ই-কুহ্‌না মসজিদ আছে, তাও শের শাহর তৈরি। আর যে শের মণ্ডলের সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়ে হুমায়ুন শুয়েছিলেন মৃত্যুশয্যায়, সেও এই কিলার ভেতর।

শের মণ্ডল কী রাণা বাবু?

স্বাতি শের মণ্ডল দেখেনি জেনে রাণা যেন আপশোষে মরে গেল। বলল: ছিছি, কী কেলেঙ্কারি বলুন।

রাস্তার দিকে চেয়ে বলল: একটুখানি আগে বললে···কতটুকুই বা আর সময় লাগত।

অনেকটা দূর এগিয়ে না এলে রাণা হয়তো গাড়িখানা ঘুরিয়েই নিত। তার কাণ্ড দেখে স্বাতি আরও বেশি লজ্জিত হল, বলল: না না, আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। দিল্লীতে অনেক কিছুই তো দেখিনি। তার জন্যে আমার এতটুকু দুঃখ নেই।

মামা বললেন: অন্যদিন দেখা যাবে।

রাণা কতকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল: সেই ভাল।

আমি বললুম: তেমন কিছু একটা দেখবার জিনিস নয় বলেই তো আপনি এগিয়ে এলেন।

যা বলেছেন: রাণা জবাব দিল: একটা আটকোণা দোতলা বাড়ি। হুমায়ুন তাঁর লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহার করতেন। খুব উঁচু উঁচু ধাপ। তার একটা আজও ভাঙা আছে। লোকে বলে, এই ভাঙা ধাপ থেকেই নাকি হুমায়ুন পড়েছিলেন। মারা যান তৃতীয় দিনে।

কী সাংঘাতিক!

মামী শিউরে উঠলেন।

সমর্থনের ভঙ্গীতে রাণা বলল: সে যুগের ব্যাপারটাই আলাদা। এমন সব অদ্ভুত ঘটনা শুনতে পাওয়া যায় যে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

ফিরোজ শাহ কোট্‌লা পেরবার সময় মিত্রার গলা শুনলুম পেছনে। বলল: দেবলাদেবীর কাহিনী কি ঐতিহাসিক?

পেছন ফিরে আমি তার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করলুম। দেবলাদেবীর কাহিনী শেষ করে আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি।

কৌতূহল মিটে গেছে সকলের। কিন্তু মিত্রা সেই কথাই এখনও ভাবছে জেনে আশ্চর্য হলুম।

রাণা কথা কইল না, জবাব দিলেন মামা। বললেন: ইতিহাস আমার মনে নেই। গোপাল হয়তো বলতে পারবে।

মনে মনে লজ্জা পেলেও সে কথা প্রকাশ করে লাভ নেই। বললুম: আমির খসরুর কাব্য আমি পড়িনি। তবে ইতিহাসে পড়েছি যে দেবলাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন খিজির খান নিজে। কমলাদেবীর কাহিনী সত্য বলে জানি।

মামা বুঝি চমকে উঠলেন, বললেন: এতবড় অসঙ্গতি আছে নাটকে?

এ কথার সঠিক উত্তর আমার জানা ছিল না। আমি সে কথা স্বীকার করলুম, বললুম: খিজির খান কাব্যরসিক ছিলেন আর বল্লভ ছিলেন দেবলার। এইটুকু মাত্রই জানি। ইতিহাসে এর বেশি আমি পড়িনি।

স্বাতি হঠাৎ খুশী হয়ে উঠল, বলল: সত্যি নাকি! তুমি পড়নি এমন কথাও ত্নিয়ায় কিছু আছে?

উচ্চকিত কণ্ঠে রাণা হেসে উঠল। মিত্রা হাসল মুখ টিপে। পেছন ফিরে আমি মামা-মামীকেও দেখবার চেষ্টা করলুম। মামা উপভোগ করেছিলেন রহস্যটুকু, কিন্তু মামী আরও একটু গম্ভীর হয়েছেন বলে মনে হল।

একটা বড় রাস্তা পেরবার সময় রাণা বলল: এই হল রাজঘাটের পথ।

বলে তার ডানদিকের রাস্তাটা দেখাল। বলল: বেশিদূর নয়, খানিকটা এগিয়েই মহাত্মাজীর সমাধি।

পুরনো একটা গেটের নিচে দিয়ে যাবার সময় বলল: এই হল বিখ্যাত দিল্লী গেট। এমনি গেট দিল্লীতে আরও আছে—কাশ্মীরী গেট, আজমীরী গেট—

ইস: রাণা হঠাৎ আপশোষ করে উঠল, বলল: দেখলেন! কোট্‌লার কাছে খুনী দরওয়াজা দেখাতে ভুলে গেলুম।

খুনী দরওয়াজা!

স্বাতি পুনরাবৃত্তি করল।

রাণা বলল: হ্যাঁ, খুনী দরওয়াজা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় খুনে ভেসে গিয়েছিল এই দরওয়াজা। সেই থেকে এই গেটের নাম হল খুনী দরওয়াজা।

সত্যি!

স্বাতি তার বিস্ময় প্রকাশ করল।

রাণা বলল: এ গল্প মিথ্যে নয়। একশো বছর তো এখনও হয়নি। দরিয়াগঞ্জের পুরনো বাসিন্দারা তাদের বাপ-পিতামহর কাছে গল্প শুনেছে।

লাল কিলার লাল দেওয়াল আমরা দেখতে পাচ্ছিলুম। বেশিক্ষণ আমরা নীরব থাকতে পারলুম না। স্বাতি বলল: আমরা শাহজাহানাবাদ এসে গেলাম, তাই না?

মুখ না ফিরিয়েই রাণা বলল: ঠিক ধরেছেন। এ সমস্তই শাহজাহানের কীর্তি।

বলেই মোগল কীর্তির একটা লম্বা ফিরিস্তি দিল রাণা, বলল: বাবরের কিছুই নেই, হুমায়ুনের পুরাণা কিলা দেখলেন। সাসারামের শেরশাহ স্থুরি হুমায়ুনকে হারিয়ে পনর বছর ছিলেন দিল্লীর গদিতে। তাঁর কীর্তি সব পুরাণা কিলার ভেতরে। বাইরে আছে ইসা খানের কবর আর মসজিদ। এই পথেই পড়েছিল, দেখাতে ভুলে গেছি।

একটু থেমে বলল: এবারে দেখব শাহজাহানের লাল কিলা, জামা মসজিদ, চাঁদনি চক। সফদরজঙ্গের কবর কাল দেখেছি, আদম খান আর খান-ই-খানানের কবর চৌষট্‌ খাম্বা না দেখলেও ক্ষতি নেই। জয়সিংহের যন্তর মন্তর পরে দেখব। সে আমাদের পাড়ায়।

দেওয়ান আম, লাল কিল্লা, দিল্লী
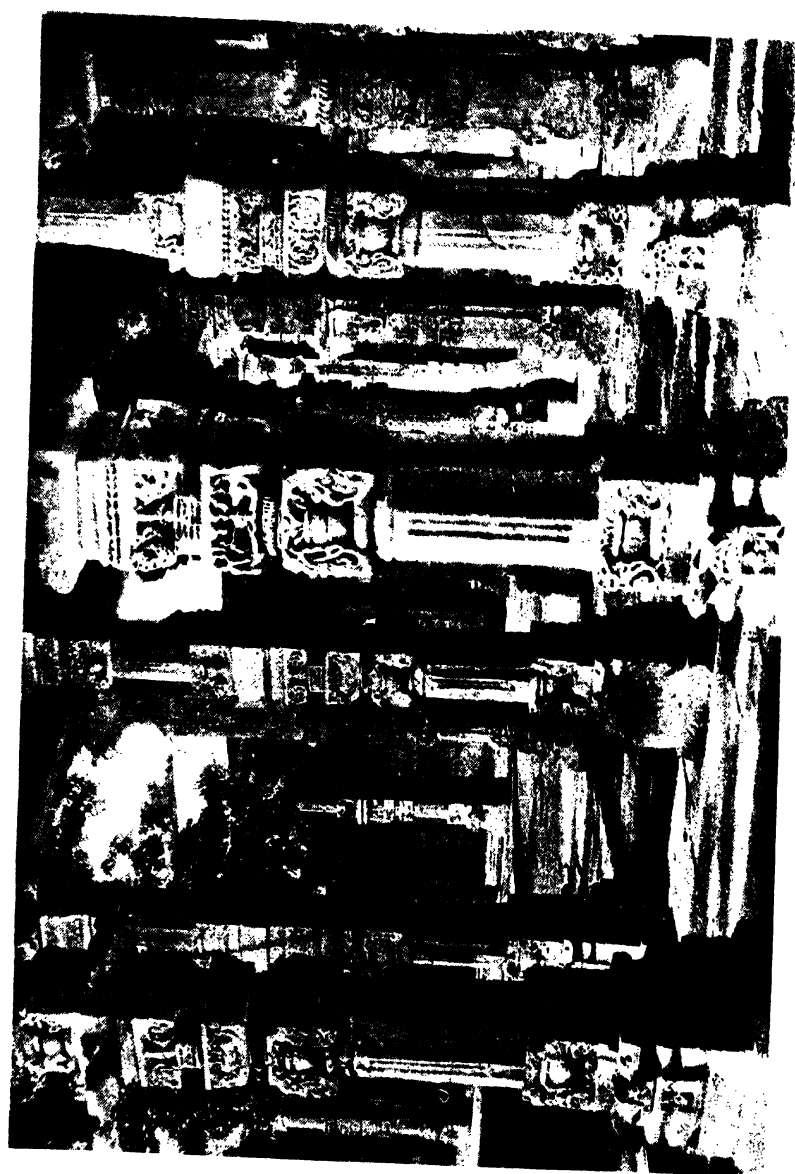
লাল কেল্লায় পৌঁছে আমরা থামলুম। মোটর থেকে নেমে বেশিদূর অগ্রসর হইনি, মিত্রাদের এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এক দীর্ঘ বলিষ্ঠ যুবক একটি সুশ্রী মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে আসছিল। অকৃত্রিম আনন্দে উচ্ছল দেখাচ্ছিল দুজনকে। মিত্রা সরে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু পাশ দিয়ে যাবার সময় সেই যুবক হঠাৎ হকচকিয়ে গেল। তখুনি আবার সামলে নিল নিজেকে, বলল: আজ তোমরা এখানে?

বাঙলা নয়, কথা কইল হিন্দুস্থানীতে।

মিত্রা উত্তর দিল না। অন্যমনস্কভাবে রাণা এগিয়ে গিয়েছিল খানিকটা, প্রশ্ন শুনে ফিরে দাঁড়াল। বলল: আরে চাওলা যে! কী খবর?

পরিচয় হল। রাণা পরিচয় করিয়ে দিল: মিস্টার চাওলা, বিজনেসম্যান, আমাদের বন্ধু।

মামাকে দেখিয়ে বলল: মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস গোস্বামী, বাবার বন্ধু এঁরা। এঁর মেয়ে আর ভাগনে।

চাওলা নমস্কার করল সবাইকে, আর হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমিও হাত বাড়িয়ে দিলুম, বললুম: গোপাল আমার নাম।

হিন্দী জানিনে বলে বললুম ইংরেজীতে।

মেয়েটির নামও জানতে পেলুম। চাওলা বলল: বীণা বাট্‌রা।

কিন্তু পরিচয় দিল না।

মিত্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একবার তার সর্বাঙ্গ বুলিয়ে গেল। কিন্তু কথা কইল না।

রাণা এগিয়ে যাচ্ছিল, কাজেই দাঁড়িয়ে আলাপ করবার সময় নেই। বললুম: আবার দেখা হবে তো?

চাওলা হেসে বলল: হবে বৈকি!

কথা না বলে মামা মামীও এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের দূরত্ব লক্ষ্য করে বলল: কোথায় উঠেছেন?

মামার ঠিকানাটা বললুম।

চাওলা আর একবার হাত বাড়িয়ে বলল: আসব একদিন।

একটুখানি দূরে একখানা ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। চলতে চলতে পেছন ফিরে দেখলুম, দুজনায় সেই গাড়িতে উঠে বসল।

১১

চাওলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল পরে। অন্তরঙ্গ পরিচয়। সাধারণ নিয়মে ধীরে ধীরে নয়, একদিনেই। তার বাইরেটা দেখে ভুল করেছিলুম, ভেতরটা দেখতে পেয়ে সে ভুল ভেঙে গেল। রাণাদের কাছ থেকে তার যে পরিচয় পেয়েছিলুম, নিজে পরিচিত হয়ে সে পরিচয় পালটে নিলুম।

চাওলা সেই ধরনের মানুষ যাকে দেখলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। চালে চলনে এমন একটু স্বাতন্ত্র্য আছে, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। যারা চোখ খুলে চলে, তারা ফিরে দেখবে। বুদ্ধিমান যারা, তারা আলাপ করবার সুযোগ খুঁজবে। মিত্রার সঙ্গে এগোতে এগোতে আমি এই কথাই ভাবছিলুম। লোকটার আকর্ষণ কিসের? স্বাস্থ্যের, রূপের, না আর কিছুর? পাশের মেয়েটিও তো সুশ্রী। বলিষ্ঠ চেহারা চাওলার মত। পাঞ্জাবী পোশাকে তাকেও ভাল দেখাচ্ছিল। কিন্তু ইচ্ছে করলে এখুনি ভুলে যেতে পারি। যদি মনে থাকে তো চাওলার জন্যেই থাকবে।

রাণারা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। মিত্রার সঙ্গে তাড়াতাড়ি হেঁটে তাদের ধরে ফেললুম। রাণার পাশে পৌঁছে মিত্রা বলল: কোথায় দেখেছি মেয়েটাকে!

মুখ ফিরিয়ে রাণা বলল: আমারও তাই মনে হচ্ছে।

মিত্রা ভাবছিল।

রাণা বলল: কিন্তু চাওলার সঙ্গে একে প্রথম দেখলুম। তাই কি।

মিত্রার মুখ দেখে মনে হল, এ কথা তার বিশ্বাস হচ্ছে না। বড় স্বল্পভাষী এই মেয়েটি, বড় পরিমিতভাষী। যতটুকু প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি বলে না। আর প্রয়োজনবোধও সাধারণের চেয়ে কম। মনের সঙ্গে মানুষের মুখের একটা যোগ আছে। অদৃশ্য যোগ। মনে যা কিছুর ছায়া পড়ে, মুখে তার খানিকটা প্রকাশ হবেই। এ যেন খেলার কমেন্টারি, চোখে দেখে মুখে বলে যাচ্ছে। যারা দেখতে পাচ্ছে না, তারা রেডিও খুলে শুনছে। আর একজনের মনের কথা আমরা কান দিয়ে শুনি। মন দিয়ে কজনে শোনে? মিত্রা মুখে কিছু বলে না, তার মনের কথা শুনতে হচ্ছে মন পেতে।

মামাবাবু অনেকক্ষণ পরে কথা কইলেন, বললেন: বেশ ছেলেটি।

ওই কথা আমারও মনে হয়েছিল, এইবারে তার সমর্থন পেলুম। পথ চলতে চলতে অনেক লোকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়, আলাপও হয় অনেক লোকের সঙ্গে। কিন্তু 'বেশ ছেলে' আমরা কজনকে বলি! আরও তো একজন সঙ্গে ছিল। তাকে তো 'বেশ মেয়ে' কেউ বলছেন না!

মামার কথার উত্তর দিল রাণা, বলল: বেশ স্মার্ট ছেলে। চৌকস চালু ছেলে।

মামী অন্য প্রশ্ন করলেন, বললেন: তোমারই সঙ্গে কাজ করে বুঝি?

আমার সঙ্গে? রাণা উত্তর দিল: না না, ও তো চাকরি করে না। দিল্লীতে ব্যবসা আছে ওর।

পরিচয় করিয়ে দেবার সময় এ খবরটা রাণা দিয়েছিল। মামী শুনতে পাননি, কিংবা ঠিক বুঝতে পারেননি। আমি তাঁর লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করলুম। বললুম: মামীমা বোধ হয় বন্ধুতার সূত্রটি জানতে চাইছেন?

ঠিক তাই।

বেশ আরাম পেলেন তিনি।

এই প্রশ্নের ভেতর যে খানিকটা সৌজন্যের অভাব আছে, তা জানতুম। শুধু মামীর জন্যেই এই বেয়াদবি করেছি। এইবারে মিত্রার দিকে দৃষ্টি পড়তেই বুঝতে পারলুম যে কাজটা নিতান্ত গর্হিত হয়েছে।

আমতা আমতা করে রাণা যা বলল, তাতে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল না। বলল: আমাদের পরিবারের বন্ধু। অনেক দিন থেকেই জানাশুনো।

বাধা দিয়ে মিত্রা বলল: আমার বন্ধু।

তারপরে আর কিছু বলল না।

গোড়াতেই আমি এই আশঙ্কা করেছিলুম, এবং আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মামা চমকে উঠলেন কিনা জানি না, মামী স্তম্ভিত হলেন। লজ্জাও পেলেন অপরিসীম। এইটুকু মেয়ে তাঁর সামনে এমন সপ্রতিভ হবে, এ তাঁর ধারণার বাইরে। তাঁর যে সংস্কার, তাতে এসব নির্লজ্জতা। নিজের মেয়ে সঙ্গে আছে, প্রশ্নটা না করলেই হত—বোধ হয় এই কথাই ভাবলেন।

স্বাতিও অবাক হয়েছে দেখলুম। বোধ হয় মুগ্ধও হয়েছে খানিকটা। সত্য কথা স্পষ্ট ভাষায় বলবার জন্যে যে সাহসের দরকার, সকলের তা নেই। যার আছে, তাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। মুখে অস্বীকার করলেও মনে মনে যে করি, তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমটায় অপ্রীতিকর মনে হয়, বিরাগ আসে। তারপর ভুল বোঝার পালা শেষ হয়ে গেলেই সম্পর্ক অন্তরঙ্গ হয়। মিত্রাকে স্বাতি একটু একটু করে বুঝতে শিখছে।

রাণা একটু অপ্রতিভ হয়েছিল। বাপের বন্ধু যাঁরা, যাঁরা তাঁর সমবয়সী, তাঁদের কাছে কথাটা না বললেই ভাল ছিল। বিশেষতঃ মামা মামীর মত প্রাচীনপন্থী দুজন গুরুজনের সামনে সত্য কথাটা

গোপন করলে ক্ষতি ছিল না। তাই একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল। বলল: ঐ হল। বন্ধু তো তোমার একার নয়। পরিচয়টা না হয় আগে হয়েছে।

ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়। মেয়েদের বন্ধু থাকবে না, সে যুগ আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। মেয়েদের শুধু মেয়ে বন্ধু হবে, সে দিনও গত হয়েছে অনেকদিন। এ খারাপ কি ভাল, সে প্রশ্ন ওঠে না। ভাল-মন্দর সংজ্ঞা আমরা বদলে নিয়েছি। তাও চূড়ান্ত নয়, প্রয়োজনমত প্রতিদিন বদলাচ্ছি। কাজেই চাওলাকে মিত্রার বন্ধু বলে ভাবতে আমার সংস্কারে বাধে না, বরং সহজই মনে হয়। বন্ধুতা মানে তো স্বেচ্ছাচার নয়। তাই প্রসঙ্গটা আমি পালটে দিলুম, বললুম: এখানে কী দেখবার আছে?

সকলের আগে মিত্রা আমার দিকে চাইল, কিন্তু উত্তর দিল না। প্রশ্নটা যাকে করেছিলুম, উত্তর সে-ই দিল, বলল: দেখবার? দেখবার অনেক আছে। বলে তার নোট বুক খুলে ফেলল।

রাণার কথার ভেতর আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করলুম। মনে হল, তার বুকের ওপর থেকে যেন একটা ভারি পাথর নেমে গেল। একটা বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে খানিকটা টাটকা বাতাস নিল বুকে। আমি তার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

খানকয়েক পাতা উল্টে রাণা বলল: লাল কিলার ভেতর সবটুকুই দেখবার। বিখ্যাত ফার্গুসন বলেছেন যে এমন প্রাসাদ প্রাচ্যে তো নেইই, পৃথিবীর কোনখানে বোধ হয় নেই। শাজাহান নিজেও এ কথা জানতেন। তাই দেওয়ান-ই-খাসের দেওয়ালে লিখলেন আপন মনের কথাটি। ফার্সি আমি পড়তে পারিনে, গাইডের মুখে শুনেছি সেই লাইনের মানে।—পৃথিবীতে যদি কোন স্বর্গ থাকে তো এই সেই স্বর্গ, অন্য কোথাও নয়।

রাণা সেই স্বর্গ আমাদের দেখাল। দশ বছর ধরে তৈরি বিরাট প্রাসাদ। তারই ভেতর এই দেওয়ান-ই-খাস, বাদশাহের খাস

দরবার, যেখানে মন্ত্রীদের সঙ্গে বাদশাহ পরামর্শ করতেন। কী সুন্দর কারুকার্য!

এই দেখুন!

দেওয়ালের দিকে রাণা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সোনার অক্ষরে দু ছত্র কবিতা জ্বলজ্বল করছে।

আর এইখানে ছিল বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন।

বলে রাণা আর একটি জায়গা দেখাল। বলল: বিলিতি টাকায় সে যুগে তার দাম ছিল বার মিলিয়ান পাউণ্ড। মানে পনর কোটি টাকার ওপর।

একখানা সিংহাসনের দাম পনর কোটি টাকা!

মামী আশ্চর্য হলেন।

কেন হবে না?: মামা উত্তর দিলেন: এক টুকরো হীরের দাম যদি লক্ষ টাকা হয় তো সিংহাসনের দাম পনর কোটি আর এমন বেশি কী!

তা বটে।

মামী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এমন অপব্যয়!

ময়ুর সিংহাসন কেন নাম হল রাণাবাবু?

স্বাতি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল।

এই বিপদে ফেললেন: চমকে উঠে রাণা জবাব দিল: এমন প্রশ্ন আমার মনে কোনদিন আসেনি।

মামা আমার দিকে চাইলেন।

এবারেও আমি লজ্জা পেলুম। চেয়ে দেখলুম, মিত্রা আমার লজ্জাটুকু উপভোগ করছে। অনুরোধ শোনার অপেক্ষা না করে বললুম: ছেলেবেলায় স্কুলের বই-এ এসব পড়েছিলুম।

মামার দৃষ্টিতে যেন গর্বের ইঙ্গিত পেলুম। তাই সিংহাসনের বর্ণনা করলুম সালঙ্কারে। বললুম: বিলিতি চেয়ারের মত সিংহাসন নয়, কতকটা আমাদের দেশের ঠাকুরের সিংহাসনের মত।

তক্তপোষের মতো চারকোণা। তার সোনার পায়া। বারটি থামের ওপর মীনে করা ছাদ, থাম মরকতের। তার প্রত্যেকটির মাথায় একজোড়া করে ময়ূর মুখোমুখি চেয়ে আছে। মাঝখানে একটি মণিমাণিক্যের গাছ। মনে হবে, যেন ময়ূর দুটো সেই গাছের ফল খাচ্ছে ঠুকরে ঠুকরে।

রাণা আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু স্বাতির পরিবর্তন দেখলুম না। আমাকে এড়িয়ে রাণাকে প্রশ্ন করল : এই ময়ূর সিংহাসন এখন কোথায় রাণাবাবু ?

রাণা তার মনের কথাটিই বলে ফেলল : গোপালবাবু থাকতে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন !

রাণাকে বেশি বলতে দিলে বেশি লজ্জা পেতে হবে। তাই উত্তরটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিলুম। বললুম : এই লাল কিলার নির্মাণ শুরু হয় ১৬৩৯ সনে। ঠিক একশো বছর পরে পারস্যের নাদির শাহ এসে এই ময়ূর সিংহাসন লুঠে নিয়ে যান।

মতি মসজিদ দেখে আমরা মিউজিয়াম অব আর্কেয়লজি দেখলুম। পুরাকালের কত জিনিসই না সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। অস্ত্রশস্ত্র মুদ্রা. ছবি মসলন্দ গালিচা আরও কত কী!

রাণা বলল : লাল কিলার আরও একটি মিউজিয়াম আছে। ইণ্ডিয়ান ওয়ার মেমোরিয়াল মিউজিয়াম। প্রথম মহাযুদ্ধে অর্জিত নানা রকমের পুরস্কারের।

স্বাতি বলল : কলকাতার মতো বড় জাদুঘর নেই দিল্লীতে ?

রাণা বলল : জাদুঘর এখানে একটা নয়, গোটা চারেক। নয়াদিল্লীতে আরও দুটো জাদুঘর আছে। কুইন্‌স্ ওয়েতে সেন্ট্রাল এশিয়ান অ্যান্টিকুইটিস্ মিউজিয়ম। এশিয়ার চীনা তুর্কিস্থান একসময় নানা দেশের নানা সভ্যতার মিলনক্ষেত্র ছিল—গ্রীস ইরান ভারতবর্ষ ও চীনের লোকেরা এখানে মিলিত হত। সেখান থেকে নানা জিনিস উদ্ধার করে এনেছেন স্যর স্টেইন।

আর একটা ?

স্বাতি প্রশ্ন করল।

আর একটা একেবারে রাষ্ট্রপতি ভবনের ভেতর : রাণা জবাব দিল : তাকে ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ইণ্ডিয়া বলে, ভারতীয় আর্ট ও আর্কেয়লজির নানা নিদর্শন তার ভেতর।

স্বাতি বলল : আমরা দেখিনি এসব।

রাণা বলল : বেশ তো একদিন দেখা যাবে। শনিবার দেখলেই ভাল। সেদিন আট আনা পয়সা দিতে হয় বটে, কিন্তু গাইড পাওয়া যায় দেখবার জন্যে।

ফোর্টের মুখোমুখি জামা মসজিদ। তুটো মিনার আর তিনটে গম্বুজ পাশাপাশি। তিনদিকে বিরাট ফটক, রাস্তা থেকে সিঁড়ি ভেঙে ঢুকতে হয়। কিন্তু মামী গাড়ি থেকে নামতে চাইলেন না। বললেন : এ তো মন্দির নয়, কী হবে সময় নষ্ট করে ?

আপত্তি যে সময়ের নয় সংস্কারের, তা সকলেই বোঝেন। তাই পীড়াপীড়ি কেউ করলেন না। আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময় মাদ্রাজে গির্জার ভেতর ঢুকতে চাননি। বাইরেটা দেখেই ফিরে এসেছিলেন। সেখানকার কমিউনিয়ান টেবলের ওপর টাঙানো ছিল র‍্যাফেলের বিখ্যাত ছবি লাস্ট সাপার। আর তাদের বিবাহের খাতায় ছিল ক্লাইব আর ইয়েলের নাম। মামীর সংস্কারকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে আমরা তা দেখতে পাইনি। আজও আমরা নামলুম না। ধীরে ধীরে মোটর চালিয়ে চাঁদনি চকের দিকে এগিয়ে গেলুম।

শাজাহান বাদশাহের সময় থেকে আজও পর্যন্ত চাঁদনি চকের ইজ্জৎ কমল না। লাল কিলা থেকে ফতেপুরী মসজিদ পর্যন্ত এক মাইল লম্বা এই বাজার। ডান হাতে বাগান পেরিয়ে পুরনো দিল্লী রেলস্টেশন। মোগল আমলে নাকি যমুনার খাল বইত রাস্তার মাঝখান দিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের বছর চারেক আগে

ইংরেজরা তা বুজিয়ে দিয়েছে। রাণার কাছেই এসব খবর পেলুম।

বেলা খুব বেশি হয়নি, কিন্তু মিত্রাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। স্বাতি সেই কথাই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল : মিত্রাদির কি শরীর খারাপ?

না তো!

মিত্রা স্বীকার করল না।

তবে এমন চুপ করে আছ কেন?

রাণা জানতে চাইল।

মিত্রা উত্তর দিল না। মনে হল উত্তরটা বুঝি দেবার মত নয়।

নর্থ অ্যাভেনিউএ আমাদের নামিয়ে দিয়ে রাণারা আজ ফিরে গেল।

১২

খেয়ে উঠে মামা একটু বসে ছিলেন। এক পাইপ তামাক খেতে যতটুকু সময় লাগে, ঠিক ততটুকু। তারই মধ্যে একটুখানি গল্প হল।

মামা বললেন : কেমন দেখছ এদের?

চমৎকার মানুষ এরা।

কিছু না ভেবেই আমি তাঁকে জবাব দিলুম।

মামা কী বুঝেছেন জানিনে, বললেন : ভাল কী দেখলে?

বললুম : কেমন যত্ন করে সব দেখাচ্ছে বলুন!

মামা তেড়ে উঠলেন, বললেন : তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, সব বুঝে শুনে এমন ন্যাকা সেজো না।

আমি এ কথার কী উত্তর দেব! তবু বললুম : খারাপ তো এখনও কিছু দেখতে পাইনি মামাবাবু!

মামার পাইপের তামাক ফুরিয়ে গিয়েছিল। ধোঁয়া না পেতেই ছাইটুকু ঝেড়ে ফেললেন। উঠে যাবার সময় বলে গেলেন : তোমার ডেঁপোমি কোনদিন যাবে না।

এ তাঁর রাগের কথা। আমার কাছে তিনি যা শুনতে চেয়েছিলেন, আমি তা বলিনি। যা বলেছি, তা বিশ্বাস করেননি।

স্বাতি কাছেই কোথাও লুকিয়ে ছিল। মামা উঠে যেতেই কাছে এসে বসল। মামী আগেই শুয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের শ্রবণ বাঁচিয়ে বলল : বাবা হঠাৎ চটে উঠলেন কেন ?

গম্ভীরভাবে বললুম : রাণাবাবুর নিন্দে করে ফেলেছিলুম।

তুমি ভারি বোকা তো গোপালদা : স্বাতি জবাব দিল : সব জেনে শুনে বাবার সামনেই নিন্দে করে ফেললে!

আরও গম্ভীর হয়ে বললুম : একদম মনে ছিল না।

স্বাতি এবারে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর খানিকটা সংযত হয়ে বলল : নাও, বল এইবারে।

মামার প্রশ্নটা তাকে বললুম, আমার উত্তরটাও শোনালুম।

সব শুনে স্বাতি বলল : বাবার রাগের কারণ কী জানো ?

আমি জানি না স্বীকার করলুম।

স্বাতি বলল : এই তোমার বুদ্ধি!

হেসে বললুম : বুদ্ধি থাকলে কি আর তোমার পাল্লায় পড়ি।

স্বাতিও হাসল। ভাল লাগল তার এই হাসিটুকু। বললুম : এইবারে বল।

স্বাতি বলল : বাবা ঠিকই বলেছেন। সব জেনে শুনে তুমি ভালমানুষ সাজছ।

চাওলা, না ?

আমি প্রশ্ন করলুম।

স্বাতি সমর্থন করে বলল : চাওলার সঙ্গে মিত্রাদির একটা সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, তাই না ?

ওরা সেটা অস্বীকার করে গেল।

আমি জবাব দিলুম।

কিন্তু পারল কোথায় : স্বাতি প্রশ্ন করল : অস্বীকার করতে গিয়েই তো ধরা পড়ল।

ধরা পড়েছে, একথা আমি মানি নে, এ আমাদের একটা সন্দেহ মাত্র।

সন্দেহ নয়, আমি নিঃসংশয়।

স্বাতি আমার ভুল ধরল।

কিসে নিঃসংশয় হলে বল তো!

আমি জানতে চাইলুম।

স্বাতি বলল : মিত্রাদির ব্যবহারে। গল্প করতে করতে আমরা সবাই এগিয়ে গিয়েছিলুম। চাওলাদের আমরা দেখতে পাইনি। মিত্রাদি শুধু দেখেই নি, পথের পাশে সরে দাঁড়িয়েছিল। এতে সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু নিঃসন্দেহ হইনি। তারপর মিত্রাদি যখন চাওলাকে উত্তর দিল না, রাণাবাবু এগিয়ে এল তার কথার জবাব দিতে, তখুনি আমি নিঃসংশয় হলাম। এ তো লজ্জা নয়, এ অভিমান।

স্বাতির কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলুম। এতও লক্ষ্য করে এই মেয়েটা!

স্বাতি হাসল, বলল : বিশ্বাস হল না বুঝি আমার কথা!

তা কেন হবে না : আমি জবাব দিলুম : তুমি কি আর না বুঝে বলছ!

স্বাতি বলল : না বুঝেই হয়তো বলছি। কিন্তু মনে হয়, এ অনুমান আমার মিথ্যে নয়।

কিন্তু আমি কী ভাবছি জান?

আমি প্রশ্ন করলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম : আমি ভাবছি,

মেয়েদের কি পুরুষ বন্ধু থাকতে নেই, না, থাকলেই এমন গভীরভাবে আলোচনা করতে হবে। বড় সেকেলে আমরা, তাই না?

স্বাতি হেসে ফেলল, বলল: আমার বন্ধুদের নাম শুনলে তুমি চমকে যাবে। মা তো রীতিমতো ভয় পান।

তুমি পাও না তো?

আমি জানতে চাইলুম।

তেমনি হাসতে হাসতে স্বাতি বলল: তোমাকে ভয় পাই।

তার এই তরল পরিহাসটুকু ভাল লাগল। বললুম: একটু পাওয়া ভাল।

আমরা যে সংস্কারমুক্ত হতে পারিনি, এই কথাটাই আমার বারে বারে মনে এল। যে সংস্কার এদেশে একদিনে গড়ে ওঠেনি, যুগ-যুগান্তের বিশ্বাসের ভিত্তিতে যা সমাদৃত, তাকে ঝেড়ে ফেলতেও আমাদের সময় লাগবে। মামা মামীর আচরণে আজ আমার এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হল।

স্বাতির মনের ধারাও বুঝি একই খাতে বইছিল। বলল: জানো গোপালদা, বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাবা বোধ হয় কিছুই পড়েননি। তাঁর পড়ার অভ্যেস নেই। কিন্তু মা পড়েন।

স্বাতি খুব মৃদু স্বরেই কথা কইছিল, এবারে যেন হাসিতে গড়িয়ে পড়ল। আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: কী হল?

আরও কাছে সরে এসে স্বাতি বলল: নতুন লেখকদের লেখা তো মা কখনও পড়েন না, পুরনোদের লেখা পড়বার সময়েও এক এক সময় তাঁর মুখ লাল হয়ে যায়।

তার কথার ধরনে আমিও হাসলুম। বললুম: মেয়ে কী করে বেড়ায়, তা দেখতে পেলে বোধ হয় আর হাসতেন না।

স্বাতি চটে উঠল, বলল: কী করে বেড়াই আমি শুনি।

তেমনি তরল ভাবেই আমি বললুম: তা দেখে বেড়াবার আমার সময় কোথায়।

স্বাতি অনেকক্ষণ কথা কইল না, তারপর উত্তর দিল : আমার সম্বন্ধে যে তোমার কোন কৌতূহল নেই তা জানি।

তার ভঙ্গীতে একটা প্রচ্ছন্ন অভিমানের সুর লক্ষ্য করে খুশী হলুম, বললুম : কী করে জানলে ?

অঘ্রানে আমার বিয়ের কথা শুনেছিলে : স্বাতি জবাব দিল : কেন হল না সে কথা জানবার প্রয়োজনবোধও তোমার হল না।

এই কথা !

আমি হেসে ফেললুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম : এ তো আমার জানা কথা।

তুমি জানতে ?

স্বাতি চমকে উঠল।

তুমি যে ওকে বিয়ে করতে পারবে না, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ছিলুম।

কেন পারব না ?

স্বাতি জানতে চাইল।

হেসে আমি জবাব দিলুম : কাউকেই পারবে না।

স্বাতি বোধহয় এমন কথা কখনও শোনেনি। আরও কিছু শোনবার জন্য চেয়ে ছিল। অত্যন্ত চুপি চুপি আমি যোগ করলুম : স্বাতি তার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে কিনা !

ঠোঁট উল্টে স্বাতি বলল : বড্ড গেঁয়ো রসিকতা !

হেসে বললুম : আজকের এই সভ্য পৃথিবীতে সুন্দর বলে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তো এই গ্রামেই আছে। দক্ষিণে কথাকলি নাচের ছবি দেখেছ তো ? আমরাও অমনি এক একটা মুখোস পরে শহরের রাস্তায় নেচে বেড়াচ্ছি। মানুষ দেখতে হলে এখনও গ্রামে যেতে হবে।

স্বাতি বলল : তোমার কথাগুলো শুনতে ভাল, লিখলে পড়তেও

হয়তো ভাল লাগবে। স্বপ্ন যেমন ভাল লাগে, তেমনি ভাল লাগা। দিনে দিনে তোমার কথাগুলো এমনি অবাস্তব হচ্ছে যে সূক্ষ্ম চালুনি দিয়ে ভাল করে না ছেঁকে নিলে লোকের কাছে তা পরিবেশন করা চলে না।

তার কথা বলার ধরন দেখে আমি হেসে ফেললুম।

হাসলে যে ?

স্বাতি জানতে চাইল।

হাসবার মত কথাই যে বলছ।

মানে ?

মানে সোজা। এক নিঃশ্বাসে অতগুলো কথা আমি বলতে পারব না। লিখে দিলেও যে পড়তে পারব, তা মনে হয় না।

স্বাতি বোধহয় লজ্জা পেল। বলল: বড় বড় কথা তোমাদের মুখ থেকে বেরলে দোষ নেই, দোষ আমরা বললে।

হেসে বললুম: তোমরা আমরা বলছ কেন, বল তুমি আমি।

এমনি অবান্তর তর্ক আরও কতক্ষণ হত জানিনে, স্বাতির হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেল। বলল: দেখেছ, কী ভুলই করছিলাম এতক্ষণ!

কেন, দুপুরে শোবার ইচ্ছে ছিল বুঝি ?

আমি জানতে চাইলুম।

পাগল: স্বাতি উত্তর দিল: দুপুরে আমি ঘুমোই কখনও!

তবে ?

স্বাতি বলল: দেবলাদেবীর গল্প শোনাবে না? যে কথাটি আমি ভুলে যাব—

বলে চেয়ারখানা আরও কাছে সরিয়ে আনল।

আবার আমি হেসে ফেললুম।

দৃষ্টি দিয়ে স্বাতি আমায় ভর্ৎসনা করল। তখুনি আমি সামলে

নিলুম নিজেকে। গম্ভীর হয়ে বললুম: কিন্তু আকাশে এখন চাঁদ কই, কই জ্যোৎস্না ?

স্বাতি ধমক দিয়ে উঠল, বলল: সারাদিন অত তামাসা ভাল লাগে না গোপালদা। তুমি কি সীরিয়াস হতে কোনদিন শিখবে না ?

হাত জোড় করে বললুম: ঘাট হয়েছে, এবারে মাপ কর। আমি ভেবেছিলুম, রাণার মোটরে বুঝি বসে আছি।

স্বাতির চোখে আর ভর্ৎসনা দেখলুম না, কৌতুকে উজ্জ্বল হল।

বললুম: তোমাকে বলতে চেয়েছিলুম শুধু একটি দৃশ্যের কথা। দেবলাদেবী নাটকের একটি দৃশ্য। দেবগিরিতে খিজির খানের শিবিরে বিচার হচ্ছে বন্দী রাজা বলদেবের। তাঁর আশ্রয়প্রার্থিনী দেবলা-দেবীও উপস্থিত আছেন। খিজির খান দেখলেন, দেবলা সত্যিই সুন্দরী, এমন রূপ তিনিও বুঝি দেখেননি। কিন্তু—

কিন্তু কী ?

আমি ভাবছিলুম, কী ভাবে গল্পটা বলব। কিন্তু স্বাতি ভাববার অবকাশ দিল না। একটুখানি থামতেই তার আগ্রহ জানিয়ে দিল।

বললুম: খিজিরের অন্য কথা মনে পড়ল। তিনি শুনেছেন যে দেবলা বলদেবকে ভালবাসেন, বলদেব বিয়ে করবেন দেবলাকে। এই ভালবাসা যদি সত্য হয়, ভেজাল যদি না থাকে তাঁদের প্রেমে, তবে খিজিরের কী কর্তব্য হবে! স্বার্থত্যাগ? খিজির তা পারবেন। কিন্তু বাদশাহের আদেশ? দেবলাকে বেঁধে না নিয়ে গেলে তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। মদ্যপ বাদশাহ এখন কমলাদেবীর মুঠোর ভেতর। তাঁর মৃত্যুদণ্ডেও সই করিয়ে নিতে পারেন। তবু খিজির খান তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। পরীক্ষা নিলেন দেবলা ও বলদেবের।

এ গল্প শুনতে যে স্বাতির ভাল লাগছিল, তা তার মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলুম। বললুম: খিজির বললেন, দেবলা যদি তাঁর দেহরক্ষী, নাম বোধহয় ইরাণী, তাকে বিয়ে করে, তবে তিনি

বলদেবকে মুক্তি দেবেন। দেবলা তখুনি তাতে সম্মত হল, বলল, বলদেবের মুক্তির জন্যে সে সব করতে পারে। কিন্তু বলদেব তাতে রাজী নন। বললেন, তাঁর জীবন নিয়ে যা ইচ্ছে করা হোক, দেবলার মুক্তি চাই। খিজির খান মুগ্ধ হলেন। ভুলে গেলেন নিজের লোভের কথা, নিজের বিপদের কথাও। দুজনের বিয়ে দিয়ে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিল্লী ফিরে এলেন।

তারপর ?

স্বাতি ব্যস্ততা প্রকাশ করল।

বললুম: মালিক কাফুরের কৃপায় হাওয়ায় ভেসে গেল সে সংবাদ। দিল্লীতে মৃত্যুর পরওয়ানা তৈরি হয়ে গেল বিজয়ী বীর খিজির খানের অভ্যর্থনার জন্যে।

স্বাতির বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

ট্রেন আমার ভাবনাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কত শত স্টেশন পেরিয়ে একসময় মথুরায় এসে দাঁড়াল। কিন্তু সেখানেও যমুনা দেখতে পেলুম না। যমুনা দেখেছিলুম দিল্লী যাবার পথে বৃন্দাবনে নেমে। দেখেছি প্রাণ ভরে।

বৃন্দাবনের কথায় মনে এল মাসির কথা। দিল্লীব বৈঠকখানায় বসে মামীও সেদিন মাসির গল্প শুনতে চেয়েছিলেন। পাশে একখানা চেয়ারে বসে বললেন: বৃন্দাবনে তোমার বড় মাসিকে কেমন দেখলে ?

কেমন দেখলুম ?

মামী একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন, বললেন: না না, আমি তাঁর শরীরের কথা বলছি না, তিনি ভাল আছেন আমরা জানি।

গোবিন্দজী'র মন্দির, বৃন্দাবন

মধুরাংশচ
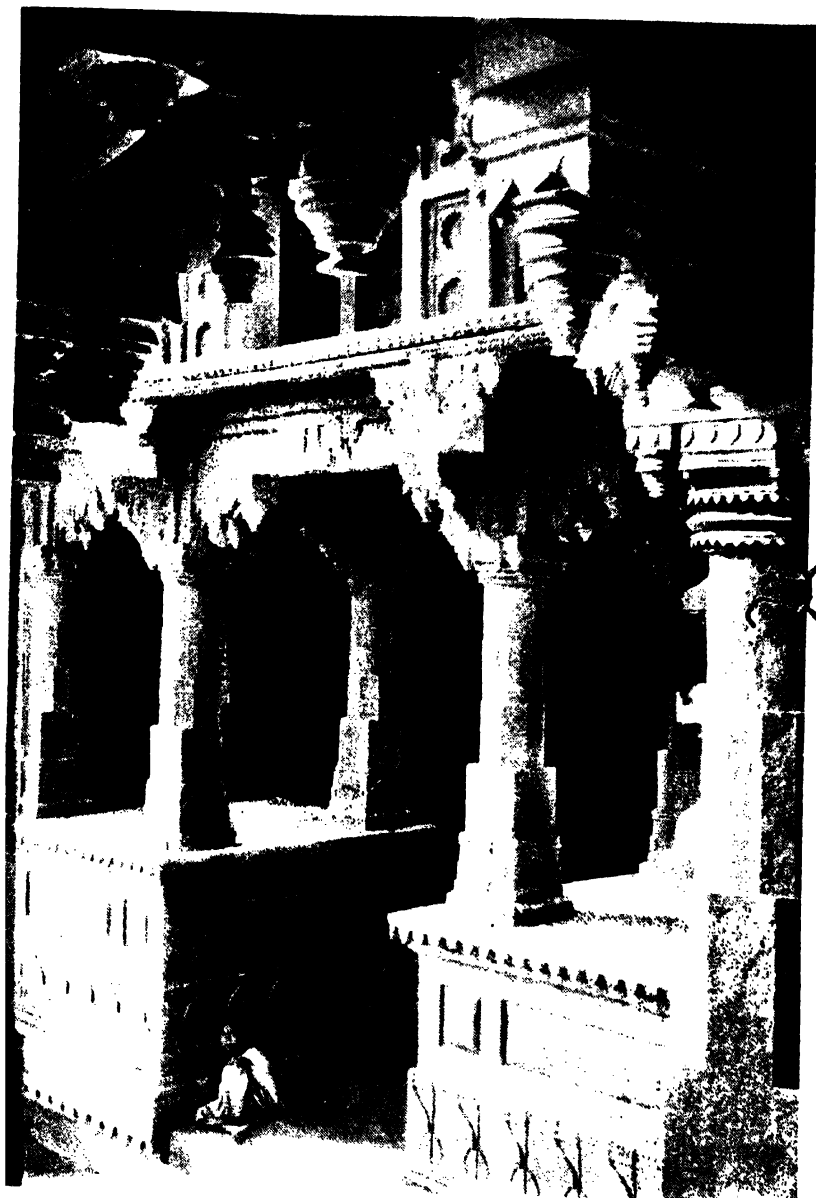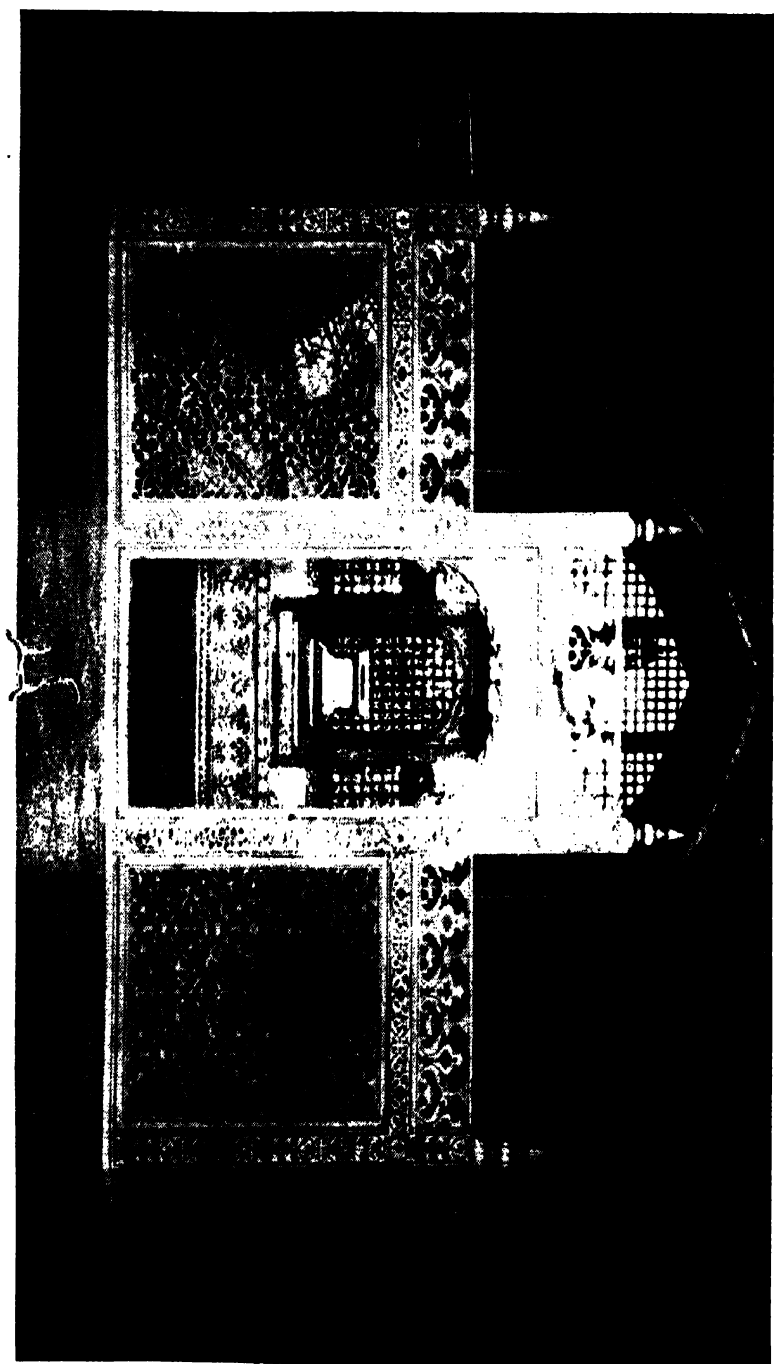
তিনি কী জানতে চাইছেন তা বুঝি। কিন্তু বুঝলেই কি সব কথা বোঝানো যায়। আমি ইতস্ততঃ করছিলুম। সেটুকু লক্ষ্য করে মামী বললেন : কয়েকটা দিন তো তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে এলে, কেমন দেখলে তাঁর মনের অবস্থা ?

স্বাতি কাছেই ছিল, হেসে ফেলল তার মায়ের কথা শুনে।

হাসছিস যে ?

মামী একটু চটবার ভান করলেন।

হাসব না ? : স্বাতি উত্তর দিল : মানুষের মন কি ময়রার মিষ্টি মা, যে আসতে যেতে তার আস্বাদ নেয়া যায় !

স্বাতির পাকামি দেখে মামী এবার সত্যিই চটলেন, বললেন : তুই চুপ কর্ স্বাতি।

স্বাতি আর একটু হেসে চুপ করল।

তাড়াতাড়ি আমি বললুম : মাসির বয়েস হয়েছে তো, মনের নাগাল পাওয়া ভার। আমায় নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে রইলেন যে কোথা দিয়ে কয়েকটা দিন কেটে গেল টেরই পেলুম না।

পাশের ঘরে মামার নাক ডাকার শব্দ বন্ধ হল। স্বাতি বলল : বাবার ঘুম ভাঙল, যাই রাম খেলাওনকে ডেকে দিই।

বলে বেরিয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্ত না যেতেই আবার ফিরে এল।

আমি মাসির কথাই ভাবছিলুম। সম্বন্ধটা যে নিকট নয় তা জানি, কিন্তু দূর কতটা তা জানতে বাকি আছে। মামার সঙ্গে যে কোন সম্বন্ধই নেই, তা জেনেছি দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের সময়। ট্রেনে মামা নিজেই একদিন এ কথা প্রকাশ করেছিলেন। আমার মা ছিলেন তাঁর মায়ের সইয়ের মেয়ে। কী একটা রোগে কয়েকদিনের ব্যবধানে আমার দাদামশাই আর দিদিমা মারা যান। সেই থেকে আমার মা মানুষ হয়েছেন মামার মায়ের কাছে। আপন ভাই বোনের মতই মানুষ হয়েছিলেন। আমার মাসির সঙ্গে কিন্তু সম্বন্ধ

এরকম নয়। মামা বলেছেন যে দূরবীন লাগিয়ে দেখতে হয় সত্যি, কিন্তু রক্তের সম্বন্ধ একটু আছে। ভেবেছিলুম মাসিকে খুব বুড়ো দেখব, হয়তো দেখব ভেঙেই পড়েছেন। কিন্তু বলতে দোষ নেই, তাঁকে দেখে বেশ আশ্চর্য হয়েছিলুম। চাঁপার মত উজ্জ্বল তাঁর রঙ। মুখে অদ্ভুত প্রসন্নতা। দেহের গড়নে ছোট মাসির চেয়ে ছোটই মনে হয়। বাড়ি পৌঁছে তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই কাছে টেনে নিলেন, বললেন: ভারি মিষ্টি ছেলে।

লজ্জা পেলুম তাঁর কথা শুনে।

মাসি বললেন: দিদিকে কবে দেখেছি, আজ মনেই পড়ে না। দেখেছি কিনা তাও মনে নেই। বিয়ের আগে মার কাছে তাঁর গল্প শুনেছি।

হঠাৎ যেন বিষণ্ণ মনে হল মাসিকে। শুধু একটি মুহূর্ত। তার পরেই প্রসঙ্গ পালটে ফেললেন। বললেন: এস এস, ভেতরে এস।

তাঁর জীবনযাত্রা দেখলুম। বড় সরল অনাড়ম্বর, একেবারে বাহুল্যবর্জিত। জীবনধারণের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি কিছুই নেই।

পরে জেনেছিলুম, আছে। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে তাঁর গোপাল আছে লুকনো। আমি দেখতে পেয়েছি দেখে বলেছিলেন: মানুষের একটা সখ না থাকলে তো চলে না। ওইটুকুই আমার সখ। ওই গোপাল নিয়ে আমি বেঁচে আছি।

মাসির চোখজোড়া কি ছলছল করে উঠল?

তারপরেই সামলে নিয়ে বললেন: আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন। আপনভোলা মানুষ। সন্ধ্যেবেলায় একবার দাবা পেতে বসলে দুনিয়ার কথা ভুলে যেতেন। মা ছিলেন ঘোর সংসারী, সময়ের এমন অপব্যবহার তিনি সইতে পারতেন না। বেশি রাগারাগি করলে বাবা বলতেন, সখ একটা থাকা ভাল। তাতে আর কোন উপকার না হোক, ব্লাডপ্রেসারে মরব না।

একটু থেমে মাসি বললেন : মা মারা যান ব্লাড প্রেসারে।

এ কথা আরও একজনের মুখে আমি শুনেছি। যাদের কোন সখ সাধ নেই, 'হবি' নেই, শুধু টাকার চিন্তা কিংবা সংসারের, ব্লাড প্রেসারে তারা কষ্ট পাবেই। কথাটা বিজ্ঞানসম্মত কিনা জানিনে। মনে হয়, যুক্তিসঙ্গত। ভাল করে ভেবে দেখলে হয়তো একটা বৈজ্ঞানিক কারণ পাওয়া যাবে।

বৃন্দাবনে পৌঁছেছিলুম বিকেলবেলায়। শরীরে বোধহয় ক্লান্তির লক্ষণ ছিল। তা লক্ষ্য করে মাসি কোথাও বেরতে দিলেন না। বললেন : কখন বেরিয়েছ এলাহাবাদ থেকে ?

সময়টা মনে ছিল। অত্যন্ত বেয়াড়া সময়। কষ্টের সীমা ছিল না বলেই হয়তো ভুলতে পারিনি। বললুম : রাত প্রায় সাড়ে তিনটেয়।

বল কি : মাসি চমকে উঠলেন : অত রাতে কেউ বেরতে পারে !

পেরেছি তো : আমি জবাব দিলুম : আর পেরেছি বলেই গাড়ি না বদলে এমন সুন্দর সময়ে এখানে পৌঁছে গেলুম। তা না হলে—

তা না হলে কী হত, সে কথা জানিনে। কলকাতা থেকে যে টাইম টেবল এনেছিলুম তাতে এই গাড়িটিরই নিশানা আছে। তিন রেলের তিনখানা টাইম টেবল থাকলে সবটুকু জানতে পারতুম।

মাসি আমায় সমর্থন করলেন, বললেন : তা ঠিক। সব দিকে সুখ হয় না।

কথাটি ছোট, কিন্তু আমার অনেক কথা মনে এল। মনে হল, এই সংক্ষিপ্ত উক্তি দিয়ে মাসি তাঁর মনের দরজা খানিকটা খুলে দিলেন। বাইরে থেকেই আমি তাঁর পাওয়া না-পাওয়ার একটা খণ্ড হিসেব দেখতে পেলুম।

আমার মুখের দিকে চেয়ে হয়তো কিছু বুঝতে পেরেছিলেন।

হঠাৎ হেসে বললেন : আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই। সন্ধ্যেবেলাটা এস গল্প করেই কাটাই।

গল্প করেই কাটালুম সন্ধ্যেটা।

মাসি এক সময় এলাহাবাদের কথা শুনতে চাইলেন। এলাহাবাদের কর্তার কথা। তাঁর প্রশ্নের আগে একটু সঙ্কোচ দেখেছিলুম। হয়তো একটু লজ্জা। কিন্তু লজ্জার কী আছে? লজ্জার বয়স কি মাসি পেরিয়ে আসেননি?

আমি সব কথা তাঁকে খুলে বললুম, কর্তার কথা, তাঁর ফুলের কথা। বললুম ছোট মাসির কথাও।

কুকুরগুলো কোথায় গেল?

মাসি প্রশ্ন করলেন।

বললুম : কোথাও যায়নি। সেগুলোও বাড়িতে আছে। তবে কর্তা আর তদারক করেন না, করেন ছোট মাসি।

বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল বড় মাসিকে। ছোট মাসির কথা বলে তাঁকে আঘাত দিলুম না তো। কে জানে?

পরদিন বৃন্দাবন দেখলুম মাসির সঙ্গে।

বৃন্দাবন নাম কেন হল গোপালদা?

স্বাতি আমায় প্রশ্ন করে বসল।

কী বিপদ : গল্পে বাধা পেয়ে আমি জবাব দিলুম : একটু যে সহজভাবে গল্প করব, তার উপায় নেই।

মামা কখন এসে গল্প শুনতে বসেছিলেন টের পাইনি। টের পেলুম তাঁর কথা শুনে। বললেন : প্রশ্নটা স্বাতি মন্দ করেনি। নামেরও তো মানে থাকে, বিশেষ করে সেকালের নামে।

স্বাতি উৎসাহ পেল। বলল : বৃন্দার বন। কিন্তু বৃন্দা মানে কি?

বৃন্দার অনেক মানে : আমি উত্তর দিলুম : তার ভেতর

সবচেয়ে প্রচলিত হল রাধা, যার অনেক বৃন্দ বা সখী ছিল। ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে শুনেছি বৃন্দাবনের এই মানে।

মামার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তিনি অন্য মানে শুনবার অপেক্ষা করছেন। বললুম: কেউ বলেন, কেদাররাজের কন্যা বৃন্দা এইখানে তপস্যা করে শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন।

কঠিনভাবে স্বাতি আপত্তি জানাল, বলল: এ গল্প কোথাও শুনিনি।

হেসে বললুম: আমিই কি ছাই শুনেছি। রাজা কুশধ্বজের কন্যা তুলসী ওরফে বৃন্দার নামও কখনও শুনিনি। তুলসীও তপস্যা করে হরিকে পেয়েছিলেন এই ক্ষেত্রে। এ নিয়ে তর্ক হয় না। তবে মথুরার জন্মকথা পড়েছি রামায়ণ ও হরিবংশে।

সকলেরই আগ্রহ দেখলুম। তাই সেই গল্প শোনালুম সবাইকে: মথুরাপুর বা মধুপুর নির্মাণ করেন মধু দৈত্য। কিন্তু তাঁর পুত্র লবণ ছিল অত্যাচারী। তাই তাকে হত্যা করে আপন আধিপত্য বিস্তার করেন রামানুজ শত্রুঘ্ন। আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন যে শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে মাহোলি গ্রাম, সেই হল মধু দৈত্যের মধুপুর। শত্রুঘ্ন পুরী নির্মাণ করেন বর্তমান কাটরা গ্রামের নিকট যেখানে ভূতেশ্বর মন্দির। আর বসতি নির্মাণ করান শূরসেনদেব। সেই শূরসেন বংশেই কংসের জন্ম।

তৎপরভাবে স্বাতি বলল: শূরসেন নাম ইতিহাসে পড়িনি গোপালদা?

তার প্রশ্ন শুনে আমি খুশী হলুম: ঠিক বলেছ। মৌর্যযুগে শূরসেন রাজ্য বোধহয় পাটলিপুত্রের অধীন ছিল। প্লিনি লিখেছেন যে মথুরা ও কৃষ্ণপুর ছিল পালিবোথ্রার অন্তর্গত। মেথেরা ও ক্লিসোবোরা—এই দুই শহরের মাঝে যমুনা। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা পড়ে লিখেছেন আরিয়ান। খৃস্টের জন্মের আগে মথুরায় ছিল শকাধিপত্য, পরে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত রাজা। তার পরে

আবার শূরসেনরা রাজত্ব করেন আলা-উদ্-দীন খিলজীর আমল পর্যন্ত।

মামা বললেন: ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙের কাহিনীতে মথুরার নাম আছে শুনেছি।

আছে বৈকি: আমি জবাব দিলুম: মথুরার পরিধি কত, কত সংঘারাম, কত বৌদ্ধ যতি আর কত স্মৃতিস্তূপ—এ সবের হিসেব আছে তাঁদের লেখায়। জৈনদের তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও নমীনাথের জন্ম মথুরায়। প্রাচীন শিলালিপিতে তাঁদের কীর্তির কথা জানা যায়। মথুরায় বৌদ্ধধর্ম এল উপগুপ্তের সময় চতুর্থ শতাব্দীতে। স্থাপিত হল স্মৃতিস্তূপ, কুড়িটি সংঘারাম। এলেন দু তিন হাজার বৌদ্ধ যতি। এঁদের দেখতে এলেন ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ।

সব কথা বলবার আগেই মামী চটে উঠলেন, বললেন: এটি কি ইতিহাসের ক্লাস? আমি শুনতে এলুম গোপালের মাসির কথা, আর আমায় তোমরা তাড়িয়ে দেবে?

সত্যি কথা। এ যে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হল। মনে মনে আমি লজ্জিত হলুম। কিন্তু মামা দমলেন না, বললেন: সে গল্প তোমার পালাচ্ছে না। সবই শুনতে পাবে।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন: বল গোপাল, তোমার মাসির গল্পই বল।

কিন্তু গল্প শুরু করবার আগেই রাম খেলাওনের চা এল। তাকে দেখতে পেয়ে মামা বললেন: নাও, এইবারে জমবে ভাল।

মামী কথা কইলেন না বটে, কিন্তু তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। আমি আমার পুরনো কথায় ফিরে গেলুম, বললুম: পরদিন বৃন্দাবন দেখলুম মাসির সঙ্গে।

বেশ সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মাসি বললেন: সকাল সকাল ফিরতেও হবে। রান্নাবান্নাও আছে তো।

মাসি যে নিজেই রান্না করেন, তা কাল সন্ধ্যেবেলাতেই দেখেছি।

শুধু বাসনটা মাজেন না, তার জন্যে ঝি আছে। বলেছিলেন: নিজের হাতে ওটুকু করতে পারলেই আরাম পেতাম, কিন্তু তা পারলাম না। বৃন্দাবন এসেছিলাম শীতের দিনে, ঠাণ্ডায় বড় কষ্ট হত। অভ্যাস নেই তো। সেই থেকেই পরমুখাপেক্ষী হয়ে আছি।

পথ চলতে চলতে মাসি আমায় বৃন্দাবনের গল্প শোনালেন, বললেন: তোমাদের ইতিহাসে কি বলে জানিনে, পুরাণে আমরা বৃন্দাবনের গল্প পড়েছি। ব্রজধামে তখন নানা বিঘ্ন। কৃষ্ণের মন্ত্রণায় নন্দ মহারাজ ব্রজধাম ত্যাগ করলেন, এলেন এই বৃন্দাবনে। সে কি এই বৃন্দাবন? গোপ গোপাদের নিয়ে তাঁরা গাছের নীচে রাত্রিবাস করলেন। বৃন্দাবনের পত্তন হল রাতারাতি। কৃষ্ণের ইচ্ছায় বিশ্বকর্মা এক রাতে এই নগর নির্মাণ করে দিলেন।

জয়দেব পড়েছ?

মাসি জানতে চাইলেন।

বললুম: জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়েছি।

খুশী হয়ে মাসি বললেন: বসন্তে বৃন্দাবনের কী রূপ ছিল বল। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! মুসলমান আমলে কিছু আর রইল না। কৃষ্ণের লীলাস্থান দেখতে গৌরাঙ্গদেব যখন ছুটে এলেন, তার কোনও চিহ্ন দেখলেন না তিনি। আকুল হয়ে কেঁদে ভাসালেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী। দীর্ঘদিন ব্রজমণ্ডলে থেকে সমস্ত তীর্থ উদ্ধার করেন।—

বৃন্দাবনে আচার্য শ্রীরূপ সনাতন
প্রভু মনোবৃত্তি প্রকাশিলা দুইজন।
লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র প্রমাণেতে
শ্রীরূপ গোঁসাঞির এক চিন্তা হৈল চিতে॥

মাসিকে আমি একটা প্রশ্ন করলুম: শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান সবই কি বৃন্দাবনে?

মাসি হাসলেন, বললেন: মধুবন মথুরা থেকে মাইল দশেক। এমন বন কত আছে তার সঠিক হিসেব আমার জানা নেই। শুনেছি এখানে দ্বাদশ বন, দ্বাদশ উপবন, দ্বাদশ প্রতিবন, দ্বাদশ অধিবন, দ্বাদশ সেব্যবন, দ্বাদশ তপোবন, দ্বাদশ মোক্ষবন, দ্বাদশ কামবন, দ্বাদশ অর্থবন, দ্বাদশ ধর্মবন আর দ্বাদশ সিদ্ধিবন।

বনের এতবড় ফিরিস্তি শুনে আমারও হাসি পেল।

মাসি বললেন: একবার পরিক্রমায় বেরব ভেবেছিলাম। পাণ্ডারা বলল যে বরাহ পুরাণে পরিক্রমার যে নির্দেশ আছে আজকাল আর তা মানা হয় না। এখন নারায়ণ ভট্টের ব্রজভক্তি-বিলাস মতেই পরিক্রমা করা হয়।

চলতে চলতে মাসি বললেন: তুমি কিছুদিন থাকলে তোমার সঙ্গে একবার ঘুরে আসতাম। কয়েকটা জায়গায় যাবার সখ ছিল।

আমি মাসির মুখের দিকে চাইলুম।

বেশি নয়, কয়েকটা জায়গা।

একটু থেমে আবার বললেন: বহুলা গাইয়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই।

আমি যে ভুলে গিয়েছিলুম নাম, মাসি আমার মুখের দিকে তাকিয়েই তা বুঝতে পারলেন। বললেন: বহুলার নামেও বন আছে। থাকবে নাই বা কেন! বহুলা কি মানুষের চেয়ে কম! প্রবাদ আছে যে বহুলাকে একবার বাঘে ধরে। তার বাছুর ছিল বাড়িতে, তাকে তখন দুধ দেবার সময়। বহুলা বাঘের কাছে কাকুতি মিনতি করে খানিকক্ষণের জন্যে প্রাণ ভিক্ষা নেয়। তারপর বাছুরকে দুধ দিয়ে বাঘের কাছে আবার ফিরে আসে। এই বাঘ আর কেউ নয়, স্বয়ং বিষ্ণু, বহুলার পরীক্ষা নিতে এসেছিলেন। পর্বতের গুহায় গো-মন্দির আর পাথরের গায়ে ক্ষোদা বহুলা গাই, তার বাছুর আর শ্রীমধুসূদন মূর্তি। গোবর্ধন পাহাড়ের কাছেই রাধা কুণ্ড ও শ্যাম কুণ্ড। শ্যাম কুণ্ডের জল কালো আর তপ্ত কাঞ্চনের

রঙ রাধা কুণ্ডের জলের। অথচ এই দুই কুণ্ডের জলের নাকি যোগাযোগ আছে।

কত গল্প শুনলুম মাসির মুখে, সব কি মনে আছে? লুকলুক গুহায় শ্রীকৃষ্ণ লুকোচুরি খেলতেন। দুধের জন্য লুকিয়ে থাকতেন সাঁকারি ঘোরে। ফুলের মালা গেঁথে গোপিনীদের সঙ্গে খেলা করতেন খেলবনে। রাধার জন্য বাঁশী বাজাতেন সঙ্কেত স্থানে। গাঁঠৌলি গ্রামে তাঁদের প্রেমের গ্রন্থি-বন্ধন। ডাঙ্গোলিতে মান সরোবর, রাধার মান ভঞ্জন করেন তারই তীরে।

বুড়িকা খেরার গল্প বলবার সময় মাসি হাসছিলেন, বললেন: রাধার সহচরী ছিলেন মানবতী। তার স্বামীর রূপ ধারণ করে একদিন শ্রীকৃষ্ণ এলেন মানবতীর ঘরে। মানবতী শাশুড়ীকে পাহারা রাখলেন, বললেন, অন্য কেউ এলে যেন তার মাথা ভেঙে দেন। মাথা ভাঙল বুড়ি নিজের ছেলের।

হাসতে হাসতে মাসি বললেন: কী ছেলেমানুষি বল!

তখন আমরা গোবিন্দজীর মন্দিরে পৌঁছে গেছি। বিরাট দালান ও প্রশস্ত চত্বর। মথুরার পুরাবৃত্ত-লেখক গ্রাউস সাহেবের কথা আমার মনে পড়ল। তিনি বলেছেন যে, ইয়োরোপের গির্জার সঙ্গে এই মন্দিরের নক্সার কিছু মিল আছে। তাঁর সন্দেহ হয়েছে যে, যে স্থপতিরা এই মন্দির নির্মাণ করেছে, তারা বোধহয় জেস্যুইট ধর্মপ্রচারকদের সাহায্য লাভ করেছে। এ কথা সত্যি হতে পারে। কেন না, আকবর বাদশাহের দরবারে অনেক জেস্যুইট স্থান পেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। আর ঐ সময়েই তো মন্দিরের নির্মাণ সমাধা হয়। রূপ সনাতন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বটে, কিন্তু অর্থ ছিল মানসিংহের।

মাসি আমাকে মন্দিরের পূর্ব-গৌরব শোনালেন। বললেন: মুসলমান বাদশাহের সময় এই মন্দিরের মাথা এমন ছোটখাট ছিল না। পাঁচ পাঁচটা উঁচু চূড়া ছিল। সন্ধ্যেবেলায় যখন ঘিয়ের

প্রদীপ জ্বালা হ্ত, তখন দিল্লী থেকেও আওরঙ্গজেব বাদশাহ একটা চূড়া দেখতে পেতেন। একদিন তাঁর উজীরের কাছে জানতে চাইলেন, এই আলো কোথা থেকে আসছে। উজীর বললেন, মথুরার আলো—কাফেররা বাতি জ্বালিয়েছে তাদের বড় মন্দিরে। বাদশাহ তখুনি লোক পাঠালেন, সেই মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরির জন্যে। কিছুদিন পরে বাদশাহ নিজে এসে নমাজ পড়ে গেলেন সেই মসজিদে।

ঠাকুর কোথায় গেল ?

ব্যাকুলভাবে আমি প্রশ্ন করলুম।

অম্বরে : মাসি জবাব দিলেন : খবর পেয়ে মন্দিরের পুরোহিত গোবিন্দজীর বিগ্রহ নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

কিন্তু—

মন্দিরের ভেতর তর্ক নয় গোপাল : মাসি আমাকে বাধা দিলেন : ধর্ম বিশ্বাসের কথা। বৃন্দাবনে এসে নির্বিচারে সব মেনে নেবে, তাতেই পাবে আনন্দ। তর্কে কি আনন্দ আছে ?

এ কথা নিশ্চয়ই সত্য। সত্য না হলে এত মানুষ কেন এখানে ভিড় করে থাকে! ধর্মে বিশ্বাস আমাদের একদিনের নয়। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ভগবানকে আমরা তিলে তিলে গড়ে তুলেছি। আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে গড়েছি আমরা নিজে, কত ত্যাগ কত অত্যাচার কত মৃত্যু বরণ করে। সেই প্রাণের ঠাকুরকে কি আমরা যুক্তি দিয়ে ভেঙে ফেলব, আমাদের বুদ্ধির অহংকার দিয়ে, আমাদের ফাঁকা হাল্কা মন নিয়ে ? কী লাভ হবে তাতে ? বৃন্দাবনে আমি তর্ক করব না, এই প্রতিজ্ঞা করলুম মনে মনে।

মদনমোহনের মন্দির দেখবার সময় মাসি আর একটা গল্প শোনালেন, মুলতানের বণিক কৃষ্ণদাসের গল্প। প্রবাদ আছে যে কৃষ্ণদাস যখন পণ্য-বোঝাই নৌকো নিয়ে আগ্রার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন কালিদহ ঘাটের কাছে বালির চরে তাঁর নৌকো আটকাল।

তিন দিনের অক্লান্ত চেষ্টাতেও যখন নৌকো এগোল না, তখন কৃষ্ণদাস সনাতন গোস্বামীর শরণ নিলেন। সনাতনের সমস্ত ভরসাই তো মদনমোহন। সেই কৃষ্ণের কৃপাতেই কৃষ্ণদাসের নৌকো ভাসল। কিন্তু কৃষ্ণদাস সহজে ভেসে যেতে পারলেন না। ফেরার পথে তাঁর সমস্ত অর্থ দিলেন মদনমোহনের মন্দির নির্মাণের জন্যে।

এই মন্দিরের সঙ্গে আর একজনের নাম আছে জড়িয়ে। তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি সূরদাস। আমিন ছিলেন আকবর বাদশাহর অধীনে, আর নিজের রোজগারের শেষ কড়িটি পর্যন্ত ব্যয় করতেন মদনমোহনের সেবায়। দিল্লীতে একবার টাকা পাঠাতে পারলেন না, পাথর পাঠালেন সিন্দুক ভরে। ধরা পড়ে বন্দী হলেন। কিন্তু বাদশাহ মুক্তি দিলেন তাঁকে। কেন মুক্তি দিলেন জিজ্ঞেস করে জানা গেল, মদনমোহনের স্বপ্নাদেশ।

বৃন্দাবনে কি মন্দিরের শেষ আছে : চলতে চলতে মাসি আমাকে বললেন : আকবরের সভাসদ রায়সিংহের তৈরি গোপীনাথের মন্দির। তার ভাঙ্গা অবস্থা। পাশেই নতুন মন্দির তুলেছেন নন্দকুমার বসু। রায়সিংহের বড় ভাই নোনকরণ নির্মাণ করেছেন যুগলকিশোরের মন্দির। রাধাবল্লভজীর মন্দির সুন্দরদাসের তৈরি। শ্রীরঙ্গজীর মন্দির তুলেছেন শেঠ লক্ষ্মীচাঁদ, আর কৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দির আমাদের লালাবাবুর কীর্তি।

গল্প শুনতে শুনতে স্বাতি আমার স্মরণশক্তির প্রশংসা করল, বলল : এত নাম তুমি মনে রাখলে কী করে গোপালদা?

আমি হেসে বললুম : এটা প্রশংসা হল না স্বাতি। যত মনে রেখেছি তার চেয়ে বেশি গেছি ভুলে। কাচের মন্দির, শাহজীর মন্দির, মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাবার পথে বিরলাও মন্দির তুলেছেন।

স্বাতি বলল : তোমার মন্দিরের কথা থাক। ফেরার পথে যখন বৃন্দাবনে নামব তখন সে সব দেখব।

তবে কি ঘাটের কথা বলব ?: আমি প্রশ্ন করলুম: কংস বধ করে কৃষ্ণ যেখানে বিশ্রাম করেছিলেন সেই বিশ্রান্তি ঘাট, বা নন্দের কন্যা যোগনিদ্রাকে কংস যে ঘাটে আছড়েছিলেন সেই যোগঘাট, কিংবা কালিয়দমন ঘাট, কাল নাগকে ধ্বংস করতে কৃষ্ণ যেখান থেকে জলে নেমেছিলেন। এই রকম ছাব্বিশ ঘাটের ভেতর চীর ঘাট তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

কেন ?

স্বাতি আমার মুখের ওপর তার প্রশ্নের দৃষ্টি তুলে ধরল।

বললুম: এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন। আজও তার নিশানা আছে গাছের ডালে ডালে। নানান রঙের কাপড়ের টুকরো বাঁধা। যাত্রীরা পয়সা দিয়ে কাপড় কিনে গাছে বেঁধে যাচ্ছে।

খিলখিল করে স্বাতি হেসে উঠল। বলল: যথেষ্ট হয়েছে। তোমার ঘাটের গল্প ছেড়ে এবারে অন্য কিছু বল।

তবে বটের গল্প শোন।

আমি জবাব দিলুম।

স্বাতি বলল: সে আবার কী ?

কেন, বংশীবট: আমি বললুম: যেখানে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন। আর অক্ষয় বট, যার জন্মের হিসেব নেই। কৃষ্ণের জন্ম দেখেছে বললেও হয়তো যাত্রীরা বিশ্বাস করবে।

স্বাতি আর একবার হেসে উঠল, বলল: ঘাট আর বট ছাড়া তোমার কি আর কোন গল্প নেই গোপালদা ?

গম্ভীর ভাবে বললুম: আছে। কুণ্ড আর বনের গল্প এখনও কিছু বলিনি। বেশি নয়, গোটা কয়েক বনের কথা তোমাকে শুনতেই হবে, নইলে বৃন্দাবনের গল্পই অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

মামা হাসছিলেন অল্প অল্প।

বললুম: নিকুঞ্জবনে যদি যাও, দুপয়সার ছোলা নিতে ভুলো

না। এ দুটো পয়সা যদি বাঁচাবার চেষ্টা কর, তাহলে তোমার গোটা ভ্যানিটি ব্যাগটাই যাবে। আরও যদি কিছু না যায় তো সে তোমার ভাগ্য।

বড় বড় চোখে স্বাতি আমার মুখের দিকে চাইল। হেসে বললুম: বাঁদর।

আমাকে নিয়ে ঢোকবার সময় সত্যিই মাসি দুপয়সার ছোলা কিনেছিলেন। বলেছিলেন: কুঞ্জবন রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। দেখছ না এখানকার গাছপালা মাটির ওপর যেন লুটিয়ে আছে।

ছোট একটি মন্দির দেখলুম। তার ভেতর ললিতা ও বিশাখা সখীর সঙ্গে রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ। সবাই বলেন, এ বড় জাগ্রত মন্দির। আজও প্রতি রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ এখানে রাধারাণীর সেবা নিতে আসেন। সন্ধ্যাবেলার আরতির পর এক ঘটি জল আর দাঁতন সাজিয়ে রেখে পাণ্ডারা চলে আসেন। রাতে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। সকালে এলে দেখা যায় যে শুধু শয্যারই ব্যবহার হয়নি, দাঁত মেজে মুখও কেউ ধুয়ে গেছে। পাণ্ডার কাছে দর্শনী দিয়ে যাত্রীরা প্রমাণ নিয়ে যায়।

আপনি নিজে কখনও দেখেছেন মাসিমা?

আমি প্রশ্ন করলুম।

মাসির মুখ যেন গম্ভীর হল, বললেন: এই বিশ্বাসকে আমি যে শ্রদ্ধা করি গোপাল!

আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হলুম। বললুম: আমিও করব।

মাসি বললেন: শুনেছি আকবর বাদশাহ নাকি এ কথা অবিশ্বাস করেছিলেন। অবিশ্বাস করবারই কথা তো। তবু এখানে এসেছিলেন, চোখে কাপড় বেঁধে তাঁকে এখানে আনা হয়। কী দেখেছিলেন জানি না, বৃন্দাবনের নতুন জন্ম দিয়ে গেলেন। আজ এখানকার যা কিছু প্রাচীন গৌরব, সবই প্রায় তাঁর আমলের।

তানসেনের গুরু স্বামী হরিদাসের কথা মনে আছে: মাসি জানতে চাইলেন: যে সর্বত্যাগী পুরুষ যমুনার জলে ফেলে দিয়েছিলেন স্পর্শমণি। আকবর এখানে তাঁকেও দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু নিজের পরিচয় দিয়েও তিনি আদর পাননি। স্বামী হরিদাস বুকে নিয়েছিলেন শিষ্য তানসেনকে। অন্য বাদশাহ কী করতেন জানিনে, আকবর স্বামীজীকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দিয়ে গেলেন।

ফেরার পথে আমি মাসির কথাই ভাবতে লাগলুম। তাঁকে ঠিক এমনটি দেখব আমি ভাবিনি। মা-মাসি বলতে এতদিন আমার চোখের সামনে যে রূপ ভেসে উঠত, এ ঠিক তা নয়। এ যেন অন্য রূপ। যে বিশ্বাসকে মাসি সকলের ওপরে স্থান দিয়েছেন, মনে হল, বুদ্ধি দিয়ে সে বিশ্বাসকে তিনি যাচাই করে নিয়েছেন। দুটোর আপেক্ষিক লাভ-ক্ষতি বিচার করে দেখেছেন নিরপেক্ষভাবে। তার পরে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হল, এলাহাবাদের কর্তার সঙ্গে এই মাসির বুঝি কোনও পার্থক্য নেই। ইনি তাঁর যথার্থ সহধর্মিণী। আচারে না হলেও তাঁর বিচারে নিশ্চয়ই। ইনিও সংস্কারমুক্ত, কিন্তু আচারে তাঁর সত্য রূপটি আড়াল করে রেখেছেন। মাসিকে আমার ভাল লাগল।

দুপুরে মাসির নিজের হাতের রান্না খেলুম। নিরামিষ রান্না। মাটিতে আসন পেতে খেতে দিয়েছিলেন। নিজে পাখা হাতে সামনে বসেছিলেন। বললেন: খেতে কষ্ট হবে, না?

কেন কষ্ট হবে?

আমি জানতে চাইলুম।

মাসি বললেন: আমি নিরামিষ খাই, আমিষ ছুঁইনে।

বাধা দিয়ে বললুম: তাতে কষ্টের কী আছে। নিরামিষ খাবারেই যে আমি বেশী অভ্যস্ত।

মাসি কিছু আশ্চর্য হলেন আমার উত্তর শুনে। আমি তাই

কৈফিয়ৎটুকুও দিয়ে দিলুম : শৈশবেই বাবা মারা যান, আমি মায়ের কাছে মানুষ হয়েছি।

কিন্তু মনে হল, কৈফিয়ৎটা যেন জোরালো হল না। তাই আরও কিছু যোগ করে দিলুম : মাছ মাংস খাবার জন্যে মা অবশ্য জোর করতেন, নিজের হাতে রাঁধতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমি বড় জেদী ছিলুম। যা মা খাবেন না তা আমিও খাব না, এমনি আমার প্রতিজ্ঞা ছিল।

আর ছুটি ভাত দিই গোপাল ?

মাসি প্রশ্ন করলেন।

ভাত ?

অনেকদিন এমন করে কেউ জিজ্ঞেস করেননি। পেটে জায়গা ছিল না। তবু না বলতে পারলুম না। বললুম : পেট তো ভরে গিয়েছে মাসিমা।

ওই কটি খেয়েই কারও পেট ভরে ?

মাসি বিশ্বাস করলেন না। আরও কিছু ভাত এনে পাতে দিলেন। বললেন : দই দিয়ে মেখে খাও।

এই মুহূর্তে আমার বুকের ভেতর থেকে কান্নার মত তীব্র একটা বেদনা ঠেলে উঠল। আমার মনে পড়ল অনেকদিন আগের কথা। কলকাতায় থেকে তখন কলেজে পড়ি। ছুটিতে বাড়ী গিয়েছিলুম। খাবার পাতে দই দিতে মা ভুলে গিয়েছিলেন। বাড়ীতে পাতা দই। পেট ভরে গিয়েছিল বলে আমি সেদিন দই খেতে চাইনি। মা কেঁদে ফেলেছিলেন। আজ কোনও কথা না বলে দই দিয়ে মেখে ভাত কটি খেয়ে ফেললুম। একরকমের অদ্ভুত তৃপ্তি দেখলুম মাসির চোখে।

স্বাতি বলল : বেশ লোক তুমি গোপালদা। যত ভাবছ তার কিছুই বলছ না। আর কাজের কথাটি যাচ্ছ এড়িয়ে, বেশ সন্তর্পণে।

তার প্রথম অভিযোগটা মানি। ভাবলেই কি সব কথা মনে পড়ে, না মনে পড়লেই সব কথা বলা যায়। স্বাতি ধরেছে ঠিকই। ভাবলুম অনেক কথাই, কিন্তু ছেঁটেকেটে কমিয়ে যা বললুম, তা প্রশ্নের উত্তর দেবার মত ছোট ছোট কাটা কাটা কথা।

তার দ্বিতীয় অভিযোগটাও হয়তো সত্য। তবু প্রশ্ন করলুম: কাজের কথা কাকে বলছ?

মামী বললেন: ঠিকই বলছে স্বাতি। আমাদের ভাবনা তোমার জন্যে। তোমার নিজের সম্বন্ধে কী খবর সংগ্রহ করলে, সেইটেই এখনও বলনি।

স্বাতি বলল: আরও একটা সত্য গোপালদা এড়িয়ে গেছেন। বড় মাসি বৃন্দাবনে থাকেন, কিন্তু কেন থাকেন তা বলেননি।

হেসে বললুম: ভাল করে না জেনে কোনকিছু বলার স্বভাব আমার নয়, তাই বলিনি। মাসি তো আমার মতো বাচাল নন যে গায়ে পড়ে গল্প শোনাবেন আমাকে!

বিশ্বাস হল না: স্বাতি উত্তর দিল: প্রয়োজনীয় খবর তুমি জেনে নাওনি, এ কথা মানতে আমি রাজী নই।

তার মাথা ঝাঁকানো দেখে আমিও হাসলুম।

আর এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে বলল: এই নাও, এটুকু খেতে খেতে বাকিটুকুও বলে ফেল।

ঘুষ দিচ্ছ?

পেয়ালাটি নেবার সময় আমি ঠাট্টা করলুম।

সত্যিই, এলাহাবাদ থেকে মাসি কেন পালিয়ে এলেন, তা বুঝতে পারিনি। জটিল কিছু সন্দেহ করার মত কোনও দুর্ঘটনারও ইঙ্গিত পাইনি। জিজ্ঞেস করেছিলুম: কবে এলাহাবাদ ফিরবেন?

এলাহাবাদ?

মাসি হেসেছিলেন। বড় মিষ্টি হাসি। মনে হয়েছিল যে আমার দুরভিসন্ধি বুঝি ধরা পড়ে গেছে তাঁর কাছে। কিন্তু সতর্ক

ভাবে সেই সন্দেহটুকু তিনি এড়িয়ে গেলেন। বললেন : এলাহাবাদের কাজ তো আমার ফুরিয়ে গেছে গোপাল। কৃষ্ণ নাম করে এখানে বেশ আছি।

তবু আমি হাল ছাড়িনি। বলেছিলুম : একা একা কতদিন আর থাকবেন?

আমার প্রশ্ন শুনে মাসি আবার হাসলেন, বললেন : এখানে তো এক মুহূর্তও একা মনে হয় না বাবা। কৃষ্ণ যে সারাদিন আমাদের কাছে কাছে আছেন।

মাসির বুকের ভেতর থেকে কোনও দীর্ঘশ্বাস উঠল কিনা তাঁর মুখ দেখে আমি বুঝতে পারলুম না। নতুন কোন প্রশ্নও হঠাৎ খুঁজে পেলুম না।

মামা এতক্ষণ কোন কথাই বলেননি। চা শেষ করে গভীর মনোযোগে ধোঁয়া গিলছিলেন। এবারে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন : হরিপদর কথা কিছু জিজ্ঞেস করনি?

আমার লজ্জা করেছিল সে কথা জিজ্ঞেস করতে। অভদ্রতাও হত। বুদ্ধিমতী মাসি স্পষ্টই বুঝতে পারতেন যে কর্তার সঙ্গে এ বিষয়ে আমার শুধু আলোচনাই হয়নি, তার বেশি কিছু হয়েছে। কর্তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবার আগে তাঁর সন্দেহের উত্তরাধিকার পেয়েছি। সত্যি কথা বললে মামা অসন্তুষ্ট হবেন, তাই উত্তরটা দিলুম সাবধানে। বললুম : তার অবকাশ পাইনি।

হুঁ।

বলে মামা তাঁর পাইপ টেনে নিলেন মুখে।

স্বাতি রাগ করল, বলল : কয়েকটা দিন ধরে যত বাজে কাজ করলে আর বাজে কথা কইলে, শুধু কাজের কথাটি জিজ্ঞেস করবারই সময় হল না।

হেসে বললুম : ওটাও বাজে কথা।

কিন্তু মুখে না বললেও মাসির গভীর দুঃখ আমি হৃদয় দিয়ে

অনুভব করেছি। কয়েকটা দিন আমাকে নিয়ে যেভাবে মেতে রইলেন, তার মানে কি আমি বুঝি না! কিছুতেই আমায় ছেড়ে দিতে চাইছিলেন না। যাবার দিনও হাত ধরে বলেছিলেন, আর কটা দিন থেকে যাও। বলেছিলেন, কবে এলাহাবাদ ফিরব জিজ্ঞেস করছিলে, না? ফিরব না কেন! এলাহাবাদ পৌঁছে খবর দিও, আমি ফিরে যাব। বলে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল লুকিয়েছিলেন। মাসিকে আমি কাঁদতে দেখিনি।

স্বাতি আমার কথার উত্তর দিল, বলল: কোন্‌টা বাজে কথা, আর কোন্‌টা কাজের কথা, সেটা তুমি আমাদের বুঝিও না গোপালদা!

মামী বললেন: নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করতে নেই।

ছেলেখেলা আমিই করছি বটে। মামা কি আমায় ছেলেখেলা করতে ডেকে পাঠিয়েছেন! এ অভিযোগের উত্তর আমি দিলুম না।

কিন্তু চোখের সামনে ভেসে উঠল যমুনার শীর্ণ কায়া। বিস্তীর্ণ বালুতটের ভেতর দিয়ে নীল ধারা ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। মাসির সঙ্গে ঘাটে বসে যমুনার রূপ দেখেছি অনেকবার। আর মনে মনে দেখেছি অন্য রূপ, যার বিশাল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি!

আজ দিল্লীর বৈঠকখানায় বসে আমি যমুনার আর এক রূপ দেখলুম। কালিন্দী যমুনা, তার নীল জল, পথ চলতে খানিকটা অসতর্ক হলেই ও নীল ধারা বইবে আমার জীবনের ওপর দিয়ে। কেন জানি না, মামার কথা হঠাৎ মনে পড়ল: যমুনা তো গঙ্গা নয় যে সারাজীবন পাপ কাজ করে মরণকালে গঙ্গাযাত্রা করলেই সশরীরে স্বর্গলাভ হবে। যমুনা হলেন সূর্যের কন্যা আর যমের ভগিনী। তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সংসারে কারও নিস্তার নেই। সেই যমুনাকে ফাঁকি দিয়েছে মূর্খ জ্ঞানশঙ্কর।

মথুরা থেকে তখন ট্রেন ছাড়ছিল। এক ভাঁড় চায়ের জন্যে হাত বাড়িয়েছিলুম। হাতখানা গুটিয়ে নিলুম। মনে হল, ঐ চা বুঝি যমুনার নীল জলে তৈরি। ভয়ের মত নীল, মৃত্যুর মত নীল। আজ মনের মধ্যে একটি কথা চমকে উঠল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা: চা পান, না বিষ পান। মাটির ভাঁড়ে করে লোকটা বুঝি বিষ বিতরণ করছে। দু চোখ বন্ধ করে আমি স্টেশনটা পেরিয়ে এলুম।

১৪

চাওলা এসেছিল সন্ধ্যেবেলাতেই। তার ছোট গাড়িটাতে করে একাই এসেছিল। মামী তখন জপে বসেছেন, মামা বসে ছিলেন বাইরে বেতের চেয়ার নামিয়ে।

গোপালবাবু বাড়ী আছেন?

চাওলা ইংরেজীতে প্রশ্ন করল মামাকে। আমি জানি, অন্ধকারে মামা তাকে চিনতে পারেননি। তবু তাকে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

ঘরের ভেতর স্বাতির সঙ্গে আমি গল্প করছিলুম। গাড়ির শব্দে কান গিয়েছিল সেদিকে। তাই চাওলার গলা শুনতেই বেরিয়ে এলুম। স্বাতি এল না।

চাওলা লাফিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও হাত বাড়ালুম। করমর্দনের প্রথা বাঙলাদেশে আজ নেই। কোনদিন ছিল কিনা জানিনে। কিন্তু এদিকে আছে। এ প্রথাকে সবাই শ্রদ্ধা না করলেও অনেকে করে। চাওলা তাদের একজন।

আমার মুখে চাওলার নাম শুনে মামা চিনতে পারলেন, লজ্জিতও

হলেন। বললেন : বাইরের বাতিটা জ্বেলে দাও। বুড়ো মানুষ, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাইনে।

বাধা দিয়ে চাওলা বলল : অন্ধকারই তো ভাল।

চাওলা চেয়ারে বসল। আমি বসলুম বাতি জ্বালাবার পর।

চাওলা বলল : দেখলেন তো, কতটুকু জায়গা আলো হল। প্রায় সবটাই রইল অন্ধকার।

আমার মনে হল, চাওলা আমাকে অন্য কথা বলল। বলল দেশের অবস্থার কথা। দিল্লীর আলো দিয়ে সারা ভারত আলোকিত হবে না। সেই সত্যের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে তার কথায়। তার চরিত্রের এই দিকটা কি আমি সেদিন দেখতে পেয়েছিলুম!

আমি তার জবাব দিলুম তারই মত করে : তবু যতটুকু আলো হয়। অন্ধকার না ঘুচুক, আলোর বিজ্ঞাপন তো হল।

চাওলা খুশী হল প্রয়োজনের চেয়ে বেশি, বলল : বিশ্বাস করবে না, তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে মন আমার ছটফট করছিল।

সে আমার ভাগ্য।

আমি উত্তর দিলুম।

মামার বোধহয় ভাল লাগছিল না, বললেন : আমি এবারে উঠি গোপাল, তোমরা গল্প কর।

বলে চাওলাকে বললেন : একটু কাজ আছে।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

বলবার সময়েও চাওলা আবার উঠে দাঁড়াল। তারপর মামা চলে গেলে একটুখানি মুচকি হাসল।

হাসলে যে?

আমি জানতে চাইলুম।

কেন হাসলুম? : চাওলা বলল : সব জায়গাতেই দেখি বুড়োরা এমনি করে আমায় এড়িয়ে চলেন।

নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বলল : আমার চেহারায় কী আছে বলতে পার ?

প্রথম থেকেই চাওলাকে আমার অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছিল। তার সঙ্গে যে আমার নতুন পরিচয়, আর প্রয়োজন কিছু রেখে ঢেকে কথা কইবার, সে কথা ভুলে গেলুম। বললুম : চেহারায় নয়, মনে।

চাওলা বুঝি চমকে উঠল, বলল : বল কি !

বললুম : ঠিকই বলছি।

অনুরোধে চাওলা ভেঙে পড়ল, বলল : আর একটু খুলে বল।

আমি খুলেই বললুম : ভেতরে কিছু জ্বালা আছে। তাই মুখে খানিকটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

চাওলা উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত গুম হয়ে বসে রইল।

বললুম : সত্যি কথায় ভয় পেয়ে গেলে ?

চাওলা এবারে হাসল। বলল : সেইজন্যেই কি তোমার কাছে ছুটে এলুম !

হেসে বললুম : কেন, আমার ভেতরেও জ্বালা দেখছ নাকি ?

কী জানি : চাওলা উত্তর দিল : যারা জ্বলছে তারাই বোঝে জ্বালার কথা।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল : চল, একটু বেড়িয়ে আসি। খোলা হাওয়ায় মন্দ লাগবে না।

কিছু খাবে না ? : না উঠেই আমি তার জবাব দিলুম : চা কিংবা কফি ?

রাম খেলাওনকে আমি দেখতে পেয়েছিলুম। ট্রেতে করে কিছু আনছিল আমাদের জন্যে।

চাওলা বসে পড়ল, বলল : ওসবে অভ্যেস নেই, আপত্তিও নেই।

আমি হেসে বললুম : চা কফি চলে না, এমন মহাপুরুষের নাম

আমি নোট বুকে লিখে রাখি। তোমার নামটাও টুকতে হবে দেখছি।

ভুলে যাচ্ছ আমরা পাঞ্জাবের লোক : চাওলা জবাব দিল : জন্মে অবধি মাঠা খেয়ে মানুষ। দিল্লী এসে চায়ের আস্বাদ পেয়েছি।

চায়ের ট্রে রাম খেলাওন টেবিলের ওপর রেখেছিল। চাওলা নিজেই হাত লাগাল। টি পটের ভেতর খানিকটা চিনি ফেলে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বলল : মাঠা জান?

আমি জানি না স্বীকার করলুম। তবে দুধের কিছু যে হবে তাতে সন্দেহ ছিল না।

চাওলা বলল : আমাদের সমস্ত গৃহস্থ ঘরে গরু মোষ আছে। রাতের দুধটা আমরা জমিয়ে দিই। সকালে মেয়েরা সেই দই থেকে মাখন তুলে নেয়। যা পড়ে থাকে, তাকেই মাঠা বলি। তোমাদের ঘোলের সরবতের মত আমরা গেলাস ভরে খাই, রায়তা বানাই।

এক পেয়ালা চা এগিয়ে দিয়ে বলল : রায়তা বোঝ?

আমার উত্তরের আগেই হেসে বলল : কলকাতার মানুষ নিয়ে কী বিপদেই পড়া গেছে!

আমি কলকাতার মানুষ কে বলল?

মুচকি হেসে চাওলা বলল : অত তাড়া কিসের? সময় হলে সবই বলব।

চাওলাকে আমার ভাল লাগল। খানিকক্ষণ আলাপ করেই মনে হল, তার মনের ভেতরটা যেন দর্পণের মত দেখতে পাচ্ছি। অত্যন্ত সরল নির্ভীক স্পষ্টবাদী লোক। গাড়ি চালাতে চালাতে বলল : কোনো হোটেলে বসবে?

বললুম : ওসব আবহাওয়া আমার ভাল লাগে না।

চাওলা আমার মুখের দিকে চাইল, বলল : সত্যি বলছ?

মিথ্যে কেন বলব?

আমি জবাব দিলুম।

চাওলা বলল : নয়াদিল্লীতে থাক অথচ হোটেল ক্লাব ভাল লাগে না, তাই আশ্চর্য লাগছে।

একটু ভেবে বললুম : বরং রাজঘাটে চল।

ও জায়গা আমার ভাল লাগে না।

চাওলা উত্তর দিল।

আমি বুঝি চমকে উঠলুম। গান্ধীজীর সমাধি ভাল লাগে না, এমন লোকও ছুনিয়ায় আছে? বিশ্বাস হল না চাওলা সত্য বলছে।

চাওলা আমার মনের কথা ধরতে পেরেছিল, বলল : বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা, এই তো!

আমি স্বীকার করলুম।

চাওলা বলল : রাজঘাটে গেলে আমার কী মনে হয় জানো? লক্ষ লক্ষ গ্যালন পেট্রল আর হাজার হাজার মণ ফুলের নীচে মহাত্মাজী চাপা পড়ে আছেন। ঐ ভারের নিচে থেকে তাঁর মুক্তি কোনদিন হবে না।

কাগজে আমিও এসব বিবরণ পড়ি। চাওলা বলল : বিদেশ থেকে ভারতে কোনও অতিথি এলেই আমরা তাঁদের রাজঘাটে নিয়ে যাই, ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কিন্তু সেই মহাত্মা কি এই শ্রদ্ধা চেয়েছিলেন? বেঁচে থাকলে কি তিনি এই অপব্যয় সমর্থন করতেন? যে দেশের মানুষ ছুবেলা খেতে পায় না পেট ভরে, সেই দেশের মানুষ সেই জাতির পিতা সন্তানকে ক্ষুধার্ত রেখে নিজে সম্মান নেবেন হাসিমুখে?

চাওলা খানিকটা উত্তেজিত হয়েছিল, বলল : ছুদিন ধরে তোমরা দিল্লী দেখছ শুনলুম। দিল্লী নয়, দিল্লীর কঙ্কাল বল, কিংবা দিল্লীর মমি। মরা মানুষকে যেভাবে ওষুধ দিয়ে জিইয়ে রাখে, দিল্লী নামে একটা পোড়া জায়গাকেও আমরা তেমনি সাজিয়ে রেখেছি। ভারতের রাজধানী দিল্লী, কিন্তু দিল্লী দেখে ভারতকে কি চেনা যায়?

তুমিই বল, বাঙলাদেশ কি কলকাতার চৌরঙ্গী, না কলকাতার চৌরঙ্গী দেখে বাঙলার খানিকটা পরিচয়ও পাওয়া যায়।

সত্য কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু চাওলা এত উত্তেজিত কেন হচ্ছে। ভদ্রতার খাতিরে তবু বললুম : তা বটে তা বটে।

গোপালবাবু : চাওলা জবাব দিল : নিজের মনের ভাবকে লুকিয়ে লাভ নেই। তাতে নিজেকেই প্রতারণা করা হয়। সত্যিকার দিল্লী যদি দেখতে চাও তো একদিন আমার সঙ্গে চল। আমি তোমায় দিল্লী দেখাব।

বেশ তো।

আমি উৎসাহ প্রকাশ করলুম।

কিন্তু তোমাকে কষ্ট করতে হবে : চাওলা উত্তর দিল : একটা দিন তোমাকে তাদের সঙ্গে কাটাতে হবে তাদেরই একজন হয়ে।

কাদের সঙ্গে ?

আমি প্রশ্ন করলুম।

চাওলা বলল : দিল্লীর আদিম অধিবাসীদের কথা আমি বলছি। যারা পাথর খুঁড়ে গম ফলিয়ে তোমাদের সেই গম খেতে দেয়। আর নিজেরা খায়—

চাওলা হঠাৎ থেমে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বলল : যাদের এক ফালি জমিও নেই, দিল্লীর পথে ঘাটে তাদের তুমি দেখেছ। তারা মোট বয়, দিনমজুরি করে, আর রাতে ঘুময় উদার আকাশের নীচে। সেখানে তাদের জন্মের অধিকার, আইন করে যা তাদের কেড়ে নেওয়া যায় না।

গল্পে গল্পে আমরা তখন ফতেপুরীর কাছে এসে গিয়েছিলুম। হঠাৎ লক্ষ্য করে চাওলা বলল : দেখ কী বদ অভ্যেস, নিজের আস্তানার কাছেই এসে গিয়েছি।

বললুম : তোমার বাড়ি বুঝি এইখেনে ?

বাড়ি ? : চাওলা হাসল : বাড়ি ফেলে এসেছি লায়ালপুরে।

বাপ-মা গ্রামে থাকেন, খুব কাছে। আমি হোটেলে আছি। চল, আমার হোটেলেই চল।

এখানে আমার আপত্তির কারণ নেই। বললুম: সেই ভাল। তোমার ঘরে বসেই গল্প হবে।

দুঃখ করে চাওলা বলল: আর উপায় কি বল! যবনের হাতে যখন পড়েছ, তখন একটা বাজে হোটেলেই আজ তোমাকে খেতে হল।

তালা খুলে চাওলা আমাকে তার ঘরে আনল। পরিচ্ছন্ন ঘরটি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও জিনিস নেই। প্রসন্ন মন নিয়ে দুজনেই বসলুম।

চাওলাই প্রথমে কথা কইল, বলল: তোমার সব খবর আমি পেয়েছি। কোথায় পেয়েছি তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?

তা আর পারব না: আমি জবাব দিলুম: কিন্তু সব খবর সত্যি পেয়েছ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

চাওলা বলল: আমারও যে নেই, তা নয়। কেন না নয়াদিল্লীর সোসাইটিতে সত্য কথা মুখে মুখে এমন বিকৃত হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত বলতেও লোকের সঙ্কোচ হয়। এই ধর না, আমার কথা। কেউ বলে, আমার লাখ নয় কোটি টাকার কারবার, থাকি এমন নেংটে সেজে। আবার আর এক দল বলে যে সবটুকুই আমার চাল, আসলে সব গড়ের মাঠ।

বলে নির্মল আনন্দে হাসতে লাগল।

বললুম: আমার সম্বন্ধে কী শুনে এলে?

তোমার সাহস তো কম নয়: চাওলা জবাব দিল: এত কথা শোনবার পরও ভয় পাচ্ছ না!

উত্তরে আমি একটু হাসলুম।

চাওলা বলল: জুনিয়ার ব্যানার্জি ছেলেটা তেমন চালিয়াৎ নয়, একটু সরল সোজা প্রকৃতির মানুষ। তাই নিজের সোসাইটির মেয়েরা

আড়ালে হাবা বলে। তোমার খাঁটি পরিচয়টা এরই কাছে পেয়ে গেলুম।

সেইটুকু শোনবার জন্যে আমি চাওলার মুখের দিকে তাকালুম।

চাওলা বলল: রাণা বলছিল, তুমি নিজের মুখে তোমার যে পরিচয় দিয়েছ, সে নাকি স্‌প্লেনডিড্‌।

তাই নাকি!

আমি আমার বিস্ময় প্রকাশ করলুম।

চাওলা বলল: তোমার সম্পত্তির মধ্যে নাকি একখানা ভাড়াটে ঘর, আর ডালহৌসী স্কোয়ারে সারি সারি টেবলের ভেতর একখানা কাঠের চেয়ার।

চাওলা হেসে সামনে ঝুঁকে পড়ল, বাড়িয়ে দিল তার ডান হাতখানা। এই রীতির সঙ্গে আমি পরিচিত নই, তবু হাত বাড়িয়ে দিলুম। করমর্দন করে চাওলা বলল: ব্যবসাদারদের মধ্যে আমারও এই অবস্থা। তোমার সঙ্গে মিলেছে ভাল।

হেসে বললুম: এই কি মিল নাকি? নিজের গাড়ি করে এমন সুন্দর হোটেলে এনে তুলেছ, এমন সাজপোশাক—

বলে তার দামী সুটের দিকে তাকালুম।

চাওলা প্রাণ ভরে হাসল, বলল: ওটা নিতান্তই বাইরের। ভেতরটা তোমার মতই নেংটে। এই সুট ছেড়ে খদ্দর ধরলে খেতে পাব না।

তার পরেই বলল: তোমার সঙ্গে আমার নতুন পরিচয়, কিন্তু কেন জানি না সব কথাই বলে ফেলছি। বিশ্বাস কর, সবাইকে আমি এসব কথা বলি না। একটু কফির অর্ডার দেওয়া যাক, কী বল?

বলে চাওলা উঠে দাঁড়াল।

আমি তার হাত ধরে বসিয়ে দিলুম, বললুম: না না কফি থাক্‌, তুমি তোমার গল্প বল।

গলাটা নামিয়ে চাওলা বলল: প্রেমের ব্যাপারে আমি কাঁচা ছিলুম। এক সময় সকলেই বোধহয় থাকে। তাই না?

বলে হাসতে লাগল। বলল: গল্পটা সংক্ষেপে বলি। মিস ব্যানার্জির সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গ হবার পর হঠাৎ একদিন মনে হল, মেয়েটা আমায় ভালবাসে। মনে হতেই যা হল, নিজেকে হিরো বানিয়ে তুললুম। ঝোঁকের মাথায় একখানি গাড়িও কিনে ফেললুম। কিন্তু হলে হবে কি? ঝানু আই-সি-এস আমাদের সিনিয়ার ব্যানার্জি। ঝপ করে একদিন পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়ে বসলেন। বললেন, বড় জরুরী দরকার, যতটা দিতে পার ততটাই কাজে লাগবে। ধার কর্জ করে বাপের কাছে চেয়ে কি আর কিছু দিতে পারতুম না, কিন্তু পিছিয়ে এলুম। একটা মেয়ের লোভে নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করব! পরে জানতে পেরেছিলুম, বুড়ো আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের খোঁজ নিয়েছিলেন অমনি করে।

হাসতে হাসতে চাওলা যোগ করল: বুড়োর ধারণা, পয়সাওয়ালা ছেলে প্রেমে পড়লে টাকা বার করবেই, আর ধার কর্জ করে দিলে প্রেমটা খাঁটি বুঝবে।

তার কথার ধরনে আমিও হাসলুম। বললুম: কিন্তু মেয়ে কী বলে?

মেয়ে!

চাওলা চমকে উঠল, বলল: সে তার ভাইয়ের মত নয়। তার মনের কথা জানতে পারি, এমন সাধ্য নেই আমার। তবে বিয়ে করতে রাজি হলে বুঝতুম, খাঁটি জিনিস পেয়েছি। মিত্রা কখনও মিথ্যে বলবে না।

চাওলার দুচোখে আমি শ্রদ্ধার আভাস দেখলুম।

প্রসঙ্গটা আমি পালটে নিলুম, বললুম: আমার সম্বন্ধে আর কী শুনলে সেখানে?

নিজেকে সামলে নিতে চাওলার সময় লাগল না, হেসে বলল : দুদিন পরে তুমি কোটিপতি হবে, অর্ধেক রাজত্ব—

আর রাজকন্যা ?

আমি প্রশ্ন করলুম হেসে।

রাজকন্যা নিয়ে তো রাজা বসেই আছেন, রাজকন্যার মত হলেই হল।

তাই নাকি!

আমি আশ্চর্য হলুম।

তুমি জানো না : চাওলা প্রশ্ন করল : রাজা যে নিজেই তাঁর রাজকন্যা পাঠিয়েছিলেন তোমার কাছে। মেয়ের মত হলেই তিনি প্রস্তাব করবেন।

মনে হল, এই সন্দেহ ছিল মামা মামীর মনে, হয়তো স্বাতির মনেও। কিন্তু চাওলার মত খুলে বলতে কেউই সাহস করেননি। আমি চুপ করে রইলুম।

চাওলার কাছে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেরতে একটু দেরীই হল। গাড়িতে চলতে চলতে চাওলা আরও একটা সংবাদ দিল। বলল : তোমার বোনেরও বোধহয় একটা ব্যবস্থা হল।

কেমন ?

আমি প্রশ্ন করলুম।

রাণার ভাল লেগেছে : চাওলা উত্তর দিল : বাপের মত পাবার জন্যে তোমাদের ডিনারে ডাকবে।

আমি আশ্চর্য হলুম, বললুম : এত খবর তুমি পাও কোথায় ?

বললুম না, ছেলেটা চালিয়াৎ নয়, সোজা সরল প্রকৃতির মানুষ আমাদের রাণা ব্যানার্জি।

বলে মনের আনন্দে হাসতে লাগল চাওলা।

এবারে আমি তার হাসির ভেতর আরও একটা সুর শুনতে পেলুম।

১৫

বাড়ী ফিরতেই স্বাতি আমায় চেপে ধরল, বলল : কোথায় গিয়েছিলে ?

মামা মামী শুনতে না পান, এমনি করে বললুম : তোমার বিয়ের ঘটকালি করতে।

হুঁ : স্বাতি জবাব দিল : ওই চাওলার সঙ্গে, না আর কারও সঙ্গে ?

কাকে পছন্দ : আমি প্রশ্ন করলুম : চাওলা, না রাণা ?

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে স্বাতি বলল : রাণাবাবুকে পছন্দ করলে বোধহয় ঘটক বিদেয়টা তোমার পছন্দমত হয় ?

বলেই মুখে কাপড় দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল।

মামী এগিয়ে এসেছিলেন, আশ্চর্য হয়ে বললেন : অমন করে হাসছিস যে ?

স্বাতি বলল : হাসব না ? আমরা বসে আছি না খেয়ে, আর গোপালদা বলছেন—

সত্যিই ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আমার : আমি ক্ষমা চাইলুম : আমি খেয়ে এসেছি।

খেয়ে এসেছ, বেশ তো। এমন কি আর অপরাধ হয়েছে!

তার পরেই বললেন : কী খেলে ? তোমাদের ঐ চাওলাই খাওয়াল তো!

এ প্রশ্ন আমার কাছে নতুন নয়। কলেজের ছুটিতে যখন বাড়ী আসতুম, তখন এই ধরনের অজস্র প্রশ্নে মা আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। কী খেতে দেয়, কখন খেতে দেয়, রোজই এক খাওয়া কি না। কোথাও নেমন্তন্ন থাকলে কী কী পদ হয়েছিল,

কোন্‌টা ভাল লাগল, তাতে বিশেষ কোন মশলা পড়েছিল কি না এইসব। রাগ করলে চলবে না, বিরক্ত হবারও উপায় নেই, প্রচুর ধৈর্য নিয়ে সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হবে।

হেসে বললুম: সে পাঞ্জাবী খাওয়া, শুনতেও আপনার ভাল লাগবে না।

আপত্তি করে মামী বললেন: পাঞ্জাবীরা কি আর মানুষ নয়, না তারা যা খায় তা অখাদ্য?

তর্ক না করে আমি বললুম: তন্দুরে সেঁকা মোটা রুটি আর দুম্বার মাংস। কাঁচা পেঁয়াজ আর ঝাল আচার ছিল তার সঙ্গে।

ঝাল খেতে পারলে তুমি?

স্বাতি প্রশ্ন করল।

দিব্বি চেটে পুটে খেলুম: আমি উত্তর দিলুম: চপ চপ করছিল ঘি, অনেকক্ষণ ধরে সাবান ঘষতে হল হাতে।

বল কি: মামী আশ্চর্য হলেন: দিল্লীর হোটেলে এখনও ঘিয়ের রান্না হচ্ছে?

আমি সত্যি কথাই বললুম: হোটেলে ঘি আসে না। আসে চাওলার গ্রামের বাড়ি থেকে। খেতে বসে রুটিতে মাখায় আর ডালে ঢালে। বাংলা দেশে অমন ঘি আমরা খাইনি।

মামা এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন, এবারে বললেন: পাঞ্জাবীরাই দুধ ঘি খেতে জানে। তাই চেহারাও অমন সুন্দর।

অন্যদিনের মত আমি আমার খাট বিছিয়েছিলুম বাইরে। মামা মামী শুয়ে পড়বার পরে স্বাতি বাইরে এল। একখানা চেয়ার নামিয়ে আমার কাছেই বসল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল: একটা সত্যি কথা বলবে?

মিথ্যে তো আমি কখনও বলি না।

আমি জবাব দিলুম।

একটুখানি ম্লান হাসি হাসল স্বাতি, বলল: সে কথা সত্যিই বটে।

তবে জিজ্ঞেস কর।

আমি শুয়ে পড়েছিলুম, আবার উঠে বসলুম।

স্বাতি ইতস্ততঃ করছিল। আমি চাইলুম আকাশের দিকে। বড় অন্ধকার মনে হচ্ছে নিজের চারিধার। আকাশে কি আজ চাঁদ নেই? কী তিথি আজ?

বল।

আমি তাড়া দিলুম স্বাতিকে।

স্বাতি হঠাৎ সত্যি কথাই বলে ফেলল: কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

বললুম: আমি তোমার প্রশ্নটা বলব?

স্বাতি চমকে উঠল, বলল: তুমি বলতে পারবে?

বললুম: চেষ্টা করতে পারি।

স্বাতি তার বড় বড় চোখজোড়া আমার চোখের ওপর তুলে ধরল।

বললুম: তুমি মিত্রার কথা জানতে চাইছ।

না না: স্বাতি আপত্তি জানাল: মিত্রাদির কথা কেন জানতে চাইব! তার জন্যে আমার মাথাব্যথা কিসের?

একটু আছে বৈকি: হেসে আমি জবাব দিলুম: মেলামেশাটা বেশি করছে কি না।

স্বাতি জবাব দিল না। অন্ধকারে তার মুখের ভাবও ভাল করে দেখতে পেলুম না।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি চাওলার গল্প বললুম স্বাতিকে। বললুম: লোকটা এখনও বোধহয় মিত্রাকে ভালবাসে।

তাই কি!

স্বাতি প্রশ্ন করল।

বললুম: এখনও মেয়েটাকে শ্রদ্ধা করে বলেই এই সন্দেহ হয়েছে। মানুষ একবার যাকে ভালবাসে, তাকে সে সহজভাবে দেখে না। দেখে রঙীন কাচের ভেতর দিয়ে। সেই কাচ কোনদিন ভেঙে গেলে মন তার বিষিয়ে যায়, তখন ঘৃণা করে। অত্যন্ত গভীর তীব্র ঘৃণা। মিত্রাকে ঘৃণা করবার মত কোন কারণ আজও ঘটেনি।

মিত্রাদির দিকটা ভেবে দেখেছ?

স্বাতি প্রশ্ন করল।

তার সুযোগ পাইনি।

আমি জবাব দিলুম।

স্বাতি বলল: আমি পেয়েছি। তুমি যদি কেরানী না হয়ে হতে শুধু জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র, তা হলেও তোমায় নিয়ে সে ওখলা যেতে পারত চুপিচুপি পিকনিক করতে।

আমি এ কথা মানতে পারলুম না, বললুম: ও মেয়ে তেমন নয়, তোমার হিসেবের ভুল হচ্ছে।

স্বাতি গম্ভীরভাবে বলল: তুমি যে এই উত্তর দেবে আমি জানতুম।

এ কথার জবাব দেবার মত যুক্তি আমার নেই। তাই হার স্বীকার করলুম: তুমি আমায় ভুল বুঝলে সত্যিই দুঃখ পাব।

স্বাতির দৃষ্টি কি সজল হল। আকাশভরা নক্ষত্র জ্বলছে মিটমিট করে, তাদের একটু আলো নেই কেন। প্রয়োজনের সময় কাজেই যদি ওরা না লাগল তো সারারাত অমন করে জেগে থাকে কেন!

খানিকক্ষণ পরে স্বাতি আবার কথা কইল, বলল: ও কথা থাক্, আর কী খবর পেলে বল।

বললুম: সে খবর তোমার ভাল লাগবে কি?

তা না লাগুক, সব খবর কি আর ভাল লাগে।

আমি রাণার কথা বললুম: তোমাকে তার ভাল লেগেছে। তার বাপের মত হলেই তোমার কাছে প্রস্তাব করবে।

হুঁ।

স্বাতি শুধু মাথা নাড়ল।

আশ্চর্য হয়ে বললুম : এ খবর তুমি জানতে নাকি ?

তেমনি গম্ভীরভাবে স্বাতি বলল : এসব অনুমান করা কি আর শক্ত কাজ!

কী বলবে তুমি ?

আমি জানতে চাইলুম।

এইবারে স্বাতি হাসল, বলল : সে কথাও কি তোমাকে বলতে হবে ?

তার হাসি দেখে আমিও হাসলুম, বললুম : ক্ষতি কি ?

আছে বৈকি ক্ষতি।

বলে স্বাতি উঠে দাঁড়াল।

আমি তার হাত ধরে আবার বসিয়ে দিলুম, বললুম : পালাচ্ছ কেন ?

কিছুমাত্র চিন্তা না করে স্বাতি জবাব দিল : তুমি ছেড়ে যাচ্ছ দেখে।

আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি ?

আমার বিস্ময়ের যেন আর অন্ত নেই।

স্বাতি বলল : আমি কেন, বাবা মাও আজ এই কথাই বলছিলেন।

আজ আমায় নিয়ে তোমাদের আলোচনা হয়েছে বুঝি ?

আমাদের বোলো না, হয়েছে বাবা মার। আমি আড়াল থেকে শুনেছি।

সেই আলোচনার কথা শোনবার জন্যে আমি স্বাতির আর একটু কাছে ঘনিয়ে বসলুম। স্বাতিও কাছে এল। আমি তার এই কাছে আসা দেখেই বুঝতে পারলুম যে তার কিছু বলবার ছিল। সেই কথা বলতে না পারলে সে শান্তি পাবে না। তবু আমার

একটা প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল নীরবে। বললুম: বল।

কী ভাবে শুরু করবে বোধহয় ভেবে পাচ্ছিল না। আমি তাকে সাহায্য করলুম, বললুম: মামা বলছিলেন যে গোপাল ছেলেটা মন্দ নয়, কিন্তু অকেজো। তাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি জেদী না হত।

স্বাতি যেন চমকে উঠল, বলল: তুমি শুনেছ বাবার কথা?

হেসে বললুম: কান দিয়ে শুনি নি, শুনেছি মন দিয়ে।

স্বাতি আমার মুখের ওপর তার অবিশ্বাসের দৃষ্টি ফেলল। বললুম: বলছিলেন, পোষ্যপুত্র হবার লোভ দেখিয়ে বোধহয় ভুলই করেছেন।

আত্মস্থভাবে স্বাতি বলল: মা খুবই ভয় পেয়েছেন। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে খেলা চলে না, কাজেই পোষ্যপুত্র হলে—

স্বাতি হঠাৎ থেমে গেল।

বললুম: কী হবে, বাঁচব না?

না না: স্বাতির কণ্ঠে যেন আর্তনাদ শুনলুম: ও কথা বোলো না।

কেন জানি না, আমার হাসি পেল। বললুম: আচ্ছা বলব না।

কিন্তু স্বাতিও আর কথা কইল না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বললুম: তারপর?

তারপর: স্বাতি আবার চমকে উঠল: তারপর তো আর কিছু নেই।

আমি জানতুম, এর পরে স্বাতি আর কিছু বলবে না, বলতে পারবে না। তাই জোর করলুম না।

আমি গরিবের ছেলে, কিন্তু আমার মর্যাদাবোধ কোন বড়লোকের চেয়েই কম নয়। মামার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যদি তাঁর ব্যবসা

দেখার ভার নিতুম, তা হলে আমাকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে মামার আপত্তি হত না। তাঁর একমাত্র কন্যাই তো সব পাবে। তার জন্যে ধনী জামাইয়ের প্রয়োজন হত না।

মামী অন্য কথা ভাবছেন। টাকাটাই তো সব নয়। মেয়েদের জীবনে যা সবচেয়ে বড়, তা তার সীঁথির সিঁদুর। ঐটুকু রক্ষা পেলেই তার সব রক্ষা হল। জ্ঞানশঙ্কর বাবুর পোষ্যপুত্র যে হবে, তার পরমায়ুর দায়িত্ব নেবেন না বিধাতাপুরুষ। মেয়ে তাঁর একটি। আর যাই করুন, সেই মেয়ের জীবন নিয়ে তিনি ছিনিমিনি কিছুতেই খেলবেন না।

স্বাতি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল : এবারে শুতে যাই।

এবারে আমি তার হাত ধরে বসাতে পারলুম না। কেমন একটা সঙ্কোচে হাত আমার আড়ষ্ট হয়ে রইল। যে কথা জানবার ইচ্ছা মনের ভেতর থেকে ঠেলে উঠছিল, সে কথাও জিজ্ঞেস করতে পারলুম না। সে কথা জিজ্ঞেস করা বুঝি যায় না। বড় অভদ্র শোনাবে, বড় নির্লজ্জ শোনাবে। তার চেয়ে সে আজ ঘুমতে যাক। আরও তো দু একদিন আছি এখানে, আর একসময় জিজ্ঞেস করা যাবে।

যাবার সময়েও স্বাতি একবার পেছন ফিরে দেখল।

ডাকব কি তাকে?

না না থাক্। আজ থাক্। আর একদিন ডাকব।

১৬

অনেক দূরে দূরে স্টেশন। অনেক দেরিতে দেরিতে থামে। গাড়িতে বসে বসে পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভাবি। খটখটাং করে একটা পুল পেরতেই আবার চমকে উঠি। যমুনার পুল নয় তো! যমুনা দেখে আর একবার ভয় পেয়েছিলুম ওখলায়। সেই কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

সকালবেলায় মামা বেরিয়ে যাবার পর মিত্রা এল। রাণার ছোট গাড়িখানা চালিয়ে একাই এল। স্বাতির দিকে চেয়ে আমি একটু হাসলুম। কিন্তু স্বাতি সে হাসির জবাব দিল না। মামী বললেন: এস মা, এস।

স্বাতিকে আজ বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তার শরীর ভাল নেই। তা না হলে আজ মিত্রাকে দেখে তারই সবচেয়ে বেশি আনন্দ হবার কথা। এদের সঙ্গে প্রথম যখন পরিচয় হয়েছিল, স্বাতি আমার কাছে এমনিই কিছু প্রত্যাশা করেছিল। সে অনুরোধের কথা আমি আজও ভুলিনি।

স্বাতির সমর্থন না পেয়েও আমি এগিয়ে গেলুম। বললুম: স্বাতি কাল বলছিল, আপনি আসবেন।

স্বাতির দৃষ্টি কঠিন হল, কিন্তু আশ্চর্য হল মিত্রা। বলল: সে রকম কথা তো আমি তাকে বলিনি।

স্বাতি প্রতিবাদ করল না, সমর্থনও না। বলল: গোপালদা ঐ রকম। মানুষকে লজ্জায় ফেলে আনন্দ পায়।

হেসে বললুম: আজ কোথায় নিয়ে যাবেন? ওখলায়?

বিস্ময়ে মিত্রা অভিভূত হল, বলল : স্বাতি এ কথাও বলেছে বুঝি ?

উত্তরে আমি শুধু হাসলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি নিঃশব্দে তাকে তার রাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলুম। কিন্তু মিত্রা অপেক্ষা করছিল উত্তরের জন্যে। তাকে বললুম না যে গাড়ির পেছনে আমি তার টিফিন বাস্কেট দেখতে পেয়েছি, আর ওখলা ছাড়া ভাল পিকনিকের জায়গা আমার জানা নেই।

আমি কিছুই বলছি না দেখে স্বাতি উত্তর দিল : সাংঘাতিক লোক। গোপালদাকে আপনি বিশ্বাস করবেন না মিত্রাদি।

লক্ষ্য করলুম যে শুধু মাত্র লজ্জা এড়াবার জন্যেই স্বাতি কথা কইল। কথাগুলো সহজ হলেও বলার ধরনটা সহজ নয়। আন্তরিকতার সুর নেই কণ্ঠস্বরে।

মিত্রা বলল : ওখলা জায়গাটা ভাল, পিকনিকের উপযুক্ত জায়গা।

বললুম : আমিও তাই শুনেছি।

বলে আড়চোখে একবার স্বাতিকে দেখবার চেষ্টা করলুম।

আপনার আজ কাজ নেই তো কোনো ?

মিত্রা জানতে চাইল।

বললুম : আমার আর কাজ কী ? দিল্লী তো আর ডালহৌসী স্কোয়ার নয়। এখানে আমি স্বাধীন মানুষ। উনিশ শো বাষট্টি সালে আবার ভারতের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন করব।

একটু মুচকি হেসে মিত্রা বলল : আপনি তো চাকরি করেন।

গর্বের সুরে বললুম : ভারত সরকারের নয়। বরং এদের সরকার নির্বাচনের অধিকার আমার আছে।

এ কথার উত্তর না দিয়ে মিত্রা বলল : তা হলে চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি।

বেড়াতে যাব ?

বলে আর একবার চাইলুম স্বাতির দিকে।

মামী বললেন : যাও না, বেলা তো বেশি হয়নি।

স্বাতি পাশের ঘরে সরে গিয়েছিল, তার অনুমতিটা পাওয়া গেল না। মনে হল, ইচ্ছে করেই মিত্রা তাকে ডাকল না, আর স্বাতিও ইচ্ছা করে সরে গেল। মেয়েটা সত্যিই বড় ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ না হলে এমন অভিমান হবে কেন!

আমাদের খুব দেরি হবে না তো ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম।

দেরি ?: মিত্রা জবাব দিল : দেরি আর কী হবে! সন্ধ্যের আগেই আমরা ফিরে আসব।

সেকি, দুপুরে খাবে না তোমরা ?

মামী ব্যস্ত হলেন।

মিত্রা খুব সহজ ভাবেই জবাব দিল, বলল : দুপুরের খাবার আমার সঙ্গে আছে। চা-ও আছে।

মামী যে আশ্চর্য হয়েছিলেন, তা তাঁর মুখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারছিলুম। কথা নেই বার্তা নেই, একেবারে তৈরি হয়ে আসবে—এ তাঁর ধারণার অতীত। আমি রাজী না হলে কী হত, সেই কথা ভাবতে ভাবতেই মিত্রার গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। বসলুম তার পাশেই, সেই আমাকে আগে উঠিয়ে দিল।

গাড়ি যখন ছেড়ে গেল, পেছনে চেয়ে দেখলুম—স্বাতি আমাদের লক্ষ্য করছে। এক রকম অদ্ভুত আনন্দে মন আমার ভরে গেল।

পথ চলতে চলতে আমি আমার আনন্দের কারণ অনুসন্ধান করলুম। স্বাতিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে কেন আমার মন আনন্দে ভরে গেল। এ আনন্দ কি অমানুষিক নয় ?

আশ্চর্য হলুম মিত্রার প্রশ্ন শুনে : মনে হচ্ছে, বেশ একটু কৌতুক বোধ করছেন!

কৌতুক।

হঠাৎ আমি কোন জবাব দিতে পারলুম না। মনে মনে ভাবতে লাগলুম, কী জবাব দেওয়া যায়।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মিত্রা বলল: ঠিক ধরেছি তো!

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারলুম না। আমি মিথ্যে কথা বলব না।

মিত্রা বলল: কৌতুকেরই কথা যে।

কিন্তু কেন, সে কথা বলল না।

ঠিক তা নয়: আমি উত্তর দিলুম: আমার ভাল লাগছে।

গম্ভীর ভাবে মিত্রা বলল: এ আপনার ভদ্রতার কথা, মনের কথা নয়।

প্রতিবাদ করে আমি বললুম: ভদ্রতা আমি জানিনে, মিথ্যে কথাও বলতে চাইনে।

মিত্রা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল: আমার আচরণ যে খানিকটা কৌতুকপ্রদ হয়েছে, সে আমি নিজেই বুঝতে পাচ্ছি।

মিত্রার কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম, বললুম: না না, আমি আপনার কথা মোটেই ভাবিনি। আমি ভাবছিলুম—

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারলুম না। কেন জানি না মনে হল, সে কথা শুনলে মিত্রা খুশী হবে না।

ওঃ!

মিত্রা এর বেশি কিছু বলল না। শুধু গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল আরও খানিকটা।

এবারে আমি মিত্রার কথা ভাবলুম। স্বাতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে সে দেখেনি, আমি দেখেছি। আমার ভাবনা যে তাকে ঘিরে, মিত্রা সে কথা জানে না। সে নিজের কথাই ভাবছে, ভাবছে নিজের আচরণের কথা। হঠাৎ আমার মনে পড়ল আর একদিনের কথা। প্রথম দিন দিল্লী দেখতে বেরিয়ে মিত্রা বলেছিল, দাদার জন্যেই আজ

এলুম, কিছুতেই ছাড়ল না। নইলে দিল্লী আমরা একশো আট বার দেখেছি। আজ দাদা নেই। রাণার অফিস আছে, তবু মিত্রা এসেছে। একাই এসেছে। এসেছে রাণার ছোট গাড়িখানা নিজে চালিয়ে। তার এই পরিবর্তনে আমি কৌতুক অনুভব করব, মিত্রা এইটেই আশঙ্কা করেছে। কিন্তু আমি তার কথা ভাবছি না জেনে তার আরাম পাবার কথা ছিল, সে আরাম পেয়েছে কি?

মিত্রা চুপ করে ছিল। আমার ভাবনা হল বাঁধনহারা। মিত্রা দুঃখ পেয়েছে, এ কথা ভাবতে আমার ভাল লাগল। মনে হল, সত্যি কথাটা না বললেই বোধহয় সে খুশী হত। সে আমার কাছে এসেছে আমাকে নিয়ে যেতে, সারাটা দিন আমার সঙ্গে কাটাবে বলে। আমি অন্যের কথা ভাবছি বলে তার আন্তরিকতাকে অশ্রদ্ধা করেছি। তাতে আমার পৌরুষ প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েছে মূর্খতা। অভাব দেখিয়েছি সৌজন্যের। এতক্ষণ পরে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ হল। কিছু একটা বলার প্রয়োজন মনে করে তার সুযোগ খুঁজতে লাগলুম।

গাড়ি তখন দিল্লী-মথুরা রোডে এসে পড়েছে। মিত্রা গতি আরও বাড়িয়ে দিল্।

এই উপলক্ষ্য নিয়েই প্রশ্ন করলুম: বেশ জোরে চলেছি। ওখলা বুঝি অনেক দূর।

দূর?: মিত্রা উত্তর দিল: তা দূর বৈকি।

কিন্তু কত দূর তা বলল না। আমিও চুপ করে রইলুম। এক সময় আমার অপেক্ষার ভঙ্গী লক্ষ্য করে বলল: নিজাম-উদ্-দীন স্টেশন পেরিয়ে ওখলা রেল স্টেশন। বাঁয়ে মোড় নিয়ে ওখলার খাল আর সরকারী সেচ দপ্তর।

মিত্রা যে আর কিছু বলবে না, তা আমি জানি। তাই তাকে কথা বলাতে হলে আর কিছু প্রশ্ন করার প্রয়োজন। অনেক ভেবে বললুম: 'দৃষ্টিপাতে' ওখলার উল্লেখ পেয়েছি।

হু।

মিত্রা আর কিছু বলল না।

কিন্তু আমি কী বলি! পাশাপাশি বসে যাব, অথচ কথা কইব না একটাও! বড় অস্বস্তি বোধ হল। বললুম: আপনি বড় স্বল্পভাষী, এতটা না হলেও ক্ষতি ছিল না।

মিত্রা হাসল আমার কথার উত্তরে। আমি হাসলুম না, বললুম: মিতভাষী হওয়া ভাল, যেমন মিতব্যয়ী। কথায় কৃপণ হতে নেই।

আমি কি কৃপণ?

মিত্রা প্রশ্ন করল।

মনের কথা মনে চেপে রাখলেই কৃপণ বলব।

আমি উত্তর দিলুম।

এবারে উত্তর দিতে মিত্রা বিলম্ব করল না, বলল: আমি বুঝি তাই করছি?

করছেন না?: আমি জবাব দিলুম: কত কথাই তো আপনার বলবার আছে, বলবার ইচ্ছাও আছে। অথচ কিছুই বলছেন না।

সে কি!

মিত্রা বুঝি চমকে উঠল।

হেসে বললুম: হিসেবে আমার ভুল হয়, কিন্তু আজকের হিসেব যে নির্ভুল, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আপনি কি অন্তর্যামী?

মিত্রা জানতে চাইল।

অন্তর্যামী না হলে কি মানুষের মন জানা যায় না?: আমি উত্তর দিলুম: মন জানাজানির খেলায় মানুষ কিসে ছোট?

মিত্রার দৃষ্টি ছিল পথের ওপর নিবদ্ধ। চকিতে আমার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখল, উত্তর দিল না।

আমি ভুল বলছি?

আমি প্রশ্ন করলুম।

মিত্রা এ কথার জবাব এড়িয়ে গেল, বলল: আমরা অত ভাবিনে।

উত্তর শুনে আমি হাসলুম।

হাসলেন যে?

মিত্রা জানতে চাইল।

বললুম: যারা কথা কম বলে, তারা ভাবে বেশি। এই সত্যটুকু যদি মানতে হয়, তা হলে বলব, আপনি আমার চেয়ে বেশি ভেবেছেন।

মিত্রা চুপ করে রইল।

আমি বললুম: বেশি ভেবেছেন বলেই আজ এসেছেন। আর কিছু বলবেন বলেই এতদূরে আমায় টেনে আনলেন।

মিত্রা হঠাৎ তার গাড়ির গতি কমিয়ে ফেলল। সে কি থেমে পড়বে? আমি কি অপমান করলুম তাকে, না আঘাত দিলুম!

একটা মোড়ের কাছে পৌঁছেছিলুম। খচ করে একটা শব্দ তুলে বাঁ দিকের হলদে আলোর হাতটা বেরল। মিত্রা বাঁয়ে ঘুরল। সামনে ওখলা।

আপনার কি আসবার ইচ্ছে ছিল না?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

সামনে ওখলা দেখে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলুম। বললুম: আমার অন্য প্রশ্ন। আপনার বলবার যে কথা আছে, সেই সত্যটুকু আপনি সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

এবারে মিত্রা লুকোল না। বলল: কথায় মন দিলে গাড়ি যমুনায় নামবে।

যমুনার কথায় আমি ভয় পেলুম। চোখের সামনে ভেসে উঠল যমুনার শীর্ণ ধারা, বিস্তীর্ণ বালির ভেতর দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। প্রকৃতির সাদা বুকের ওপর এক ফালি নীল কাপড়। বেগ নেই, গর্জন নেই। তবু ভয় পেলুম, যমুনা যে যমের ভগিনী।

আর কটা দিন পরে ঐ ধারা বইবে আমার জীবনের ওপর দিয়ে।

গাড়ি থামিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল মিত্রা। নিজে নেমে ঘুরে এসে আমার দরজা খুলে দিল, বলল: যমুনার নামে ভয় পেলেন না কি?

ভয় আমি সত্যিই পেয়েছিলুম, কিন্তু তার কথার উত্তর দিলুম না।

নেমে আসতেই মিত্রা বলল: কেমন জায়গাটি বলুন তো?

ভাল করে চারিধারটা চেয়ে দেখলুম। এমন খোলা জায়গাও আছে দিল্লীতে! এমন ছায়াঘন শ্যামল পরিবেশ! ওদিকে যমুনার ধারা, এদিকে আগ্রার খাল। বাঁধের ওপর দিয়ে যমুনার জল গড়িয়ে আসছে। সেখানে গামছা দিয়ে মাছ ছেঁকে তুলছে কয়েকটা দুরন্ত ছেলে। এদিকের বাগানের ভেতর চক্রাকারে বসেছে জনকয়েক মেয়ে পুরুষ। ভারি ভাল লাগল জায়গাটি। উত্তর দিতে আমি ভুলে গেলুম।

মিত্রা বলল: কী ভাবছেন বলুন তো!

এই খাল দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন?: নিজেকে আমি সামলে নিলুম, বললুম: মনে হচ্ছে হলধর বলরামের কথা। তিনি নাকি তাঁর লাঙ্গল দিয়ে যমুনার জলকে নগরের দিকে তরঙ্গিত করেছিলেন। ওদেশের পণ্ডিতরা বলেন, কৃষির জন্যে এই প্রথম খাল কাটা।

মিত্রা আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল, বললুম: আমাদের ইতিহাস যমুনার প্রথম খালকাটার গৌরব দেন ফিরোজশাহ তুঘলুককে। হিসারে জলের জন্যে সেই খাল কাটা হয়। আকবর সেই বোঁজা খালের সংস্কার করেছেন বলে শুনেছি। শাহজাহানের ইঞ্জিনিয়ার আলি মর্দন খান দিল্লী ও রোহতকের খাল কাটেন।

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেয়ে আমি মিত্রার দিকে তাকালুম।

মিত্রা বলল : আশ্চর্য লোক আপনি! এমন সুন্দর একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার ইতিহাস মনে পড়ছে!

আমি লজ্জা পেলুম। তবু হেসে বললুম : চরিত্রদোষ!

এবারে মিত্রাও হাসল।

আমরা একটি গাছের ছায়া বেছে নিয়ে মাটিতে বসলুম। চারিদিক ঝকঝক করছে সকালের পরিচ্ছন্ন রোদে। আরও কিছু বেলা হলে হয়তো তীব্র হবে। নাও হতে পারে। এই স্নিগ্ধ পরিবেশটি যদি মনের ওপরেও তার মায়া বিস্তার করে, তা হলে বাইরের রোদে এই গাছের ছায়াটি কখনও উত্তপ্ত হবে না। মনের চেয়ে বড় আর কিছু কি আছে?

মিত্রা বলল : স্বাতিকে কেন ফেলে এলুম এ কথা এখনও জিজ্ঞেস করেননি।

বললুম : অসৌজন্য হবে, তাই করিনি।

মিত্রা বলল : কিন্তু আমি তাকে না এনে কি অসৌজন্য প্রকাশ করিনি?

কেন?

আমি প্রশ্ন করলুম।

এতদিন তো আমরা একসঙ্গেই বেড়াচ্ছি : মিত্রা জবাব দিল : আর তার আসারও কোন বাধা ছিল না।

আমি কথা কইলুম না দেখে মিত্রাই আবার বলল : ইচ্ছে করেই আমি তাকে ডাকিনি।

এ কথা যে আমারও জানা, তা বলতে পারলুম না।

মিত্রা খানিকক্ষণ আমার প্রশ্নের অপেক্ষা করল। তারপর বলল : কেন এমন করলুম, জানতে চান না?

জিজ্ঞেস করবার সাহস নেই : আমি উত্তর দিলুম : অধিকারও নেই।

এ আপনার ভদ্রতা : মিত্রা বলল : কিন্তু আমি তো আপনার

সঙ্গে ভদ্রতা করিনি। আপনার অনুমতি না নিয়েই আপনাকে টেনে এনেছি।

সম্মতি না থাকলে এলুম কী করে?

আমি উত্তর দিলুম।

মিত্রা বলল: আপনার কৌতূহল নেই বলুন।

নেই নয়, কৌতূহল চেপে রাখবারই শিক্ষা পেয়েছি।

যাক তর্ক। আমি নিজেই আপনাকে কারণ বলি।

বলে মিত্রা থেমে গেল। সে কী বলবে আমি জানি না, কিন্তু মনে হল, সত্য কথাটা সে বলতে পারছে না। হয়তো ঠিক এমন করে বলা যায় না, বলবার সময় এখনও হয়নি। তবু আমি তার মুখের দিকে চেয়ে চোখের দৃষ্টি দিয়ে মনের আগ্রহ বিস্তার করে দিলুম।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে বলল: আপনার পোশাকী রূপটা দেখেছি। ইচ্ছে হল, আপনাকে একান্তে একবার দেখি।

আপনিই বলুন: মিত্রা জানতে চাইল: স্বাতিকে সঙ্গে আনলে কি সে সুযোগ আমার হত!

মানি তা হত না। কিন্তু তার প্রয়োজন কী? প্রশ্নটা মনে এলেও মুখে এল না। আমি উত্তর দিলুম না।

মিত্রা বলল: মানুষের দুটো রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট। একটা তার সমাজের কাছে, অভিনেতার মত সেটা তার বাইরের রূপ। আর একটা তার নিজস্ব, সেটা ভেজালহীন খাঁটি পরিচয়।

একটু থেমে মিত্রা বলল: আমার বিশ্বাস, মানুষের একটা তৃতীয় রূপ আছে। সেটা তার একান্তে কোন একজনের সামনে, যাকে সে—

একটা ঢোঁক গিলে বলল: ভালবাসে।

মিত্রা তার বিশ্বাসের কথা আমায় বুঝিয়ে বলল: মানুষ যখন প্রথম ভালবাসে, তখন তার তৃতীয় রূপ কতকটা অভিনেতারই মত একটা কৃত্রিম রূপ। ভালবাসা যত গভীর হয়, ততই সে রূপ বদলায়।

শেষে তার সত্য রূপের সঙ্গে আর কোন তফাৎ থাকে না। মানুষকে চিনতে হলে তাই একান্তে দেখতে হয়।

হেসে বললুম : তার জন্যে যে অন্য চোখ চাই।

দূরের মেয়ে পুরুষরা হঠাৎ এক সময়ে হেসে উঠলেন।

মিত্রা বুঝি লজ্জা পেল।

বললুম : আপনি লজ্জা পেলেন! কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলেছি। তার জন্যে চাই অন্য চোখ, অন্য মন।

সে আমাদের আছে কি?

চোখ জোড়া নামিয়ে রেখেই মিত্রা প্রশ্ন জানাল।

ভয়ে আমি চমকে উঠলুম। মনে হল, সামনের ঐ যমুনার ধারা বুঝি এদিকেই এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতেই গ্রাস করে ফেলবে আমাকে। যমুনার হিমশীতল নীল জল।

আমার উত্তরের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মিত্রা বলল : ভয় পেলেন?

ভয় : আমি হাসলুম : ভয় পাব কেন!

আমি জানি, হাসিতে আমার প্রাণ ছিল না।

তবে?

মিত্রা আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : আমি অন্য কথা ভাবছি।

অন্য কথা!

হ্যাঁ : আমি উত্তর দিলুম : আমি আমার নিজের জীবনের কথাই ভাবছি। নিজের আদর্শের কথা। আমি কি সেই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হতে যাচ্ছি না? স্বাতি আমাকে সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

আদর্শভ্রষ্ট কেন হবেন?

মিত্রা জানতে চাইল।

কেন হব?

আমি ভাবতে লাগলুম, আমার আদর্শের কথা মিত্রাকে বলা যায়

কি না। কিন্তু সেই আদর্শের কথা আমার কাছেই কি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনিশ্চয় আশঙ্কায় এখনও যে আমার পা মাটিতে পড়েনি, আমি যে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছি।

আমার উত্তর না পেয়ে মিত্রা বলল: বুঝেছি, এখনও আপনি সংস্কারমুক্ত হতে পারেননি।

ঠিক তাই কি।

আমি ভাবতে লাগলুম।

মিত্রা বলল: নানা রকমের সংস্কার আমাদের অক্টোপাসের মত জড়িয়ে আছে। কুসংস্কার বলব না, ভাল সংস্কারও অনেক আছে। তা থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছিনে। সমাজ আমাদের প্রতিকূল, বিশ্বাসের হাওয়াও বইছে প্রতিকূলে। দেখেও আমরা দেখছি না, শিখেও আমরা শিখছি না। সত্যিই আমরা স্থিতিশীল।

এ আমি কী শুনছি? নিজের কানকে আমার বিশ্বাস হল না। একটা মেয়ে আমাকে স্থিতিশীল বলে কৃপা করবে?

বললুম: সমাজের এ অবস্থায় স্থিতিশীলতাই ভাল। প্রগতির পথ তো আমরা খুঁজে পাইনি। ভুল পথে এগিয়ে সমাজটাকে আরও নষ্ট করে কী লাভ?

প্রগতির পথ কি আমরা খুঁজে পাইনি?

মিত্রা জানতে চাইল।

বললুম: সমাজব্যবস্থাকে রাতারাতি উল্টে দেওয়াকেই প্রগতি বলে না। সত্যিকার সংস্কার হয় কিছু বর্জন ও কিছু গ্রহণের দ্বারা। কতটুকু বর্জন করতে হবে আর কতটুকু গ্রহণ, আমরা সেইটে এখনও বুঝতে পারিনি।

মিত্রা এ কথার উত্তর দিল না।

সারাদিন ওখলায় কাটিয়ে আমরা যখন উঠতে যাচ্ছি, মিত্রা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল: চাওলার কথা কিছু জানতে চাইলেন না?

তার কি প্রয়োজন আছে ?

আমি জবাব দিলুম।

প্রয়োজন ? : মিত্রা বলল : প্রয়োজন আপনার না থাকতে পারে, আমার আছে। আপনি জানতে না চাইলেও আমি বলব।

বলে চাওলার গল্প আমাকে বলল : ওকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিয়ে করব না। সে কথা আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি।

কেন জানি না, এই মুহূর্তে মিত্রাকে আমার শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হল। এমন স্পষ্টবাদী মেয়ে আমি বোধহয় আজও দেখিনি। গোড়া থেকেই এ কথা আমি অনুভব করছিলুম। এইবারে আমার সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে তা বিশ্বাস করলুম। অন্য মেয়ে হলে নিজের মনকে এমন অকপটে মেলে ধরত না। লজ্জা পেত, হয়তো ভয়ও পেত। কোন স্বল্পপরিচিত পুরুষ তাকে নির্লজ্জ ভাববে, এ তো ভয়েরই কথা। মিত্রা ভয়কে জয় করেছে, সংস্কারকে উপেক্ষা করছে। তাকে আমার ভাল লাগল। বললুম : ভালই যখন বাসেন, তখন বিয়ে করতে আপত্তি কী ?

চলতে চলতে মিত্রা বলল : তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। সে ভাবে ঘুঁটেকুড়নীর দুঃখই দুঃখ, রাজকন্যের দুঃখ দুঃখ নয়। তার মন সমাজসচেতন। কিন্তু একটা মতবাদকে ঝেড়ে ফেলতে গিয়ে আর একটা মতবাদের ভারে বেঁকে গেছে। লোকটা এখন আর সুস্থ নয়।

চাওলার পরিচয় আমি খানিকটা পেয়েছি। মিত্রা হয়তো সত্যি কথাই বলছে। তাই প্রতিবাদ করলুম না। ইচ্ছে হল, আমার সম্বন্ধে তার ধারণার কথা জানতে চাই। কিন্তু সাহস হল না।

গাছের ছায়া তখন সন্ধ্যার ছায়ায় মিলে গেছে। আমরা গাড়িতে গিয়ে বসলুম।

গাড়ি থেকে মিত্রা নামল না। আমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে গেল।

বাড়ির চেহারা দেখে আমি আশ্চর্য হলুম। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে ঘন হয়ে, কিন্তু বাতি একটিও জ্বলছে না। শুধু ঘরের ভেতর থেকে সেতারের সুর শুনতে পেলুম। স্বাতি সেতার বাজাচ্ছে।

কিন্তু মামা-মামী গেলেন কোথায়? এ সময় মামা বাইরে বসে থাকেন, আর বাতি জ্বেলে মামী বসেন আহ্নিকে। তাঁরা কি আজ বাড়ি নেই?

ঘরের ভেতর পা বাড়াতে আমার মন সরল না। পা ঝুলিয়ে সিঁড়ির ওপর বসলুম। স্বাতির সেতার শুনতে পাচ্ছি।

ভারি মিষ্টি হাত স্বাতির, কিন্তু বড় করুণ সুর। মনে হল, কিছুই যেন তার পাওয়া হয়নি। যার জন্যে অপেক্ষা করে আছে অনেক দিন অনেক রাত্রি, সে বধির, সে তার ডাক শুনতে পায় না। দেবাদিদেবের মত সে ধ্যানে বসে আছে, সামান্য তপস্যায় কি তার ধ্যানভঙ্গ হবে? কিন্তু প্রকৃতি এই সুর শুনছে উৎকর্ণ হয়ে। স্তব্ধ হয়ে আছে চঞ্চল হরিণ, শস্য খসে পড়ছে মুখ থেকে। মুগ্ধ সম্মোহিত হয়ে গেছে। আমিও কি আজ হরিণের মত গান শুনছি?

আমি যে অন্ধকারে লুকিয়ে তার বাজনা শুনেছি, স্বাতি টের পায়নি। কোনদিন টের পেত না। পরে আমিই তাকে বলেছিলুম, জিজ্ঞেস করেছিলুম কী রাগিণী। স্বাতি উত্তরে বলেছিল তোড়ি। এক সময় বনের হরিণের মুখ থেকে মাঠের শস্য রক্ষার জন্য চাষী মেয়েরা এই রাগিণী গাইত।

এমনি অভিভূতের মত কতক্ষণ বসে ছিলুম মনে নেই। চেতনা ফিরে পেয়েছিলুম মোটরের শব্দে। বড় একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল সামনের রাস্তায়। নিজে সামলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

গাড়ি থেকে প্রথমে নামল রাণা। পেছনের দরজা খুলে ধরতেই মামা-মামী নেমে পড়লেন। দরজা বন্ধ করে রাণাও এল তাঁদের সঙ্গে।

অন্ধকারে আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মামাই চমকালেন সব চেয়ে বেশি। বললেন: গোপাল, তুমি এখানে?

স্বাতি তখনও সেতার বাজাচ্ছে। বললুম: বাজনা শুনছি।

তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

তবু মামা তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

বললুম: ভেতরে গেলে স্বাতি আর বাজাত না।

কিন্তু ভেতরে যাবার দরকার হল না। তার আগেই স্বাতি থামল। দুঃখিত স্বরে রাণা বলল: আমাদের কোলাহল নিশ্চয়ই কানে গেছে।

আমি জানি, আমাদের কোলাহল তার কানে যায়নি। সে থেমেছে তার রাগিণী সম্পূর্ণ হয়েছে বলে।

এস এস, ভেতরে এস।

বলে মামা এগিয়ে গেলেন। আমরা গেলুম তাঁর পেছনে।

ঘরে গিয়ে স্বাতিকে দেখতে পেলুম না। সেতার রেখে দিয়ে সে পাশের ঘরে গেছে। রাণাও ক্ষুব্ধ হল। তবু বলল চমৎকার শুনলুম।

কাপড় বদলাতে মামীও পাশের ঘরে গেলেন। আমি বসলুম মামার পাশে।

তুমি কতক্ষণ ফিরেছ?

মামা জানতে চাইলেন।

বললুম: আপনাদের কিছু আগে।

পাছে আরও কিছু জানতে চান, তাই নিজেই প্রশ্ন করতে শুরু করলুম: আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন?

বলে রাণার দিকে তাকালুম।

রাণা বলল: বিরলা মন্দির।

সেই সঙ্গে যোগ করল: কিন্তু স্বাতি আজ একটা মজার কথা

বলেছে। মন্দির হয় বৈদ্যনাথের বিশ্বনাথের। বিরলার আবার মন্দির কী। আজকের দিনে আমরা কুবেরের পুজো করব?

বলে পরম আনন্দে হাসতে লাগল।

বললুম: ঠিকই তো বলেছে।

ঠিক কিসে?

রাণা সোজা হয়ে বসল।

ঠিক নয়?: আমি উত্তর দিলুম: দেবতার চেয়ে কি কুবের বড়?

রাণা এবারে সশব্দে হেসে উঠল, বলল: আপনার বুদ্ধিও দেখছি স্বাতির মত। আরে, বিরলা কি মন্দিরের ঠাকুর? মন্দির তৈরি হয়েছে বিরলার পয়সায়, তাই তার নাম বিরলা মন্দির।

মন্দিরের দেবতা কী?

কথা শেষ করবার আগেই আমি প্রশ্ন করলুম।

রাণা হঠাৎ হকচকিয়ে গেল। চট করে উত্তর দিতে পারল না।

কেদারনাথ, না বদরিনারায়ণ?

হাসতে হাসতে আমি প্রশ্ন করলুম।

হঠাৎ বুঝি রাণার মনে পড়ে গেল, বলল: লক্ষ্মীনারায়ণ।

বললুম: দেখলেন তো। সেখানে লক্ষ্মীনারায়ণের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে শেঠ রাজা বলদেবদাস বিরলা।

কাপড় বদলে মামী ফিরে এসেছিলেন। বললেন: গোপাল ঠিকই বলেছে। অমন সুন্দর মন্দির, কিন্তু মনে হল যেন জাদুঘর দেখছি। ঘর ভর্তি ছবি, দেয়াল ভর্তি লেখা, মস্ত বাগান, বিরাট ধর্মশালা—কিন্তু মনে ভক্তি এল না। দেবতার মূর্তি যেন পুতুলের মতন। এরই সঙ্গে কালীমন্দিরের তুলনা কর। সে যেন আলাদা জগৎ। আপনা থেকে মন নুয়ে পড়ে। উঠে আসতে ইচ্ছে করে না।

মনে পড়ল, কোথাও আমিও এ কথা পড়েছি। মামী আজ অন্তর দিয়ে যা উপলব্ধি করে এলেন, কে যেন তা লিখে রেখে গেছেন। রাণাও এ কথার প্রতিবাদ করল না।

মামীকে আজ বড় প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। বললেন: দক্ষিণ ভারতের কথা তোমার মনে আছে গোপাল? সেখানকার মন্দিরের কথা?

এই তো সেদিন দেখে এলুম।

আমি জবাব দিলুম।

সেদিনই বটে: মামী বললেন: এখনও চোখের সামনে সব ভাসছে। রাতে প্রণাম করবার সময় বাবা রামেশ্বরকে যেন আমি দেখতে পাই। কী গম্ভীর সৌম্য মূর্তি!

তবু তো আমরা কাছে যেতে পারিনি। দূর থেকেই প্রণাম করেছিলুম।

মামী বললেন: সে দুঃখ আমার যাবে না।

মামা তাঁর পকেট থেকে তামাকের পাউচ আর পাইপ বার করছিলেন। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই মামী ব্যস্ত হলেন। বললেন: দেখলে রাম খেলাওনের আক্কেল, এখনও কফি আনল না। এসেই আমি বলে এলাম।

বাধা দিয়ে রাণা বলল: তার তাড়া কিসের?

তাড়া নেই!: মামী বললেন: এত পরিশ্রম করে এলে, একটু তাড়াতাড়ি দেওয়া উচিত নয়?

মামীকে আজ বড় প্রগল্ভ মনে হচ্ছে। তাঁকে এত কথা বলতে আমি শুনিনি। দিল্লীর কালীমন্দির কি তাঁর এতই ভাল লেগেছে?

এই যে, বলতে বলতেই হাজির করেছে।

বলেই রাণা আবার সোজা হয়ে বসল।

মামী তাঁর নিজের সামনের তিপায়টা কাছে টেনে নিলেন। রাম খেলাওন তারই ওপরে কফির সরঞ্জাম রাখল।

অন্যদিন এ কাজ স্বাতির ওপর। আজ মামী এ ভার নিজের হাতে নিলেন। তবু তাঁর মেয়ের কথা মনে পড়ল। বললেন: মেয়েটা আজ গেল কোথায়?

ঘরের চারিদিকে রাণা দৃষ্টিক্ষেপ করল।

কেন জানি না, একটা দুরন্ত ভাবনায় মন আমার অশান্ত হল।

ততক্ষণে মামা তাঁর পাইপে আগুন ধরিয়েছেন। তাঁর আচরণে কোনও চঞ্চলতা দেখলুম না। কতকটা ইচ্ছে করেই যেন কথা বলছেন না।

কফি ঢালতে ঢালতে মামী বললেন : বোধহয় লজ্জা পেয়েছে।

তার পর নিজেই সে কথা সমর্থন করলেন : তা তো পাবেই। লজ্জা না থাকলে সে আবার কেমন মেয়ে ?

সবাইকে এক এক পেয়ালা কফি এগিয়ে দিলেন। আমার দিকে বাড়িয়ে দেবার সময় বললেন : গোপাল বুঝি জানো না ?

একটা অন্ধকার আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা আমার গুমরে গুমরে উঠছিল। আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলুম : কী মামীমা ?

স্বাতির যে বিয়ে ঠিক হয়ে গেল : বলে রাণার দিকে তাকালেন, বললেন : রাণার সঙ্গে বিয়ে।

এ সংবাদ তো আমি চাওলার কাছেই পেয়েছিলুম। কিন্তু এ যে এত শীঘ্র স্থির হয়ে যাবে, তা ভাবিনি। মুমূর্ষুর মৃত্যুতেও একটা ধাক্কা লাগে, সেই রকমের একটা ধাক্কা লাগল মনে। তবু উত্তর দিতে হল, উত্তর না দিলে যে ভাল দেখায় না। বললুম : চমৎকার।

কিন্তু চমৎকারের শেষে একটা দীর্ঘশ্বাসের ভগ্নাংশ ছিল। একটুখানি শুকনো হাসি দিয়ে সেই ত্রুটিটুকু ঢাকবার চেষ্টা করলুম।

আনন্দ ও গর্বে মেশানো একটা উদ্ধত ভঙ্গীতে রাণা তখন তার কফিতে চুমুক দিচ্ছিল। কোন কথা কইল না।

কেন জানি না, আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। দক্ষিণ ভারত যাত্রার প্রাক্কালে রাম খেলাওন নিরুদ্দেশ হয়েছে হাওড়া স্টেশনে। মামা আমাকেই তার বদলি পাকড়ালেন। কামরার বিপর্যস্ত মালপত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে সুস্থ হয়ে বসতেই মামী বললেন, তোমার বোন স্বাতিকে বুঝি তুমি আগে দেখনি গোপাল ? তাঁর বলার ভঙ্গীতে আগে দেখার প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠেনি, স্বাতির

পরিচয়টাই বড় ছিল। স্বাতি আমার বোন। পাতানো হলেও বোন। সারাটা পথ আমাকে এই সম্বন্ধকে শ্রদ্ধা করতে হবে, সেই নির্দেশের ইঙ্গিত আমি শুনেছি। আজও মনে হল, স্বাতির বিয়ের সংবাদ দিয়ে আমাকে বুঝি সজাগ করে দিলেন।

কিন্তু এ সবের কী দরকার আছে? আমার মনে হল, এ মামীর আনন্দ নয়, এ তাঁর দুর্ভাবনার কথা, তাঁর আশঙ্কার কথা। প্রগল্‌ভতা দিয়ে তিনি তাঁর ভয়কে জয় করার চেষ্টা করছেন। আমি তাঁকে বাচাল হতে দেখিনি।

মামার আজ অন্য রূপ দেখছি। বড় স্থির, বড় গম্ভীর। আমাদের কথায় তাঁর কান আছে কিনা জানি না, মন যে নেই তা বুঝতে পারি। কী একটা অতৃপ্তি তাঁকে খোঁচা দিচ্ছে, তামাকের ধোঁয়া দিয়ে তা ঢাকতে পারছেন না।

দিল্লীতেই বিয়েটা হোক, কী বল!

মামী প্রশ্ন করলেন।

উত্তর আমাকে দিতে হল না, দিল রাণা। আমার দিকে চেয়ে বলল: আপনারও তাতে বোধহয় সুবিধে হবে। এলাহাবাদ থেকে দিল্লীই বোধহয় কাছে।

বোশেখেই হোক, কী বল?

মামী রাণাকেই জিজ্ঞেস করলেন।

রাণার উত্তর ছিল তৈরি। কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে বলল: সেই ভাল। দেরীতে গরমও বাড়বে।

আমি মামাকে লক্ষ্য করছিলুম। তিনি যেন ঘুমিয়ে আছেন। চোখ খোলা আছে, কিন্তু পলক পড়ছে না। তাঁর অন্য ভাবনা, অন্য চেতনা। তিনি যেন ভিন্ন জগতের মানুষ।

এক সময় রাণা ফিরে গেল। মামী উঠে গেলেন। বসে রইলুম আমরা দুজনে।

স্বাতি এখন কী করছে?

রোজকার মত বাইরেই শুয়েছিলুম রাতে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুম এল না। জেগে জেগে আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলুম।

স্বাতি আজ খাবার টেবিলে বসেনি। মাথা ধরেছে বলে আগেই শুয়ে পড়েছিল। আমি কি তার মাথা ধরার কারণ জানি?

মনে হল জানি। আমার সামনে সে বেরতে চায়নি। একজন আদর্শভ্রষ্ট পুরুষের সামনে তার বেরবার প্রয়োজন বুঝি ফুরিয়ে গেছে। একদিন যাকে সে ভালবেসেছিল, সে লোক আজ মরে গেছে। সাবিত্রীর মত সেই মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের সাধনা নিতে তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু অনেক দুঃখে আজ জেনেছে যে সেই দেহে আর রক্তমাংস নেই, একটা শুকনো কঙ্কাল শুধু পড়ে আছে। তাতে প্রাণসঞ্চার হলে সে নিজেই সারাক্ষণ ভয় পাবে। বুঝতে পারলুম যে বৈষয়িক জগতে লাভ করতে গিয়ে স্বাতিকে আমি হারিয়েছি। বিয়ে করে রাণা তার দেহটাই শুধু পেত, মন পেত না। স্বাতি স্বেচ্ছায় তার মন আমার কাছে বাঁধা রেখেছিল।

কিন্তু কেন হারালুম? জ্ঞানশঙ্করবাবুর পোষ্যপুত্র হতে রাজী হয়েছি বলে? কিন্তু কেন রাজী হয়েছি, সে কথা তো গোপন করিনি। অর্থের লোভ আমার ছিল না, আজও নেই। লোভ যার ওপর, সে অনেক বড় জিনিস। সে রত্ন পাবার জন্য আমি সবই বোধহয় হারাতে পারি। তবু কেন অবুঝ হল স্বাতি? কেন ভুল বুঝল?

রাগ হল স্বাতির ওপর। কেন সে কিছু চায় না? আমি কি তাকে কোন অধিকার দিইনি? মুখে না বললেই কি কিছু দেওয়া হয়না? মন দেবার কথাও কি মুখে বলতে হবে? কী দিয়েছে স্বাতি! সেও তো মুখে কিছু বলেনি! তবে আমি কী করে সব জানলুম?

মনে হল, আমার ক্ষতি করেছে মিত্রা। সকাল বেলা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে স্বাতিকে আঘাত দিয়েছে। সুযোগ দিয়েছে ভুল বোঝবার। স্বাতি যদি আমাকে ভুল বুঝে থাকে তো সে আমাকে তার দুর্বলতারই পরিচয় দিচ্ছে। মিত্রার চেয়ে সে ছোট কিসে? নাইবা থাকল তার বাইরের জৌলুস, আমি যে তার ভেতরের সম্পদ দেখেছি। সে কথা কি সে জানে না?

হঠাৎ আমার ভাবনার মোড় ঘুরে গেল। মনে হল, যা এতক্ষণ ভেবেছি সে সবই মিথ্যা। স্বাতি আমাকে ভুল বোঝেনি, ভুল বুঝতে পারে না। সে দুঃখ পেয়েছে তার বাবা-মার আচরণে। তাঁদের ওপর তার অভিমান। আশৈশব লালন করেও তাঁরা তাকে বুঝতে পারলেন না, বোঝবার চেষ্টাও করলেন না। তার কি কোন মতামত নেই? রাণার প্রস্তাবে সম্মত হবার আগে তার সম্মতির কি কোন প্রয়োজন ছিল না? সে কি কেষ্টনগরের পুতুল, যে ভাল খদ্দের পেলেই বেচে দেওয়া চলে?

মিত্রার কথাও আমার মনে পড়ল। আজ সারাদিন একান্তে কাটিয়েও যাকে আমি চিনতে পারিনি, আজ এই মুহূর্তে মনে হল, তাকে আমি চিনে ফেলেছি। আমার কাছে সে আর দুর্জ্ঞেয় নয়। তার সমস্ত আচরণের আড়ালে আছে যে শাশ্বত মেয়েটি, সে আমার অনেক দিনের চেনা। অন্ধকারের ভেতর আমি তাকেও স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

দিল্লীর লাল কেল্লায় যখন চাওলার সাক্ষাৎ পাই, তখন মিত্রা তার পরিচয় দিয়েছিল বন্ধু বলে। আজ বুঝতে পারলুম যে চাওলার সঙ্গে তার বন্ধুতারই সম্পর্ক, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু চাওলা এতে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। পঞ্চনদবাসী সেই যুবক বোধহয় নারীকে শুধু বন্ধুরূপেই পেতে চায় না, আরও কিছু প্রত্যাশা রাখে। যাকে ভালবাসে, তাকে ঘরে আনতে চায় গৃহিণী করে। পুরুষের এ চাওয়া চাওলা অন্যায় মনে করে না, কিন্তু মিত্রা অস্বীকার করে।

পুরুষকে ভালবাসলেই তার স্ত্রী হতে হবে শাস্ত্রেও বোধহয় এমন বিধান নেই। মিত্রা তো শাস্ত্রও মানে না।

আমাকেও কি মিত্রা এমনি বন্ধুরূপে পেতে চায়, না আর কিছু?

সকাল বেলায় একসঙ্গে এল রাণা ও মিত্রা। মামীর আনন্দ যেন ধরে না। সাদরে তাদের অভ্যর্থনা করলেন।

মামা বাইরের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে বললেন: এস।

এগিয়ে এসে রাণা বলল: বাবা আসতে পারলেন না, তাই আমরাই এলুম। আজ রাতে আপনারা আমাদের বাড়িতে খাবেন।

আমিও বাইরে ছিলুম। মিত্রা আমার দিকে তাকাল।

মামা বললেন: খাওয়া-দাওয়ার আবার কী দরকার?

মামী বললেন: ঠিকই তো! তার চেয়ে তোমরা আজ এখানে খাও।

আমরা?

রাণা প্রশ্ন করল।

ক্ষতি কি: মামী উত্তর দিলেন: সন্ধ্যেবেলা গল্পগুজব করবে, রাতে একেবারে খেয়ে ফিরবে।

মিত্রার মুখের দিকে তাকাল রাণা। কাজেই জবাবটা মিত্রাই দিল, বলল: আমরা তো আগেই খেয়েছি, না হয় আর একদিন হবে। আজ বাবা আমাদের পাঠিয়েছেন, আজ আপনারা আমাদের বাড়ি চলুন।

এর পরে বোধহয় আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। তবু রাণা আমার সমর্থন চাইল, বলল: তাই ঠিক নয় গোপালবাবু?

সম্মতি দেবার অন্য মালিক। আমি উত্তর দিলুম না।

মিত্রা এবারে সবার দিকেই চাইল, বলল: আপনারা না বলবেন না।

অনুরোধে সিক্ত হল মিত্রার কণ্ঠস্বর।

মামা হার মানলেন, বললেন: না বলবার যে পথ রাখলে না মা, রাজী হতেই হবে। শরীর ভাল থাকলে নিশ্চয়ই যাব।

এই সম্মতিতে রাণার চেয়েও খুশী হল মিত্রা। সে তার চোখের দৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারলুম।

স্বাতি কোথায়?

মিত্রা প্রশ্ন করল। তার পরেই বলল: থুড়ি, বৌদি কোথায়?

বলল আমার দিকে চেয়ে অত্যন্ত মৃদু স্বরে। রাণা ও আমিই বোধহয় শুনতে পেলুম।

কাল থেকে দেখতে পাচ্ছিনে: আমি জবাব দিলুম: ভেতরে খুঁজে দেখুন।

আমার উত্তরের অপেক্ষা মিত্রা করেনি। তার আগেই সে ভেতরে চলে গিয়েছিল।

বাইরে আরও একখানা মোটর দাঁড়াবার শব্দ পেলুম। দেখলুম, চাওলা আসছে। মনে হল, এই মুহূর্তে যেন চাওলার প্রয়োজন ছিল। সেই আমাকে উদ্ধার করতে পারবে।

আরে আরে চাওলা যে!

রাণা হিন্দীতে আলাপ শুরু করল।

চাওলাও তার অভ্যাসমত ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল। হেসে বলল: এইখেনেই তোমার দেখা মিলবে জানতাম।

রাণা আশ্চর্য হল, বলল: বল কি! তুমিও হাত গুণতে শুরু করলে নাকি? কিন্তু তুমি তো আমার হাত দেখনি।

আমি তো হাত দেখি না: চাওলা জবাব দিল: আমি কপাল দেখি। লাল কিলায় তোমার কপাল দেখেছিলাম।

তার পরেই প্রশ্ন করল: তোমার বোন কই?

ভেতরে।

রাণা জবাব দিল।

মামা মামীও মিত্রার সঙ্গে ভেতরে গিয়েছিলেন। চাওলা আমার দিকে চেয়ে আর একটু হাসল।

আমার সঙ্গে করমর্দনটা নিঃশব্দেই হয়েছিল। বললুম : হাসলে যে?

চাওলা আর একটু হেসে বলল : ওই কাজটিই তো শুধু পারি।

তারপর গম্ভীর হয়ে বলল : গোপালবাবুকে নিতে এলুম। আজ দিল্লীর বাইরে যাচ্ছি

আপনার গ্রামে?

আমি প্রশ্ন করলুম।

ঠিক ধরেছেন : চাওলা জবাব দিল : যাব আর আসব।

পাশের ঘর থেকে মিত্রাও বোধহয় শুনতে পেয়েছিল। বেরিয়ে এসে বলল : কিন্তু আজ তো আপনার যাওয়া হবে না।

মাঝখান থেকে আমি সরে দাঁড়ালুম। মিত্রা ও চাওলা দাঁড়াল মুখোমুখি। মনে হল, চাওলা বোধহয় এতটা আশঙ্কা করেনি। নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় নিল, তারপর জবাব দিল : কখন দরকার গোপালবাবুকে?

সন্ধ্যেবেলায়।

মিত্রা বলল।

চাওলা হেসে বলল : ডিনারের আগেই আমি পৌঁছে দেব।

রাণা তবু একটু আপত্তি তুলল, বলল : আজ কি না বেরলেই নয়?

চলবে না কেন : চাওলা জবাব দিল : সারাদিন বসে বসে গোপালবাবু কী করবেন?

মিত্রা বলল : তোমার সঙ্গে বেরিয়েই বা করবেন কী?

প্রশ্নটা রূঢ়, একটু তিক্তও যেন। চাওলা তবু হাসল, বলল : তোমাদের দিল্লী তো গোপালবাবুকে দেখিয়েছ, এবারে আমাদের দিল্লী দেখাব।

ও।

বলে মিত্রা থামল। তাকাল আমার দিকে। আমার মনে পড়ল কাল বিকেলের কথা। ওখলায় গাড়িতে ওঠবার আগে চাওলার এই পরিচয় পেয়েছিলুম মিত্রার কাছে। একচোখে দেখা কি সম্পূর্ণ হয়, আমি ভাবলুম। ভগবান আমাদের হুটো চোখ দিয়েছেন, ডান বাঁ হুটো একসঙ্গে দেখবার জন্য। আমরা যখন একচোখে দেখি, তখন নিশ্চয়ই ভুল করি।

তা হলে চলুন।

চাওলা আমায় আদেশ করল।

বললুম: কাপড়টা বদলে নিই। রাতের শোওয়া কাপড়।

স্নানটাও না হয় সেরে নিন। গ্রামে অসুবিধে হবে।

কেন?

আমি জানতে চাইলুম।

চাওলা বলল: কুয়োর ধারে খোলা জায়গায় নাইতে হয়। কিংবা পুকুরের খোলা ঘাটে। নদী থাকলে নাইতে বলতাম না। সে জলের একটা আকর্ষণ আছে, তৃপ্তি আছে। খোলা মাঠের মত, খোলা হাওয়ার মত।

একটা ভ্রূকুটি করে মিত্রা সরে গেল। আমি ভেতরে গেলুম স্নানের জন্য।

তুমি নাকি বেরুচ্ছ?

মামা আমার পথ আটকালেন।

বললুম: সন্ধ্যার আগেই ফিরব।

পাশ থেকে মামী বললেন: হুপুরে একদিনও খাচ্ছ না, কী যে করছ বুঝি না।

উত্তরে আমি একটু হাসলুম।

আমি স্নানের ঘর থেকেই গাড়ির শব্দ পেলুম। রাণা ও মিত্রা ফিরে গেল। মামা বোধহয় চাওলাকে নিয়ে বারান্দায় বসেছেন।

বাইরে বেরিয়েই বাধা পেলুম স্বাতির কাছে। যে মেয়ে কাল

রাত থেকে আমায় এড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সে নিজে থেকেই কাছে এল। কোন ভূমিকা না করেই বলল : তোমার কোথাও যাওয়া হবে না গোপালদা!

সে কি!

বিস্ময়ের আমার শেষ নেই।

আমি ঠিকই বলছি : স্বাতি জবাব দিল : তোমাকে যেতে দেব না।

আমি কী বলব ভেবে পেলুম না।

স্বাতি বলল : চাওলা লোকটাকে আমার ভাল লাগে না।

এবারে আমি হেসে ফেললুম, বললুম : মেরে ফেলবে আমাকে?

তুমি ঠাট্টা কোরো না।

বলে স্বাতি আমার হাতদুটো চেপে ধরল।

আমার রোমাঞ্চ জাগল। মনে হল, সারা জীবন ধরে বুঝি আমি এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করেছি, এমন পাওয়া বুঝি আমি কখনো পাইনি।

খনখন করে কোথায় একটা শব্দ হতেই স্বাতি আমার হাত ছেড়ে দিল। কিন্তু সে তো ছেড়ে দেওয়া নয়। তার চেয়ে শক্ত বাঁধনে যে সে আমার মনটাকে বেঁধে ফেলেছে। তাকে ছাড়াব কোন্ শক্তি দিয়ে!

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বেদনায় ভারাক্রান্ত তার মন, সেই মনের ছায়া পড়েছে তার দু চোখে। ছলছল করছে, 'না' বললেই উপছে পড়বে অবাধ্য জল। আমি না বলতে পারলুম না। হাসিমুখে পরাজয় স্বীকার করে নিলুম, বললুম : তাই হবে।

স্বাতি পালিয়ে গেল।

চাওলাকে এ কথা বলতেই সে চমকে উঠল। বলল : সেকি! এইটুকুতেই তোমার মত পালটে গেল!

বললুম : কী করব, উপায় নেই।

হাসতে হাসতে চাওলা বলল: কাপুরুষ তুমি। সামান্য একটি মেয়ের কথায় তোমার ইচ্ছাকে তুমি জলাঞ্জলি দিলে?

আমাকে ফিরতে দেখে মামা উঠে গিয়েছিলেন। আমি তারই সুযোগ নিলুম। বললুম: সামান্য মেয়ে সে নয় ভাই, সে অসামান্যা।

বল কি!: চাওলার যেন বিশ্বাস হল না আমার কথা, বলল: মিত্রাকে তুমি অসামান্যা বল?

সত্যি কথা আমি প্রকাশ করলুম না, বললুম: কেন বলব না?

অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে রসিয়ে হাসল চাওলা। তারপর বলল: প্রেমে পড়ে প্রথমে আমিও তাই ভাবতুম।

এখন কি তোমার মত বদলেছ?

আমি জানতে চাইলুম।

কেন বদলাব না: চাওলা উত্তর দিল: চোখে তো আর রঙীন ঠুলি নেই। মোহ ভাঙতেই খাঁটি রূপটা দেখতে পেয়েছি।

মুখটা তার কানের কাছে নিয়ে গিয়ে বললুম: তবু তো তাকে ভালবাস।

চাওলা সেই শ্রেণীর মানুষ, যাকে প্রথম দিন থেকেই পুরনো মনে হয়েছে। তার সঙ্গে যে একদিনের পরিচয় নয়, পরিচয় যে জন্মান্তরের, এই কথাই মনে হয়েছে তার কথায়, তার ব্যবহারে। এই সাহস নিয়েই তার সঙ্গে রহস্যে প্রবৃত্ত হলুম।

চাওলাও উত্তর দিল হেসে, বলল: ভালবাসা বলতে তুমি কী বোঝ জানিনে। কিন্তু আমি যা বুঝি, মিত্রা তা স্বীকার করে না।

সেকি!

আমি আবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

চাওলা বলল: আমি ভালবাসতে চাই একটি মেয়েকে। কিন্তু যাকে ভালবাসব, তাকে চাই আমার সমস্ত অধিকারের মধ্যে। দুনিয়ার আর কেউ তার ওপর কোন দাবী রাখতে পারবে না।

সাবাস!: তার কথার মাঝেই আমি মন্তব্য করলুম: এই তো পুরুষের ভালবাসা। আদিম যুগ থেকে আজও পর্যন্ত একেই তো আমরা শ্রদ্ধা করে আসছি।

কিন্তু তুমি শ্রদ্ধা করলে কী হবে?: চাওলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: যে শ্রদ্ধা করলে আমার জীবনটা সার্থক হত, সে তো অন্য কথা বলে।

সবটুকু শোনবার জন্য আমি বললুম: তাই নাকি!

আর বল'কেন: চাওলা উত্তর দিল: সে মেয়ে ভাবে যে ভালবাসলেই যে বিয়ে করতে হবে, তার কোন মানে নেই। পৃথিবীর সমস্ত পুরুষকে ভালবেসেও কুমারী থাকা চলে। বন্ধুকেও তো লোকে ভালবাসে?

সমর্থনের ভঙ্গীতে আমি বললুম: সত্যিই তো, পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ কি শুধু স্বামী-স্ত্রীর?

চাওলা বোধহয় চটে উঠল, বলল: এসব তত্ত্বকথা বলতে বেশ লাগে। যে ভোগে, সেই বোঝে।

তারপর ভয় দেখাল, বলল: আমিও তো রইলাম। দেখব, এসব কথা তোমার কতদিন ভাল লাগে।

আমি হাসলুম তার বলার ধরন দেখে।

চাওলা উঠে দাঁড়াল। বলল: চলি এবারে। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।

আমিও উঠে দাঁড়িয়েছিলুম, কিন্তু কিছু বলবার আগেই মামা এলেন বাইরে, বললেন: সেকি, তুমি একা যাচ্ছ, গোপাল যাবে না?

ভাবছি, বাড়িতেই থাকি।

আমি জবাব দিলুম।

যাবে বলে তৈরি হলে—

মামা তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আমি কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না।

চাওলা আবার অনুরোধ করল : চলুন না। সন্ধ্যের আগেই আমি আপনাকে পৌঁছে দেব। পাকা কথা দিচ্ছি।

কিন্তু—

কিন্তু নয় গোপালবাবু। আমি আপনাকে বলছি, আপনার সত্যিই ভাল লাগবে। শহরের মানুষ আপনি, গ্রামের আবহাওয়া আপনি যথার্থ উপভোগ করবেন।

মনে মনে ভাবলুম, তা হয়তো করব। কিন্তু স্বাতির অনুরোধ ঠেলে যাই কী করে? সে তো কখনও কিছু চায়নি, হয়তো আর চাইবারও অবকাশ পাবে না। তাকে দুঃখ দিয়ে আমার কী লাভ হবে!

কিন্তু স্বাতি আমাদের সবাইকে চমকে দিল। বেরবার জন্যে তৈরি হয়ে বাইরে এল। বলল : গোপালদার সঙ্গে আমিও যাব বাবা।

বড় বড় চোখ মেলে চাইল চাওলা। মামার চোখও কপালে উঠল। বললেন : তুমি যাবে?

স্বাতি সহজ ভাবে জবাব দিল : মা মত দিয়েছেন, তুমি রাজী হলেই যেতে পারি।

কিন্তু—

কিন্তু নয় বাবা, আমিও একটু বেড়িয়ে আসি। এস গোপালদা বলে এগিয়ে গেল।

আমরা তার অনুসরণ করলুম।

১৯

গাড়িতে বসে অনেকক্ষণ আমি কথা কইতে পারলুম না। বেদনার মত তীব্র একটা অনুভূতিতে আমার সারা অঙ্গ অবশ হয়ে রইল। এ কি বেদনা, না আনন্দ! আনন্দের শেষ বুঝি বেদনার মত গভীর। বেদনার শেষে যেমন আনন্দ।

স্বাতি যে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে, এ আমার কল্পনার অতীত ছিল। যে মেয়ে আমাকে যেতে দেয়নি, সে নিজে বেরিয়ে এল! আমাকে যেতে দিতে যার ভয়, সে এল আমারই সঙ্গে! এ কি আমাকে সাহস দিতে, না আমাকে রক্ষা করতে!

হঠাৎ আমার হাসি পেল। ভাবলুম, এ কী ছেলেমানুষি আমার! সামান্য একটা ঘটনার কত গভীর অর্থ খুঁজছি।

স্বাতি আমার মুখের দিকে চেয়েই মনের খানিকটা আভাস পেল। বলল: আমার কাণ্ড দেখে তুমি হাসছ তো গোপালদা?

স্বাতি কথা কইল বাঙলায়। কিন্তু চাওলাও তার মুখের দিকে তাকাল। আমি তাকে আশ্বাস দিলুম, বললুম: স্বাতি হিন্দী জানে না, ইংরিজি বলে থেমে থেমে। দরকার হলে তোমার সঙ্গে ইংরিজিতেই কথা কইবে।

কিন্তু চাওলা আমাদের বিস্মিত করল, বলল: বাঙলা আমি একটু একটু বুঝতে পারি, কিন্তু বলতে পারি না।

বাঙলাতেই বলল এই কথা কটি।

এই তো দিব্বি বাঙলা বলছেন!

স্বাতি আনন্দ প্রকাশ করল।

বললুম: কোথায় শিখলেন বাঙলা?

বাঙলাতেই চাওলা উত্তর দিল, বলল: মিত্রার জন্যে।

তারপর ইংরেজীতে বলল তার কারণ : অবাঙালীরা বড় গোঁড়া, বিশেষ করে হিন্দী ভাষাভাষীরা। তারা নাকি নিজেদের ভাষা ছেড়ে আর কোন ভারতীয় ভাষা শেখে না, শিখতে চায় না। অথচ বাঙালীদের দেখ, দেখ আর সব প্রদেশবাসীদের, ঝর ঝর করে তারা কেমন হিন্দুস্থানী বলছে।

আমার মনে হল, কথাটা মিথ্যে নয়। বললুম : তা বটে।

তুমিও এ কথা বললে! : চাওলা গম্ভীর হল—ছদ্ম গাম্ভীর্য, বলল : গান্ধীজী বাঙলা শেখেননি ? বাঙলা লেখেননি ?

হেসে বললুম : তোমার মতই শিখেছিলেন। তবু তাঁকে দোষ দিই না, হিন্দীটা তাঁর নিজের ভাষা নয়।

চাওলা হাসতে লাগল।

একটা কথা ভেবে আমার আশ্চর্য লাগছে : আমি স্বাতির দিকে তাকালুম : কী করে মামীর মত পেলে ? আমাদের মত দুটো অপগণ্ডের সঙ্গে ছেড়ে দিতে তাঁর আপত্তি হল না ?

আমার প্রশ্ন শুনে বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে হাসল স্বাতি। বলল : মায়ের কাছে মতই যদি নিতে না পারলুম তো মেয়ে কিসের!

তা সত্যি। মেয়েদের তো ছলের অভাব নেই।

আমি জবাব দিলুম।

স্বাতি ভর্ৎসনা করল তার দৃষ্টি দিয়ে।

দুজনে বসবার ছোট গাড়ি। আমরা চাপাচাপি করে বসে ছিলুম। মাঝখানে আমি, স্বাতি আমার বাঁ দিকে। গলাটা আরও একটু নামিয়ে বললুম : আমাদের সঙ্গে যেতে তোমার ভয় করছে না ?

ভয় করব তোমাকে ?

স্বাতি হাসল। তার আজকের হাসিতে আমি যেন আমার অনেক দিনের চেনা স্বাতিকে দেখছি। শুধু কি চেনা ? গোটা মেয়েটাকে আমি দেখছি। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ভাবে দেখছি। কিন্তু কোথা থেকে এই স্বচ্ছতা এল। একটা রাতের ভেতর এত

পরিবর্তন এল কী করে? মনে হল, ঐ কথা কটি বলে স্বাতি আমাকে বিদ্রূপ করল।

কোথায় যাবে তোমরা গোপালদা?

স্বাতি জানতে চাইল।

চাওলা তার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছিল, উত্তর সেই দিল ইংরেজীতে। বলল: দিল্লীর একটা গ্রামে। গ্রাম দেখতে।

ভারি চমৎকার আইডিয়া তো! নিশ্চয়ই গোপালদার নয়।

স্বাতি মন্তব্য করল।

এ কথাও বুঝল চাওলা, বলল: সখটা কিন্তু এঁরই। আমি শুধু প্রস্তাব করেছি। আমরা দিল্লী বেড়াতে এসে মরা দিল্লী দেখি। যে দিল্লী বেঁচে আছে, নিয়ত যুদ্ধ করছে বাঁচবার জন্যে, তার দিকে ফিরেও চাই না।

আমরা তাকে বলবার অবকাশ দিলুম।

চাওলা বলল: দিল্লী দেখতে আমরা কুতব মিনার পর্যন্ত যাই, কখনও কখনও সূর্যকুণ্ড পর্যন্ত। কিন্তু আরও একটু এগিয়ে পথের পাশে যে সব গ্রাম আছে, তা দেখি না। দিল্লী কি শুধু নয়া দিল্লী আর পুরনো দিল্লীর সমারোহ, না তোমাদের কলকাতাই বাঙলা দেশ? আমাদের ভ্রমণ তো বিদেশীর ভ্রমণের মত। বিদেশ থেকে যখন বড় বড় নেতারা আসেন, আমরা তাঁদের চোখ বেঁধে বড় বড় জায়গাগুলো দেখিয়ে দিই, বড় বড় শহর, কারখানা, পরিকল্পনা। বলি এই ভারতবর্ষ। তাঁরা হাতে তালি দিয়ে বলেন, সাবাস। উত্তর-স্বাধীনতা যুগে কী অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে ভারতের। কিন্তু—

চাওলা থামল।

তারপর হাসল লজ্জিত ভাবে। বলল: অনেক বাজে কথা বলে ফেললাম।

বাজে কথা কেন?

আমি উৎসাহ দিলুম।

আর লজ্জা দিও না : চাওলা উত্তর দিল : এ সব কথা বলবার সময় নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলি।

একটু থেমে বলল : আমি গরিবের ছেলে, গরিবের দুঃখ আমি জানি। পেটের ধাঁধায় শহরে থাকি, কিন্তু গ্রামে আমার নাড়ির টান। গ্রামেই আমরা মানুষ।

দিল্লীতে আপনি একা থাকেন ?

স্বাতি প্রশ্ন করল।

একাই তো : চাওলা উত্তর দিল : নিজে বিয়ে করিনি, বাবা মাও এলেন না গ্রামের মায়া ছেড়ে।

আপনার দেশ কোথায় ?

স্বাতি জানতে চাইল।

চাওলা বলল : সে অনেক দূরে, এখন আর সেখানে যাবার অধিকার নেই। দিল্লীর কাছেই কিছু জমি পেয়েছি। বাবা মা সেখানেই আছেন।

আমরা কি তাঁদের কাছেই যাচ্ছি ?

স্বাতি জিজ্ঞেস করল।

যদি আপত্তি না থাকে : উত্তর দিল চাওলা : দুপুরটা আজ সেখানেই কাটানো যাবে।

আপত্তি কেন থাকবে ? : স্বাতি তখুনি উত্তর দিল : আপনার বাবা মাকে দেখতে পাব, সে তো আমাদের ভাগ্যের কথা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য হবে অন্য কারণে।

দুর্ভাগ্য আবার কিসের ? : আমি জিজ্ঞেস করলুম।

চাওলা বলল : খেতে পাবে না। গ্রামের মানুষ তাঁরা। বেলায় অতিথি এলে শুধু ডাল রুটিই খেতে দেবেন। আর আচার পাবে দু এক রকম।

সেই তো যথেষ্ট : স্বাতি উত্তর দিল : আচার আমার খুব ভাল লাগে।

চাওলা খুশী হল, বলল : তাই নাকি! আমার মাও আচার ভালবাসেন। কম করেও বত্রিশ রকমের আচার খাওয়াতে পারবেন।

বলেন কী!

বিস্ময়ে স্বাতি অভিভূত হল।

বত্রিশ রকম আচারের ইতিবৃত্ত দিতে লাগল চাওলা, বলল : সমস্ত সব্জী আর কাঁচা ফলের আচার পাবে। এর ভেতরেও আবার দুরকম আছে—একটা পাকা আচার, সেটা সারা বছর রাখা চলে। আর একটা কাঁচা, সেটা দিনকয়েক মাত্র খাওয়া চলে, কতকটা তোমাদের অম্বলের মত।

স্বাতির বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছে, বলল : অম্বল আপনি জানলেন কোথায়?

জানি না! : চাওলা উত্তর দিল : মিত্রাদের বাড়িতে চাটনি আর অম্বল অনেক খেয়েছি।

এবারে বলল বাঙলায়। স্বাতি অপর্যাপ্ত ভাবে হাসল তার কথার ধরন দেখে।

কিন্তু আমরা তো খেতে যাচ্ছিনে : আমি বললুম : আমরা যাচ্ছি দেখতে। কী দেখাবে বল তো?

চাওলা বলল : দেখতে যাচ্ছ, নিজের চোখেই দেখো। আগে ভাগে বলে কেন রসভঙ্গ করি!

তবু?

আমি প্রশ্ন করলুম।

চাওলা হেসে বলল : কিছু সুস্থ মানুষ। সভ্যতার মুখোসপরা মানুষ তো অনেক দেখেছ, তাদের সঙ্গে এদের তুমি মিলিয়ে নিও।

কুতব রোড ধরে আমরা চলেছিলুম। কুতব মিনার পৌঁছে আমরা বাঁয়ে মোড় নিলুম। তুঘলুকাবাদের পাশ দিয়ে সূর্যকুণ্ডের পথ। সেই পথে আমরা যাব। গাড়ির গতি আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে চাওলা বলল : আমি জানি, আমাদের সম্বন্ধে তোমার

কোন প্রত্যক্ষ ধারণা নেই। অনেক কিছু দেখে তোমার আশ্চর্য লাগবে।

বললুম : কী রকম।

চাওলা বলল : এই ধর আমাদের মেয়েদের কথা। পুরুষদের চেয়ে কি তারা কম মজবুত ?

তারপর এই কথাটি প্রমাণ করবার জন্যে একটা উদাহরণ দিল, বলল : মনে কর, কোন মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে, আর পাশ দিয়ে যেতে যেতে কোন ছোকরা হয়ত একটু হাসি মস্করা করে ফেলল। মেয়েটিও ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। বলল, 'এস, দেখি তোমার কব্জির জোর।' বলে তার হাত চেপে ধরল, বলল, 'ছাড়িয়ে যাও, তবে মরদ বলব।' সেই হাত ছাড়িয়ে চলে যাবে, এমন ছোকরা বেশি মিলবে না।

বলে চাওলা হাসতে লাগল।

গম্ভীর হয়ে আমি বললুম : তুমি পারবে ?

আমি ? : চাওলা তার হাসি থামাল না। বলল : শহরের মেয়ের কাছেই আমি হেরে যাচ্ছি।

স্বাতির হঠাৎ একটা পুরনো কথা মনে পড়ল, বলল : সেদিন এক ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলাম আপনার সঙ্গে, তাঁকে তো আর আনলেন না ?

আমার মনে হল, এই প্রশ্ন করে স্বাতি তার মেয়েলি মনের পরিচয়টাই শুধু দিল। চাওলাও বোধহয় এমনি কিছু ভাবল, বলল : কিন্তু যার জন্যে করলাম সে কিছুই জিজ্ঞেস করল না।

তার পরেই প্রসঙ্গ পালটাল, বলল : বীণা আমার এক বন্ধুর বোন, বিবাহিত। তার স্বামীর সঙ্গে দিল্লী এসেছিল। স্বামীর ফুরসৎ নেই। আমিই তাকে দিল্লী দেখিয়ে দিলুম।

স্বাতি আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হল, মিত্রার জন্যে তার দুঃখ বোধ হচ্ছে। সে নিশ্চয়ই অন্য রকম ভেবেছে।

ইচ্ছে হল বলি যে সম্বন্ধটা মধুর। বন্ধুর বোন, কতকটা বউএর বোনের মতই, কিন্তু সঙ্গে স্বাতি আছে বলে কথাটা চেপে গেলুম।

তবু খানিকটা রহস্য করবার লোভ ত্যাগ করতে পারলুম না। বললুম: যার জন্যে করলে, সে জিজ্ঞেস নাই বা করল। কিছু ফল পেয়েছ তো?

স্বাতি বুঝতে পারেনি, বলল: কিসের ফল গোপালদা?

বলল আস্তে আস্তে অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে। চাওলা শুনতে পেয়েছিল, উত্তরটা তাই সেই দিল। বলল: কী করব বলুন, ঘি যখন সোজা আঙুলে ওঠে না, তখন আঙুল একটু বাঁকাতে হয়। ডাকলে কাছে না এলে, ভয় দেখিয়ে কাছে আনবার চেষ্টা। বীণাকে মিত্রা চেনে না। এক সঙ্গে সামনে পড়ে যেতেই দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এল। একটু ঢং করে ঈর্ষা জাগাবার চেষ্টা করলাম মাত্র।

হাসতে হাসতে বলল: আপনি আবার বলে দেবেন না যেন।

চাওলার ছেলেমানুষি এখনও যায়নি দেখছি। উত্তরে আমরা হাসতে লাগলুম।

তোমরা যে হাসবে আমি জানি: চাওলা অভিযোগ করল: অন্যের বুকে কাঁটা ফুটলে কি আর ব্যথা বোঝা যায়?

ছিছি, এ কথা কেন বলছ: আমি জবাব দিলুম: সমস্ত মানুষের দুঃখ যার নিজের বুকে তার মুখে এ কথা সাজে না।

এইবারে চাওলা অট্টহাস্য করে উঠল, বলল: ঠিক বলেছ গোপালবাবু। নিজের বুকে ব্যথা না থাকলে কি অন্যের ব্যথা বোঝা যায়! কিন্তু আজ কেন এ কথা বললাম জানো? মিত্রার প্রসঙ্গ আমার শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে আমার আর কিছু চাইবার নেই। প্রথম নতুন জীবন শুরু করছ, সহজ ভাবে সুস্থ-ভাবে কোরো। পরে যেন আমার মত পস্তাতে না হয়।

আমার পাশে গায়ে গা মিলিয়ে আছে স্বাতি। শুধু তার দেহেরই উত্তাপ পাচ্ছি না, একটা দেহাতীত আনন্দও পাচ্ছি। ঠিক

এমন করে স্বাতিকে কখনও পাইনি। এমন করে সে কখনও মেশেনি। মনের দিক থেকে আমরা কত নিকটে এসে গেছি, সে কথা আমিও ভাল করে ভেবে দেখিনি। চাওলা আমাদের সম্পর্কের কথা জানে না, জানে বোন বলেই। তাই অমন স্পষ্ট করে মিত্রার কথা বলতে পারল। কিন্তু আমার সঙ্কোচ বোধ হল, আমি তার মত স্পষ্ট জবাব দিতে পারলুম না। বললুম: আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ। দিল্লীতে আমি হৃদয়চর্চা করতে আসিনি। এসেছি দিল্লী দেখতে। আর—

কথাটা মুখে আটকে গেল।

কিন্তু চাওলা থামতে দিল না, বলল: আর কী?

নিজের অসাবধানতার জন্যে লজ্জা বোধ করলুম, তবু উত্তরটা দিয়ে দিলুম: আর এদের জন্যে।

বলে স্বাতিকে দেখালুম।

মোটরের ঝাঁকানিতেও স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে স্বাতির দেহটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। আমার ভাল লাগল।

চাওলা সহজ ভাবেই নিল আমার কথাটা, বলল: তা কি বুঝিনে? এঁরা না থাকলে তোমার দিল্লী দেখার সখ হত না। কিন্তু দেখতে এসে—

বলেই থেমে গেল। পরম কৌতুকে তাকাল আমার মুখের দিকে।

আমি উত্তর দিলুম না। চাওলার তাতে আপত্তি নেই। বলল: শুনলাম কাল ওখলায় পিকনিক হল, আজ ডিনার। বেশ জমেছে দেখছি।

এবারে আমি বিরক্ত হলুম। লোকটার কি গাত্রদাহ হচ্ছে? বললুম: আজ কী দেখাবে তাই বল।

আড়চোখে চাওলা আমার মুখের দিকে তাকাল। কী বুঝল জানিনে, কথার মোড় ফেরাতে দেরী করল না। বলল: এক সাহেবের গল্প মনে পড়ছে।

সত্যি গল্প, না তোমার তৈরি ?

আমি প্রশ্ন করলুম।

চাওলা বলল : সত্যি নয়, আমার তৈরিও নয়।

তবে ?

আমি আশ্চর্য হলুম।

চাওলা হেসে বলল : আমার শোনা গল্প। যে বলেছে, তার তৈরি কিনা আমি জানিনে। তৈরি হলেও ক্ষতি নেই। কেন না গল্পটা সত্যি হতেও পারত।

আমিও হেসে বললুম : ভূমিকাটি ভাল লাগল।

স্বাতি বলল : বেশ তো, আমি সত্যি বলেই মনে করব।

গম্ভীর ভাবে চাওলা বলল : ধন্যবাদ।

তারপর গল্প শুরু করল : তখনও ইংরেজের রাজত্ব। সাহেবদের কাছে খবর পৌঁছেছে যে দিল্লীর আশেপাশের লোকেরা খেতে পায় না। অর্থাৎ সারাবছর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আর বুকের রক্ত জল করে ক্ষেতে যে ফসল ফলায়, তা খায় রাজধানীর লোক। আর চাষীরা উপবাসী থাকে। তুমি অস্বীকার কর এ কথা ?

চাওলা আমাকে জিজ্ঞেস করল। উত্তরও দিল নিজে, বলল : এখনও তো এই অবস্থা। কিছু যব কিছু বাজরা কিছু ভুট্টা এসবের রুটি যদি দুখানা জুটল তো তাদের বাপের ভাগ্যি। ছোলা নামে একটা শস্য ভগবান দিয়েছিল বলেই তো এরা বেঁচে আছে। ছত্রিশ পদ খাদ্য হয় ছোলা থেকে, কচি শাক থেকে কটকটে ছোলা পর্যন্ত, ঘণ্ট থেকে মিষ্টি।

শেষ দুটি কথা চাওলা বাঙলায় বলল।

স্বাতি হেসেই আকুল, বলল : এ সব কথা কোথায় শিখলেন ?

গম্ভীর ভাবে চাওলা বলল : মিত্রার ড্রয়িং-রুমে। একদিন চৌত্রিশ পদ হাতে গোনবার পর শেষ পদ দুটি ভেবে পাচ্ছিলাম না।

মিত্রাই বলেছিল, ঘণ্ট আর মিষ্টি। ছোলা শাকের ঘণ্ট আর বেসনের লাড্ডু।

তারপরই বলল : কিন্তু দেখ, কী বলছিলাম ভুলে গেলাম।

সাহেবের গল্প।

আমি স্মরণ করিয়ে দিলুম।

ঠিক বলেছ : চাওলা আবার শুরু করল : এ খবর শুনে সাহেবরা তো রেগে কাঁই। এক হোমরা-চোমরা সাহেব নিজে তদন্তে গেলেন। মোটরে চেপে সোজা এই রাস্তা দিয়ে। গ্রামখানা আমি দেখিয়ে দেব।

বলেই আমার দিকে একবার তাকাল।

বললুম : তারপর ?

চাওলা বলল : চাষীরা তখন চাষ করছে। ভয়ানক ব্যস্ত। মাথার ওপর সূর্য উঠতে তো আর দেরী নেই। খানিকক্ষণ পরেই চাষ বন্ধ করতে হবে। বাড়ির বৌ ঝিয়েরা খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

খাবার নিয়ে মাঠে এসেছে ?

স্বাতি প্রশ্ন করল।

না এসে আর উপায় কি : চাওলা উত্তর দিল : ছোকরারাও মাঠে এসেছে রাতের শেষ প্রহরে, সূর্য ওঠবার ঢের আগে। বুড়োরা তো এসেছে প্রায় মাঝরাতে। আকাশের তারা দেখে তারা কাজে বেরয়, সূর্য দেখে নয়।

বিস্ময়ে স্বাতি অভিভূত হল। বলল : অন্ধকারেও জমি চাষ করে ?

উৎসাহ পেয়ে চাওলা বলল : না করলে যে বিপদ। বিকেল-বেলায় আবার বেরতে হবে। রোদে পোড়া মাটিতে তখন পা রাখে কার সাধ্যি ! পেটের জন্যে তবু বেরতে হয়।

স্বাতি বলল : এ যে আমাদের দেশের ময়রার মতন হল।

রসগোল্লার দোকান খুলে বসেছে, কিন্তু সেই রসগোল্লা খাচ্ছে খদ্দের আর মাছিতে খাচ্ছে রস।

চাওলা উপভোগ করল স্বাতির রহস্যটা, বলল: ঠিক বলেছেন। ওদের ফসল খাচ্ছে মহাজন আর রক্ত শুষছে জমিদার।

বাধা দিয়ে বললুম: কিন্তু সাহেবের কী হল ?

সাহেব ?: চাওলা তার গল্পের ভেতর ফিরে এল, বলল: গাড়ি থেকে নেমে সাহেব বলল, ওদের সঙ্গে খাবে ওদেরই খাবার। মহা আপত্তি তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের। বলল, সে একেবারে অসম্ভব। ওরা কি মানুষ, যে সাহেব ওদের খাবার খাবে ? কিন্তু সাহেব নাছোড়-বান্দা, সে খাবেই। নিরুপায় হয়ে তারা একখানা রুটি এগিয়ে দিল, তার ওপর খানিকটা সেই ছোলার শাক। না আছে কাঁটা চামচে, না প্লেট ন্যাপকিন। হাত গুটিয়ে সাহেব বলল, ওদের মত করেই খাবে।

স্বাতির চোখ দেখে মনে হল গল্পটা সে উপভোগ করছে। চাওলা একটুখানি থামতেই বলল: তারপর ?

চাওলা খুশী হয়ে বলল: তারপর আর কী! রাতে সেঁকা জোয়ারের রুটি, কম করেও দেড়পো ওজন, শুকিয়ে একবারে তক্তা হয়ে গেছে। বাঁ হাতে রুটিখানা নিয়ে ডানহাতে সেই শাকটুকু খেয়ে ফেললেন। বললেন: বেশ খাবার, কিন্তু বড় কম খায় এরা। বলে রুটি খানা ফেরৎ দিলেন। বললেন, নাও, প্লেটখানা নাও।

দমকা হাসিতে স্বাতি একেবারে গড়িয়ে পড়ল। রুটিকে প্লেট ভাবল ? কী বুদ্ধি আপনার সাহেবের!

আমরাও হাসলুম অপর্যাপ্ত ভাবে।

২০

সারাটা দিন চাওলার গ্রামে কাটিয়ে সন্ধ্যার আগেই আমরা দিল্লী ফিরে এলুম। স্বাতির আজ আনন্দের সীমা নেই। মনে হল, সে যেন নতুন জীবন পেয়েছে। এমন উদার জীবনের আস্বাদ সে বুঝি আগে কখনো পায়নি। আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। ধনুষ্কোডিতে সমুদ্র-বেলায় ঝিনুক কুড়োবার কথা। সেদিনও সে এমনি করে হাসিতে খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। সেদিন আমি তার আনন্দের ভাগ নিয়েছিলুম, কিন্তু আজ নিলুম বেদনার বোঝা। মনের ভেতর কোথায় একটা বেদনা খচখচ করছিল, স্বাতির এই উল্লাসে হল রক্তক্ষরণ। তবু আমি হাসলুম, আর স্বাতি আমাকে দেখে হাসল।

কিন্তু বাড়ি পৌঁছে হাসি আমাদের শুকিয়ে গেল। বসবার ঘরে বসে যে ভদ্রলোক মামার সঙ্গে গল্প করছিলেন, শুনলুম তিনিই রাণার বাবা মিস্টার ব্যানার্জি। খাঁটি সাহেব। শুধু পোশাকে নয়, কথায় ও ব্যবহারেও। যেভাবে আমাকে গ্রহণ করলেন মনে হল, আমি বুঝি মন্ত্রীদের একজন। আত্মপ্রসাদে বুকখানা ফুলে ওঠা উচিত।

চাওলা যে বুদ্ধিমান, তাতে সন্দেহ নেই। বাড়ির সামনে একখানা বড় গাড়ি দেখেই নিজের গাড়ি থেকে নামেনি। 'ব্যাপার সুবিধে নয়,' বলেছিল অস্পষ্ট ভাবে, 'মনে হচ্ছে খোদ-কর্তা এসেছেন।' ভাবে মনে হল, পালিয়ে বেচারা আত্মরক্ষা করল।

কিন্তু আমি আত্মরক্ষা করতে পারলুম না।

মামা বললেন: মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও গোপাল। মিস্টার ব্যানার্জি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আবার মিস্টার ব্যানার্জি বলছ।

ভদ্রলোক আপত্তি করলেন।

গভীর ভাবে মামা ধোঁয়া নিচ্ছিলেন, উত্তর দিলেন না।

মিস্টার ব্যানার্জি বললেন : তুমি আমাকে নীতীশই বোলো। দূরত্বটা তো সম্বন্ধের নয়, সেটা কালের। কালের দূরত্বকে অতিক্রম করতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না।

ভদ্রলোকের ইংরেজী শব্দপ্রীতি লক্ষ্য করলুম। বাঙলার ভেতর এত ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করছিলেন যে সংলাপ পুরোপুরি ইংরেজী হলেই বোধহয় সহজবোধ্য হত।

কথা না বলে এবারেও মামা মাথা নাড়লেন।

আপনারা যাবেন না ?

মামার দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্ন করলুম।

মামা এবারে তাঁর পাইপ নামালেন মুখ থেকে। বললেন : তোমার মামীকে নিয়েই হয়েছে বিপদ। হঠাৎ তাঁর শরীরটা বিগড়ে বসেছে।

সেকি !

আমি আশ্চর্য হলুম।

মামা বললেন : যাবার সমস্তই ঠিক। পার্লামেণ্ট থেকে ফিরে এই বিপদ দেখছি।

মিস্টার ব্যানার্জি উদ্বিগ্ন হলেন না। মনে হল, এ খবর তিনি আগেই পেয়েছেন। এবং তাঁর উদ্বেগের কারণও ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন হলুম। সরাসরি ভেতরে চলে গেলুম মামীমার খোঁজে।

চাদর জড়িয়ে মামী বিছানায় শুয়ে ছিলেন। ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে বললেন : বোসো।

আমি তাঁর পায়ের কাছে বসলুম।

আমায় আরও একটু কাছে ডেকে চুপিচুপি বললেন : তোমরাই যাও। ওদের সাহেবিআনার ভেতর আমাকে ডেকো না।

মামীর অসুখের কারণ আমি বুঝতে পারলুম। তিনিও লুকোলেন না, বললেন : শুনলাম, ওদের বেয়ারা বাবুর্চি সব মুসলমান।

বিচিত্র নয়ঃ আমি জবাব দিলুমঃ ওঁরা বিলেতফেরৎ সাহেব মানুষ।

ঠিক বলেছ।

মামী উৎসাহ পেলেন, বললেনঃ তোমার মামাকে দেখো। এক কথায় তুমি যা বুঝলে, তোমার মামার মাথায় তা ঢুকছে না। সকাল থেকেই নানা ওজর আপত্তি।

মামার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমি সঙ্গত মনে করলুম না। মামী নিজেই বললেনঃ বলছেন, বিলেত গেলেই কি জাত যায়? তারপর বলছেন, কী ভাববে আমাদের বল তো। জমিদার বলে তো সারাজীবন ঘৃণা করেছে, এসব করলে কি আর মেলামেশা করবে?

মামার এ দুর্বলতার কথা আমি জানি। গোলামী করে যে যুগে সরকারের খেতাব পাওয়া যেত, সেই যুগের রায়সাহেব মামা। আর গোলামী তো সরকারের করতে হত না, গোলামী সরকারের দেশের লোকের। মিস্টার ব্যানার্জিরা যখন বোনার্জি লিখতেন। শ্রীকান্ত লিখত এস, কেণ্ট।

এসব কথা মামীর অজানা নেই। বললেনঃ নাই বা করল মেলামেশা। ওরা কি আমাদের স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করে দেবে?

এ কথার উত্তর আমার তৈরি ছিল। কিন্তু দিলুম না। বড় অশিষ্ট শোনাত, বড় উদ্ধত। ওঁরা কী করবেন জানি না, কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি তাঁদের মেয়ে নেবেন। সমাজে তাঁর ছেলের প্রতিষ্ঠা আছে, ঘরে পয়সা আছে। মেয়ে তাঁদের সুখে থাকবে। এই কথাটি মামী ভুলে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারলুম না।

স্বাতি কোথায়?

আমি প্রশ্ন করলুম।

চান করছে।

বলে মামী চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ আর কথা কইলেন না।

আরও খানিকক্ষণ বসে থেকে আমি উঠে পড়লুম।

মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে আমাদের বেরিয়ে পড়তে সময় লাগল না। মামা আমাদের গাড়িতে তুলে দিলেন। আজ প্রথম আমি তাঁর মুখ দেখে মনের ভাব বুঝতে পারলুম না। মনে হল, মনে তাঁর একটি মাত্র ভাব নেই, একাধিক চিন্তায় তিনি আজ পীড়িত হচ্ছেন। আমরা পেছনে বসলুম। মিস্টার ব্যানার্জি বসলেন সামনে ড্রাইভারের পাশে।

খানিকটা এগিয়ে মিস্টার ব্যানার্জি আমার সঙ্গে গল্প শুরু করলেন। বললেন: উৎসবটা কবে হচ্ছে?

কিসের উৎসব আমি বুঝতে পারলুম। পোষ্যপুত্র নেবার উৎসব ছাড়া আর কী হতে পারে। বললুম: সামনের সপ্তাহেই বোধহয় দিন পড়বে।

মিস্টার ব্যানার্জির ঠোঁটের সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছিল। কেস থেকে আর একটা সিগারেট বার করে মুখের টুকরোটাতেই জ্বালিয়ে নিলেন।

খুব ধূমধাম হবে নিশ্চয়ই।

মিস্টার ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন।

বোধহয় না।

আমি উত্তর দিলুম।

কেন?

মিস্টার ব্যানার্জি আশ্চর্য হলেন।

অনেক বার তো ধূমধাম করে দেখলেন: আমি জবাব দিলুম: একবারও ফল ভাল হল না।

হুঁ।

বলে তিনি চুপ করে রইলেন।

গায়ে পড়ে গল্প করবার বয়স আমাদের নয়। একবার আমি স্বাতির দিকে ও আর একবার স্বাতি আমার দিকে চেয়ে দুজনেই চুপ করে বসে রইলুম।

এক সময় মিস্টার ব্যানার্জি আবার প্রশ্ন করলেন: তুমি তো দিন কয়েক সেখানে কাটিয়ে এলে, তোমার কী মনে হয়?

তিনি কী জানতে চাইছেন, তা তাঁর প্রশ্নে স্পষ্ট হল না। নিজেও তা বুঝতে পারলেন। বললেন: আমি তাঁর পরিবারের কথা জানতে চাইছি। ছেলেপিলে কেন বাঁচে না সেই কথা।

তাঁর দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কী বলব!

আমি জবাব দিলুম।

মিস্টার ব্যানার্জি হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। পিছন ফিরে বললেন: ভাগ্যে তুমি বিশ্বাস কর?

না করে উপায় কী?

আমি জবাব দিলুম। ইচ্ছে করেই এ কথা বললুম। এই জবাব পেয়ে তিনি খুশী হবেন জানলে এ কথা বলতুম না।

এ যুগের ছেলে হয়ে তুমি ভাগ্যে বিশ্বাস করবে, আমার জানা ছিল না: মিস্টার ব্যানার্জি আমাকে ধিক্কার দিলেন, বললেন: ভাগ্যকে তোমরা গড়ে তুলবে, আমি এই আশা করি তোমাদের কাছে।

বললুম: সঙ্গত ভাবেই তা করেন। এবং আমরাও নিজেদের ভাগ্য গড়ব। তবে সেদিন আসতে এখনও দেরী আছে।

দেরী কিসের?

মিস্টার ব্যানার্জি জানতে চাইলেন।

সত্য কথাটা আমার মুখে এসে গেল। চেষ্টা করেও চাপতে পারলুম না। বললুম: ক্ষমতা যেদিন আমাদের হাতে আসবে, সেদিন আমরা নিজেদের ভাগ্য গড়ব।

ভদ্রলোক আবার চমকে উঠলেন, বললেন: তুমি কি—

আপনি চিন্তিত হবেন না: আমি তখুনি উত্তর দিলুম: রাজনীতিতে আমার বিশ্বাস নেই। রাজনীতির চর্চা আমি করি না।

এ রকম কথা তো—

মিস্টার ব্যানার্জি কথাটা শেষ করলেন না।

বললুম : আপনিই বলুন, কী নিয়ে আমরা ভাগ্য গড়ব। আমাদের সঙ্গতি কী! শুধু বিদ্যা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে যদি ভাগ্য গড়া সম্ভব হত, তা হলে দেশে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ত না। শিক্ষার তো প্রসার হচ্ছে প্রতিদিন!

হেসে বললুম : দেখুন না একবার আমার অদৃষ্ট! গরিব মাস্টারের ছেলে, করি কেরানীগিরি। মামাবাবুর মুখে যা শুনছি, তা তো অর্ধেক রাজত্ব পাবার মতন। তারপর আজ নেমন্তন্ন খাব আপনার বাড়ি। আপনারই গাড়ি চড়ে যাচ্ছি।

স্বাতি হাসছিল মিষ্টি মিষ্টি করে। আমি আমার বক্তব্য শেষ করলুম : বাঙলাদেশে তো ঢের লোক আছে আমার মতন। কই, তাদের ভাগ্যে তো এসব জোটে না।

মিস্টার ব্যানার্জি এবারে স্বীকার করলেন, বললেন : তা ঠিক। তুমি এ কথা বলতে পার বটে।

স্বাতির দিকে চেয়ে আমিও একটুখানি হাসলুম।

মিস্টার ব্যানার্জির সরকারী কোয়ার্টার দূর নয়। গল্পে গল্পে কোথা দিয়ে তাঁর বাড়ি পৌঁছে গেলুম, অন্ধকারে তা টের পেলুম না। রাণা ও মিত্রা বাইরেই অপেক্ষা করছিল। গাড়ির শব্দ পেয়েই এগিয়ে এল।

শুধু আমাদের দুজনকেই আশা করছিল কিনা জানি না। কতকটা নির্লিপ্তভাবে রাণা বলল : ওঁরা এলেন না।

উত্তর আমি দিলুম, বললুম : ওঁদের শরীর ভাল নেই।

কোন অসুখ করেনি তো?

মিত্রা প্রশ্ন করল।

বললুম : সে রকম কিছু নয়। তবে বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন ছিল।

রাণা সমর্থন করে বলল : তা বটে।

মিস্টার ব্যানার্জি অপেক্ষা করলেন না। বললেন : তোমরা গল্প কর।

বলেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন

মিত্রাকে অনুসরণ করে আমরা তাদের বসবার ঘরে এলুম।

আসন গ্রহণ করে রাণা বলল: তারপরে চাওলার সঙ্গে বেড়িয়ে এলেন তো!

এলুম বৈকি!

আমি জবাব দিলুম।

কেমন লাগল

রাণা জানতে চাইল।

অনেকদিন এমন আনন্দ পাইনি: আমি উত্তর দিলুম: মনে হল যেন এক নতুন রাজ্যে গেছি, নতুন জীবন পেয়েছি সেখানে। তাই না স্বাতি?

রাণা চমকে উঠল, বলল: আপনিও গিয়েছিলেন নাকি!

উত্তরে স্বাতি শুধু হাসল। বিজয়িনীর হাসি। তাকাল মিত্রার দিকে।

মিত্রার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হল, কিন্তু উত্তর দিল না।

আমি বললুম: অনাহারে অর্ধাহারে থেকেও যে পুরুষ ও নারীর জীবন এমন মধুর হয়, এ আমার জানা ছিল না। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসও করতুম না। অভাববোধ নেই, অভিযোগ নেই কারও ওপরে। কী সুখী ওরা, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।

মনোযোগ দিয়ে মিত্রা শুনছিল, বলল: আমাদের কি অভাববোধ বেশি, না অভিযোগ সবার ওপরে?

হেসে বললুম: ভুল হল। আপনাদের অভাব নেই বলেই অভাববোধ নেই। আর অভিযোগ জানাবার সুযোগও আপনাদের মেলে না। তার আগেই ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমি যাদের কথা বলছি, তারা দু বেলা খেতে পায় না, কাপড় নেই সারা গা ঢাকবার। এসব যারা কেড়ে নিচ্ছে, তাদেরও তারা ভালবাসে।

মিত্রা একটা কটাক্ষ করে বলল: আপনার সঙ্গে চাওলার বেশ মিল আছে দেখছি।

বললুম : চাওলার সঙ্গে কেন, সব মানুষের সঙ্গেই আছে। মানুষ তো সহানুভূতিশীল। নিজের দুঃখেই তার দুঃখ নয়, পরের দুঃখেও তার সমান দুঃখ।

আমার জন্যে আপনার দুঃখ হয় ?

মিত্রা জানতে চাইল।

বললুম : হয় বৈকি।

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলুম। মিত্রা আর একটা প্রশ্ন করে আমায় থামিয়ে দিল, বলল : আমার কোন দুঃখ আছে ভাবেন ?

কেন ভাবব না ? : আমি উত্তর দিলুম : আপনার দুঃখ তো আরও গভীর, আরও মর্মান্তিক। জীবনে কী করবেন, আপনি ভেবে পাচ্ছেন না। এই জিজ্ঞাসা আপনাকে সারাক্ষণ পীড়া দিচ্ছে।

স্বাতি কোন কথা কইল না। রাণা এতক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে ছিল, এবারে বলল : আপনি কি কখনও গণৎকারের কাজ করেছেন গোপালবাবু ?

আমি হাসলুম তার কথা শুনে, বললুম : মানুষ মাত্রেই গণৎকার, অন্তর্যামীও বটে। মানুষ বলতে আমি গোটা মানুষটাকেই বোঝাচ্ছি, ভগবানের তৈরি মানুষ। সভ্যতার হাসপাতালে হৃদয়-কেটে-বাদ-দেওয়া মানুষ নয়।

ওরে বাবা : রাণা ভয় পেল : এসব যে বড় বড় কথা হচ্ছে।

তারপর স্বাতির দিকে ফিরে বলল : আসুন স্বাতি দেবী, আমরা সহজ কথা বলি।

স্বাতি আগ্রহ দেখাল, বলল : ঠিক বলেছেন, গোপালদার কথাই শুধু বড় বড়।

বলে কটাক্ষে আমার দিকে চাইল।

ওটা বাঙালীর উত্তরাধিকার।

আমি জবাব দিলুম।

রাণাও হাসল আমার কথা শুনে, বলল : তা যা বলেছেন। বাঙালী এক সময় ভালই বলত।

স্বাতি আপত্তি করল, বলল : এখনই বা মন্দ কী বলে।

বলেই আমার দিকে চাইল।

আজ স্বাতির ব্যবহারে আমি বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। তার সকালের আচরণের সঙ্গে সারাদিনের ব্যবহারের কোন সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছিনে। আজকের এই স্বাতিই তো আমার চিরকালের চেনা মেয়ে। সকালবেলার স্বাতিকেই আমার অচেনা মনে হয়েছিল। তবু আমি সহজ হতে পারলুম না। আমার বুকের ভেতর একটা কাঁটা বিঁধে আছে।

মিত্রা এসব কথায় কান দিল না। বলল : আপনি আমার সম্বন্ধে যে কিছু ভেবেছেন, তা বুঝতে পারছি। আমার জিজ্ঞাসা কি শুধু আমারই জিজ্ঞাসা ?

বললুম : তা কেন হবে, কিন্তু লোকে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

কেন বলতে পারেন ?

মিত্রা জিজ্ঞেস করল।

না ভেবেই আমি উত্তর দিলুম : লোকের ভাববার ধৈর্য নেই বলে।

মিত্রা আরও কিছু শোনবার অপেক্ষা করছিল। বললুম : গতানুগতিকতা এই যুগটাকে পেয়ে বসেছে। ভেড়ার পালের মত আমরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলেছি। দল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেই বিপদ। তখুনি আসে নানারকমের জিজ্ঞাসা।

রাণা স্বাতির দিকে ফিরে বলল : দর্শন আলোচনা হচ্ছে। আসুন, আমরা অন্য কিছু বলি।

স্বাতি বলল : সেই ভাল।

কিন্তু চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

কেন এমন হয় বলতে পারেন ?

মিত্রা আমাকে জিজ্ঞেস করল।

এমন হওয়াটাই তো স্বাভাবিক : আমি উত্তর দিলুম : প্রতিবাদ আগেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে, কিন্তু প্রতিবাদ জানাবার অধিকার ছিল না। এখন আমরা সেই অধিকার সঞ্চয় করছি। ধর্মের বিরুদ্ধে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনীতির বিরুদ্ধে এমনকি সমস্ত রকমের সংস্কার ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। কোন্‌টা ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তার বিচার আমরা করছি না। কিছু পরিবর্তন হলেই তা মঙ্গল আনবে, এই আমাদের ধারণা।

কিন্তু দুঃখ কিসের জানেন ? : একটু থেমে আমি আবার বললুম : দুঃখ এই যে আমাদের মেষপালক বদলেছে। কিন্তু তাদের নীতির বদল হয় নি। এখনও আমরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে চলেছি, আর দুধারে লাঠি হাতে চলেছে মেষপালকরা। দল থেকে কেউ খসে পড়লেই লাঠির আঘাতে তাকে দলভুক্ত করা হচ্ছে। বেশি বেয়াড়ামি করলে রাস্তার ধারে ফেলেই চলে যাচ্ছে। দলের ভেতর বিদ্রোহী ভেড়া তারা চায় না। আত্মসচেতন মানেই তো বিদ্রোহী।

এই সময়ে বেয়ারা এসে রাণাকে ডেকে নিয়ে গেল।

মিত্রা বলল : আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করতে পারেন ?

বললুম : সর্বনাশ! যে কথা ভেবে সমস্ত দেশের বড় লোকরা হিমসিম খেয়ে গেল, তার নির্দেশ দেব আমি! অমন ধৃষ্টতা আমার নেই।

মিত্রা একটু কঠিন ভাবে জিজ্ঞেস করল : তবে আপনি কী করবেন ?

আমি ? : আমি উত্তর দিলুম : আমার প্রয়োজন যেদিন হবে, সেদিন আমি এগিয়ে আসব। কোন ভার পেলে সে দায়িত্ব বহন করব। সেই শক্তি আমি সঞ্চয় করছি।

প্রসন্ন মেজাজে রাণা ফিরে এল। মিত্রার পাশে বসে বলল : অমনি অমনি করব না, কী খাওয়াবি বল্‌।

মিত্রা কোন উত্তর দিল না।

রাণা বলল: আচ্ছা ঠিক আছে, খাবার পরেই হবে।

খাবার পরেই সেই কথা হল। অনেকক্ষণ রহস্য করে রাণা সেই প্রস্তাব উপস্থিত করল। মিত্রাকে বিবাহের প্রস্তাব। এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত না থাকলেও মনে আশঙ্কা ছিল। তাই আকাশ থেকে পড়ার মত করুণ অবস্থা হল না। বললুম: কঠিন কথা। ভেবে দেখবার কথা। রাণা উচ্ছ্বসিত ভাবে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। মিত্রা তাকে থামিয়ে দিল।

বললুম: মনে হয় এলাহাবাদে এই প্রস্তাব পাঠানো উচিত।

হাসতে হাসতে রাণা বলল: প্রসঙ্গটা সেইখান থেকেই এসেছে। জ্ঞানশঙ্করবাবু নিজেই আপনার সংবাদ দিয়েছেন।

পূর্বাপর অনেকগুলো ঘটনা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। অনেক প্রশ্নের মানে এবারে সহজ হয়ে গেল। বললুম: আমার একজন আত্মীয় আছেন। জীবনে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমি একটা পরামর্শ করতে চাই।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই: রাণা জবাব দিল: বাবা নিজেই তাঁদের বলেছেন। তাঁদের মতেরও দরকার আছে বৈকি।

রাণার কথা আমি সমর্থন করলুম না, প্রতিবাদও জানালুম না। বললুম: আজ আসি তা হলে।

বড় গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার অপেক্ষা করছিল। মিত্রা এল না, রাণা একাই আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল।

২১

আগ্রা স্টেশন কখন এসেছি কখন ছেড়ে গেছি খেয়াল করিনি। যমুনার পুলের ওপর ট্রেন উঠতে চমকে উঠলুম। শুধু পুলই তো নয়, নিচে যমুনার সেই নীল ধারা। একদিকে শুধু বালি। আর এক ধার দিয়ে সেই শীর্ণ ধারা এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে। এপারে আগ্রা শহর আর ওপারে যমুনা ব্রীজ স্টেশন। দক্ষিণের জানালা দিয়ে আরও একটা রেলের পুল দেখা যাচ্ছে। ওর ওপর দিয়েও বড় লাইনের গাড়ি চলে। আগ্রা ফোর্ট ইদগা হয়ে আগ্রা ক্যান্টনমেণ্ট যায়। আমরা সেই ক্যান্টনমেণ্ট ছেড়ে রাজা-কি-মণ্ডি আগ্রা সিটি হয়ে যমুনা ব্রীজ যাচ্ছি। আরও একটু এগিয়ে তাজমহল দেখতে পেলুম। যমুনার ওপর শাহজাহানের তাজমহল।

তাজমহল দেখেছিলুম ললিতা বৌদির সঙ্গে। শুধু দিনেই নয়, রাত্তিরেও। দিল্লী যাবার পথে তুদিনের জন্য আগ্রায় নেমে পাঁচদিন আটকা পড়েছিলুম। যাবার দিন ললিতা বৌদি বললেন : এ আপনার ভাল হচ্ছে না ঠাকুরপো। আজ সোমবার, পূর্ণিমা সামনের বিষ্যুৎ-বারে। পূর্ণিমায় তাজমহল না দেখে কেউ আগ্রা ছেড়ে যায়?

বললুম : আমার পূর্ণিমা হবে দিল্লীতে।

তা জানি ঠাকুরপো : বৌদি হেসে ফেললেন : ও পূর্ণিমা তো সারাবছর। তার জন্যে আকাশের পূর্ণিমা কেন নষ্ট করবে?

তর্কে হেরে গেলুম। কিন্তু হেরে গিয়েও ভাল লাগল। তুদিন মাত্র আগে আগ্রায় এসে যখন নেমেছিলুম তখন এই ললিতা বৌদির নামও আমি জানতুম না। আজ তাঁর অনুরোধ আমি ফেলতে পারলুম না। কোনদিন পারব বলেও মনে হয় না। আমার স্মৃতির খাতায় নাম তাঁর পাকা হয়ে গেছে।

আমি এসেছিলুম জ্ঞানশঙ্করবাবুর বোনের বাড়ি। বোনের উপযুক্ত ছেলেকে কর্তা পোষ্য নিয়েছিলেন। সেই ছেলে আজ বেঁচে নেই। কিন্তু বৌদি আছেন। বিধবা ললিতা বৌদি।

কর্তার বোনকে আমি মাসিমা বলেই ডাকলুম। তিনি আমায় বুকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। অবিশ্রাম কান্না। দুবছর আগে তাঁর ছেলে মারা গেছে। মনে হল, দুবছরের জমা কান্না।

কিন্তু ললিতা বৌদিকে কাঁদতে দেখলুম না। যা দেখলুম, তা প্রসন্ন হাসি। এতটুকু দুঃখের ছোঁয়া তাতে নেই। বললেন: আগ্রা দেখেছেন ঠাকুরপো? দেখেননি? বেশ হয়েছে। আপনার সঙ্গে আমারও কিছু বেড়ানো হবে। ঘরের ভেতর একাএকা হাঁপিয়ে উঠেছি।

গলা নামিয়ে বললেন: বাড়ির অবস্থা তো দেখছেন। শ্বশুর দোকান নিয়ে ব্যস্ত, আর ইনি—

বলেই বৌদি চুপ করলেন।

ধবধবে সাদা থান পরা বৌদি। বয়স কতই বা হবে, আমার চেয়ে নিশ্চয়ই কম। আমি তাঁর অলক্ষিতে একবার ভাল করে তাঁকে দেখলুম। প্রাণশক্তি কি তাঁর ঝিমিয়ে গেছে? না, সেই শক্তি তিনি দাবিয়ে রেখেছেন? ঠিক বুঝতে পারলুম না।

এতবড় বাড়িতে মানুষ মাত্র দুটি। মাসিমা আর ললিতা বৌদি। মেসোমশাই তো ব্যবসা নিয়েই সারাক্ষণ মেতে আছেন। কিন্তু কার জন্য এত পরিশ্রম? মাসিমা নাকি মাঝে মাঝেই এই প্রশ্ন করেন। পরিশ্রম কি মানুষের জন্য? মেসোমশাই তার উত্তর দেন। ও তো একটা অভ্যাস। নেশার মত পরিশ্রমের অভ্যাসও মানুষকে পেয়ে বসে। কাজেই বাড়িতে থাকেন দুটি মানুষ। মাসিমা আর ললিতা বৌদি। মাসিমা কাঁদেন, ললিতা বৌদি কী করেন জানতে এখনও বাকি আছে।

কী ভাবছেন ঠাকুরপো?

প্রশ্ন করলেন ললিতা বৌদি।

বললুম: আপনার কথাই ভাবছি।

সর্বনাশ!: বৌদি হেসে উঠলেন খিল খিল করে: দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসে আপনিও কি চোখের জল ফেলছেন আমার জন্যে?

ভয় নেই বৌদি: আমি উত্তর দিলুম: চোখে আমার জল নেই। থাকলে হয়ত সুবিধে হত। সময়ে অসময়ে কাজে লাগাতে পারতুম।

বৌদি খুশী হলেন, বললেন: যা বলেছেন। আমিও মাঝে মাঝে ওটার অভাব অনুভব করি। মাঝে মাঝে এক-আধ ফোঁটা ফেলতে পারলে কিছু বদনামের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতাম।

বদনাম কিসের?

জিজ্ঞাসা করতে আমার দ্বিধা হল না।

এখনও শোনেননি নাকি?

আশ্চর্য হলেন ললিতা বৌদি।

আমিও আশ্চর্য হলুম, বললুম: দুটোদিন তো এসেছি, মেলামেশাও করিনি কারও সঙ্গে। বদনাম শুনব কোথায়?

বৌদি বেশ উপভোগ করলেন আমার কথা, বললেন: একে-বারেই ছেলেমানুষ আছেন দেখছি।

তা সত্যি: আমি স্বীকার করলুম: সংসার নেই, সংসারের অভিজ্ঞতাও আমার হয়নি।

না না, আমি তা বলছি না: বৌদি লজ্জা পেলেন: দেখছেন না আমার শাশুড়িকে। সারাদিন সকলের সামনে কাঁদছেন। তাঁরই পাশে আমার চোখ শুকনো। আমি কাঁদতে পারিনে। আপনি বদনাম করবেন না?

বলেই উত্তর চাইলেন আমার কাছে।

চোখের জল কি মন থেকে আসে?

আমি প্রশ্ন করলুম।

বৌদি বললেন: আমিও তো সেই কথাই জানতে চাই।

আকাশের জলের উৎস জানি মেঘ। ঠাণ্ডা পেলেই ঝরে পড়ে। আমার মনে কি মেঘ নেই?

একটু যেন অন্যমনস্ক হয়েছিলেন বৌদি, পরক্ষণেই সামলে নিলেন, বললেন: কী ভুলই করছি বলুন। চোখের জল কোথা থেকে আসে না জেনেই তর্ক করছি। আপনি জানেন ঠাকুরপো?

বললুম: জানি না, ভেবেও দেখিনি কোনদিন।

ভেবে দেখা আমাদের উচিত, তাই নয় কি?

বৌদি আমাকে যেন উপদেশ দিলেন।

হঠাৎ আমার মনে হল, গলাটা যেন ভিজে ভিজে ঠেকছে। ঢোক গিলতে কনকন করে উঠল কণ্ঠনালীটা।

বৌদি হেসে ফেললেন, বললেন: আপনিও ছেলেমানুষ দেখছি।

ছেলেমানুষির কী দেখলেন?

আমি জানতে চাইলুম।

বৌদি বললেন: চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ছলছলিয়ে উঠল কেন?

আপনার ঈগলের দৃষ্টি।

আমি উত্তর দিলুম।

তার চেয়ে আসুন: বৌদি পরামর্শ দিলেন: বেড়াবার একটা প্রোগ্রাম করি। আগ্রার ধোঁয়া আর ধুলোই তো শুধু দেখলেন। সত্যিকার আগ্রারও দেখুন কিছু।

বললুম: যেতে যখন দেবেন না, তখন দেখেই যাই কিছু। কিন্তু কী দেখাবেন বলুন তো।

বৌদি বললেন: বিনি পয়সায় গাইডের কাজ করতে পারব না। এখানে সরকারী গাইডের ফী কত জানেন? সারাদিনের জন্যে বার টাকা, আর এক বেলার জন্যে আট। শুধু ফোর্ট দেখাতেই আড়াই টাকা, চার জনের বেশি হলে পৌনে চার, আর পাঁচটাকা দিতে হবে আট জনের জন্যে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাইড নিলে অবশ্য আদ্ধেক খরচ। রাজী আছেন?

বলে বৌদি হাসতে লাগলেন।

আমি বললুম : এ আপনার যোগ্য ফী হল না।

তবে মোটা রকমেরই কিছু দেবেন।

তারপরেই বললেন : কিন্তু বেরবার মতটা আপনাকে আদায় করতে হবে।

বৌদির মুখের দিকে চেয়ে আমি বললুম : আচ্ছা।

দুপুরে মেসোমশাই যখন খেতে এসেছিলেন, বেড়াবার মত আমি চেয়ে নিলুম। বৌদিকে সঙ্গে দিতে মাসিমার কিছু আপত্তি ছিল। বৌদি তখুনি তা মেনে নেওয়াতেই মাসিমা রাজী হয়ে গেলেন।

একখানা টাঙ্গায় বসে বৌদি হেসেই আকুল।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম : অত হাসি কিসের বৌদি ?

আমার শাশুড়িকে দেখলেন তো।

বৌদি জবাব দিলেন।

বললুম : তা তো দেখলুম, কিন্তু অত হাসবার কী আছে ?

হাসি না থামিয়েই বৌদি বললেন : আপনি নিতান্তই ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষ বললে রাগ করব, সে বয়স আমার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই বললুম : এবারে গড়ে পিটে একটু মানুষ করে নিন।

তাই করতে হবে দেখছি।

বৌদি জবাব দিলেন। একটু থেমে বললেন : আমার শাশুড়ির সন্দেহটা লক্ষ্য করেন নি ? তিনি ঠিক টের পেয়েছিলেন যে আপনাকে যেতে না দিয়ে বেড়াবার ফন্দিটা আমিই দিয়েছি। তাইতেই তাঁর আপত্তি ছিল আমাকে বেরতে দেবার। তখুনি আমি তাঁর মতে মত না দিলে তিনি আপনার সঙ্গে একজন দোকানের কর্মচারী দেবার প্রস্তাব করতেন। কর্তা ভাবতেন, দোকানে একজন কর্মচারীর প্রয়োজন আপনার বেড়াবার প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি। সেই

কথাটি প্রকাশ করে ফেললেই বিপদ। শাশুড়ি ঠাকরুণের মতে দোকান করাটাই এই সংসারের সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজ। কাজেই কুরুক্ষেত্র বাধত।

বললুম: ঠিক এই কথা আমি আর কার মুখে শুনেছি মনে করতে পারছিনে।

আমাদের কথা?

বৌদি আশ্চর্য হলেন।

বললুম: আপনাদের না। শুনেছি অন্য কোনও পরিবারের কথা। গিন্নী ভাবেন তাঁর তদারকের জন্যেই সংসারটা চলছে। আর কর্তার উদয়াস্ত খাটুনি তাঁর স্বভাবের দোষে। সংসারের কুটোটি ভেঙে যিনি কাটি করেন না, সংসারের জন্যে তাঁর আবার প্রয়োজন কী?

পাশে চেয়ে দেখলুম, বৌদির মুখের হাসি হঠাৎ মিলিয়ে গেছে। অতর্কিতে তাঁর কোথায় আঘাত দিয়ে ফেলেছি জানি না। দুঃখ হয় নিজের অসাবধানতার জন্যে। বললুম: আগ্রা বড় নোংরা শহর, তাই না বৌদি?

বৌদি সামলে নিয়েছিলেন নিজেকে। বললেন: এ কি আজকের শহর ঠাকুরপো। এ শহর মোগল বাদশাহদের তৈরি।

বললুম: সর্বনাশ! আপনারও দেখছি পুরাতত্ত্বের জ্ঞান টন্‌টনে।

বৌদি হেসে বললেন: কার কথা মনে পড়ল?

আমিও হেসে জবাব দিলুম: স্বাতির।

স্বাতির নাম তো শুনিনি ঠাকুরপো: বৌদি উত্তর দিলেন: এ আবার কে?

বললুম: একটি মেয়ে।

আকাশের তারা যে নয় তা তো বুঝতেই পারছি: বৌদি বললেন: মুঠোর ভেতর, না নাগালের বাইরে?

নিজের বোন কিনা জিজ্ঞেস করলেন না?

আমি তাঁকে প্রশ্ন করলুম।

আমার এটুকু খবর বৌদি রাখেন, বললেন : আত্মীয় আপনার যে কেউ নেই, সে কথা আমরা জানি। বলুন এবারে।

বললুম : কী হলে মুঠোর ভেতর বলে, তা জানতে যে বাকি আছে বৌদি ?

বৌদি হেসে বললেন : ভগবানের এমনি মায়া যে ঐ জ্ঞানটিই চেষ্টা করে অর্জন করতে হয় না। প্রেমের কোনও শাস্ত্র নেই, ব্যাকরণ নেই। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার অবকাশ এর ভেতর নেই।

বলেই আমার দিকে চেয়ে ধমক দিলেন, বললেন : দেরী করবেন না।

হেসে বললুম : এই ঝাঁকির ভেতর স্বাতির গল্প ঠিক জমবে না। তার ওপর পূর্ণিমা পর্যন্ত যখন আছি—

অতদিন অপেক্ষা করব আমি ?

বৌদির পছন্দ হল না আমার প্রস্তাব।

বললুম : তার আগেই না হয় বলব। এখন থাক্।

আরও খানিকটা এগিয়ে আমি বললুম : মহাভারতে এক শহরের নাম পেয়েছিলুম 'অগ্রবণ'। পণ্ডিত মশাই তার মানে বলেছিলেন বনস্য বৃন্দাবনস্য অগ্রম্ ইতি। তাঁর মতে এই আগ্রাই মহাভারতের অগ্রবণ। টোলেমির ম্যাপ আমি দেখিনি। কিন্তু শুনেছি যে তাতে আগারা নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে।

বৌদি বললেন : আমার ভুল ধরলেন, এই তো। কিন্তু মুখ্যু-মেয়ের ভুল ধরে কি আপনার গৌরব বাড়বে ঠাকুরপো ?

আমি লজ্জিত হয়ে বললুম : ছি ছি। আপনি একি বলছেন। আমি বিদ্যার বড়াই করব আপনার কাছে।

তবে ?

বৌদি জানতে চাইলেন।

বললুম : এসব আমারই উদ্ভট সখ।

পাহাড়ী ঝর্ণার মত খিল খিল করে হেসে উঠল ললিতা বৌদি। তাঁর হাসির উচ্ছ্বাসে আমি বিভ্রান্ত হয়ে গেলুম।

শুধু শুধু বেচারি স্বাতির দোষ দিচ্ছিলেন। পুরাতত্ত্বের সখ স্বাতির, না আপনার?

হেরে গিয়েও আমি হার স্বীকার করতে রাজী হলুম না। বললুম: জাতের জন্যে ওকালতি করছেন বুঝি?

বৌদি তখুনি উত্তর দিলেন, বললেন: আক্রমণ করতে হয়, সামনে করুন। আড়ালের মানুষকে টানাটানি করলে আমি আপত্তি করবই।

বললুম: ঘাট হয়েছে, আর করব না।

বৌদি খুশী হয়ে বললেন: তবে বলুন আপনার পুরাতত্ত্বের কথা।

বললুম: সব কথা কি মনে আছে? তবে যতদূর জানি, বর্তমান আগ্রার পত্তন করেন সিকন্দর লোদী। দিল্লী থেকে যমুনার স্রোত বেয়ে যখন নেমে আসেন, এই স্থানটি তাঁর পছন্দ হয়। পছন্দ হতেই নতুন রাজধানী স্থাপন করলেন। কিন্তু বাদ সাধলেন ভগবান। বছর না ঘুরতেই ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ল সেই রাজধানী। বাদশাহ তবু দমলেন না, নতুন করে আবার রাজধানী গড়লেন।

বৌদি বললেন: আমরা কত ভুল জানি দেখুন। আগ্রার প্রায় সবাই বলে যে এই শহর ছিল আকবর বাদশাহর।

বললুম: সে কথাও মিথ্যে নয়। যে কেল্লায় আমরা যাচ্ছি সে তো আকবর বাদশাহরই তৈরি। তাঁর সময়েই ছিল আগ্রার চরম সম্মান। কিন্তু মোগল বাদশাহরা তার আগেও এ শহরে ছিলেন। যমুনার পরপারে শুনেছি এক আরামবাগ আছে, বাবরের তৈরি বাগান।

বাধা দিয়ে বৌদি অন্য কথা বললেন: আমরা রামবাগ বলি। জাহাঙ্গীর বাদশাহ নাকি নূরজেহানের জন্যে তৈরি করেছিলেন। কাবুলের কী একটা বাগানের ঢঙে তৈরি।

পরক্ষণেই বললেন: যমুনার ওপারেও একদিন যেতে হবে।

রামবাগ বা চিনি-কা-রৌজা না দেখলে ক্ষতি নেই, ইৎমদ-উদ-দৌলা দেখবার জিনিস!

ইৎমদ-উদ-দৌলার নাম আমি শুনেছি। ছ বছর ধরে নূরজেহান নির্মাণ করেছিলেন তাঁর মা ও বাপ মির্জা ঘিয়াস বেগের কবর। বিরাট বাগানের মাঝখানে লাল পাথরের বেদীর ওপরে শাদা মার্বল পাথরের অপূর্ব অট্টালিকা। মমতাজ বেগমের বাপ মায়ের কবরও নাকি এইখানে।

চিনি-কা-রৌজার নাম আমি শুনিনি।

আমি স্বীকার করলুম।

বৌদি বললেন: না শুনলে ক্ষতি নেই কিছুই। যমুনার পুল পেরিয়ে বাঁ দিকে আলিগড়ের রাস্তা ধরলে বাঁহাতে প্রথমে ইৎমদ-উদ-দৌলা, তারপর চিনি-কা-রৌজা, আর রামবাগ। সবই কাছাকাছি, শাহজাহানের প্রধান মন্ত্রী আফজল খানের কবর এই চিনি-কা-রৌজায়।

গল্পে গল্পে কখন আমরা ফোর্টের গেটে পৌঁছে গেছি খেয়াল করিনি। খেয়াল হল টাঙ্গাওয়ালার কথায়, বলল, কাছেই আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

এই হল অমর সিং গেট।

বৌদি আমাকে দেখালেন, বললেন: সোজা উঠে গেলেই দেওয়ানি আম।

গাইডরা ছেঁকে ধরেছিল। বললুম: ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড ক্লাসে আমার চলবে না, আমার স্পেশাল ক্লাস চাই।

বলে বৌদির দিকে তাকালুম।

বৌদি বললেন: দেখি চেষ্টা করে।

দেখালেনও সব। দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, মতি মসজিদ, নাগিনা মসজিদ, সাম্মন বুর্জ আর হাম্মন শাহী, যার চলতি নাম শিশমহল। তারই সঙ্গে দেখালেন খাসমহল আর জেহাঙ্গিরী-

মহল। পাকা গাইডের মত সমস্ত সংবাদ দিলেন। দেওয়ানি আমে প্রজারা আসত তাদের প্রার্থনা আর অনুযোগ নিয়ে, দেওয়ানি খাসে উজীর ও আমীরদের নিয়ে মন্ত্রণায় বসতেন শাহানশাহ বাদশাহ। শাহজাহানের তৈরি মর্মরের মতি মসজিদ, আর মছি ভবনের উত্তর-পূবে ঔরংজেবের তৈরি নাগিনা মসজিদ। হারেমের বেগমরা এখানে নমাজ পড়তেন, আর পাশের একটা ছোট ঘরে বন্দী হয়ে ছিলেন বৃদ্ধ শাহজাহান। সাম্মন বুর্জ থেকে দেখা যায় তাজমহল। লোকে বলে, এই বুর্জ থেকে তাজের দিকে চেয়ে চেয়েই শাহজাহানের মৃত্যু হয়।

বেরবার সময় বৌদি বললেন: আকবরের সমাধি সিকান্দ্রা এমন কিছু অপূর্ব জিনিস নয়। কিন্তু ফতেপুর সিক্রি না দেখলে সত্যিই আপনার দুঃখ থেকে যাবে।

আমিও তাই শুনেছি। যুদ্ধ জয় করে ফেরার পথে আকবর সাক্ষাৎ করেন শেখ সেলিম চিস্তির সঙ্গে। ফকির তখন সিক্রি গ্রামে আস্তানা ফেলেছেন। তাঁরই আশীর্বাদে আকবরের পুত্র হল এক বছরের মধ্যে। আকবর ছেলের নাম দিলেন সেলিম, আর রাজধানী গড়লেন সিক্রিতে। গুজরাট জয়ের পর সিক্রির নাম হল ফতেপুর সিক্রি, আর দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর মসজিদের দরজা উঠল বুলন্দ দরওয়াজা। একশ ছিয়াত্তর ফুট উঁচু, ভারতের সবচেয়ে উঁচু সবচেয়ে বড় দরজা। সকলের আলাদা আলাদা মহল হল—তুর্কীর সুলতানার ঘর, মরিয়াম-উজ-জমানির সোনেহারা মকান, যোধাবাঈর মহল, বীরবলের বাড়ি, শেখ সেলিম চিস্তির দরগা, জ্যোতিষীদের ছত্রি, ছাত্রদের পাঁচমহল, আরও কত কি। কিন্তু জলের কষ্ট দূর হল না, উন্নতি করা গেল না স্বাস্থ্যের। শেষ পর্যন্ত বাদশাহকে আগ্রাতেই ফিরে আসতে হল।

এই ফতেপুর সিক্রি দেখবার সখ আমারও প্রবল হল, বললুম: খুবই দূর বুঝি?

আগ্রার দুর্গ — ফটো: প্রদ্যোৎ চৌধুরী
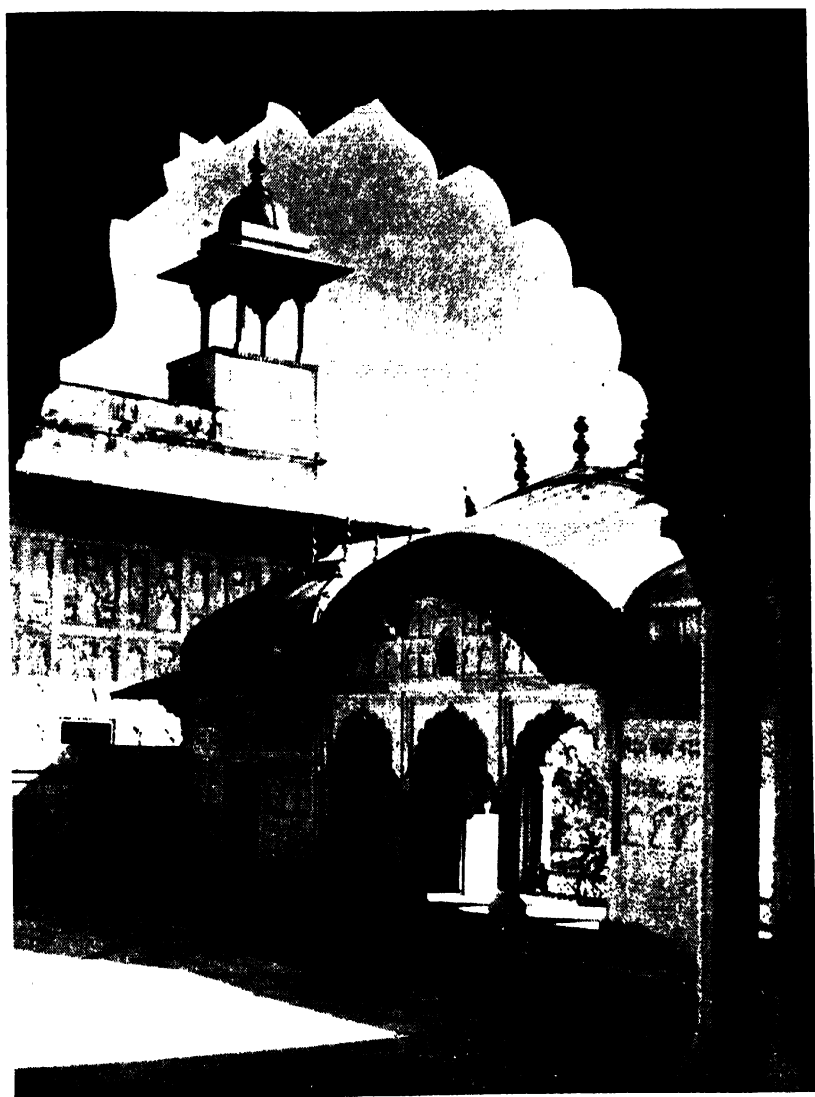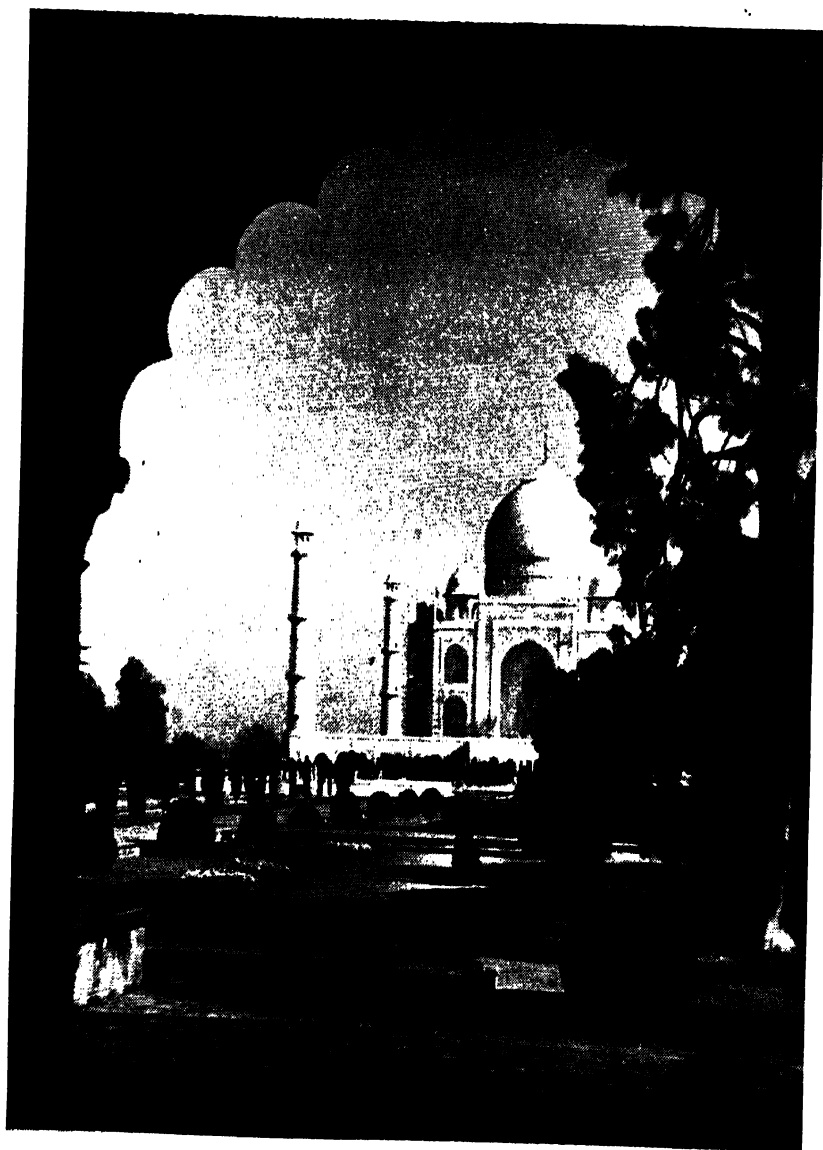
তাজমহল, আগ্রা ফটো—প্রদ্যোৎ চৌধুরী

বৌদি বললেন : দূর আর বেশি কি? ট্রেনে কয়েকটা স্টেশন। মোটরে সাতাশ মাইল—আগ্রার দক্ষিণ-পশ্চিমে, চমৎকার রাস্তা। সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে আসা যায়।

লোভ হল বৌদির কথা শুনে। বললুম : ব্যবস্থা একটা হয় না?

হবে না কেন?: বৌদি উত্তর দিলেন : মোটরওয়ালা কোন বন্ধুকে ধরতে হবে।

মোটরওয়ালা বন্ধু পাওয়া গেল, কিন্তু বৌদিকে নিয়ে যাবার অনুমতি পেলুম না। তার বদলে জ্যোৎস্না রাতে তাজমহল দেখতে গেলুম। নানানরকমের ওজর আপত্তি ছিল মাসির। বৌদি সব সরল করে দিলেন, বললেন : ঠাকুরপো নতুন মানুষ, তার ওপর একটু ইয়ে মানে ভালমানুষ গোছের লোক। লক্ষ্মীছাড়া টাঙ্গাওয়ালা এঁকে কোথায় নিয়ে তুলবে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে আপনিই সঙ্গে যান না, অনেকদিন তো বাইরে বেরননি।

ও বাবা, আমি বেরব!: মাসি যেন আকাশ থেকে পড়লেন : তা হলেই হয়েছে আর কি!

হঠাৎ তাঁর পূর্ণিমার কথা মনে পড়ল। বললেন : তার ওপর এই পূর্ণিমার রাত। বাতের ব্যথাটা বেড়ে উঠলেই গেছি আর কি!

বৌদির চোখ দেখে মনে হল, এসব কথাই তাঁর জানা। পূর্ণিমার কথাটা তাঁর মনে না এলে নিজেই মনে করিয়ে দিতেন।

তা হলে?

গভীর ভাবে ভাবতে লাগলেন ললিতা বৌদি।

ঠিক হয়েছে : বলেই বৌদি উল্লসিত হয়ে উঠলেন : বাবা বাড়ি ফিরুন, তাঁকেই একবার হাতে পায়ে ধরে দেখি।

তুমি পাগল হয়েছ বৌমা!: মাসি একেবারে তেড়ে উঠলেন : সারাদিন খেটে খুটে এসে উনি বেরবেন তাজমহল দেখতে! তার চেয়ে ওঁকে এই দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে বল না, পরিশ্রমও কম হবে, দেখবেনও নতুন জিনিস।

বলে উঠনের দেয়ালটা দেখালেন।

মাসির কবিত্ব আছে, মনে মনে আমি স্বীকার করলুম। এইটুকু না থাকলে আগ্রার সব লোক পাগল হয়ে যেত, আর তাজমহল হত একটা পাগলা গারদ।

তা হলে থাক্ ঠাকুরপো, তোমার কপাল খারাপ: বৌদি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন: পরের বার যখন আসবে, তখন আমরা অন্য লোক ঠিক করে রাখব।

সেকি বৌমা, তুমি বলছ কী!: মাসি উত্তর দিলেন: রাত্তিরে তাজ দেখবার জন্যেই তো ছেলেটা এ কদিন রয়ে গেল, শেষকালে কিনা না দেখেই ফিরে যেতে বলছ!

আর তো উপায় নেই মা।

বৌদি করুণভাবে জবাব দিলেন।

উপায় নেই কেন?: মাসি বললেন: পথঘাট তোমারও তো সব জানা। তুমিই নিয়ে যাও না।

আমি!

বৌদি যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

কেন, তোমার আর ভয়টা কী?: মাসি বললেন: গোপাল তো আমাদের ঘরেরই ছেলে। দাদার ছেলে মানেই—

বলেই নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন। বৌদি হাসলেন আমার মুখের দিকে চেয়ে।

তৈরি হয়ে নিতে বৌদির সময় লাগে না। শুধু একখানা শাদা গরদের থান জড়িয়ে নেওয়া তো! আলনাতেই টাঙানো থাকে। পূজোও হয়, বেড়ানোও চলে।

টাঙ্গায় খানিকটা এগিয়ে বৌদি বললেন: দেখলেন তো, কেমন করে মত আদায় করতে হয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম: কঠিন কাজ।

বৌদি বললেন: সত্যিই কঠিন কাজ। চালের একটু ভুল

হলেই সর্বনাশ। শ্বশুরকে পাঠাব না বলে যদি বলতাম 'খেটে খুটে তিনি আসছেন তিনি কি আর যেতে পারবেন' তা হলেই হত কেলেঙ্কারী। বুড়ো মানুষকে নির্ঘাৎ বের করে ছাড়তেন।

আমার আর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

বৌদি হেসে ফেললেন, বললেন: বেশ লোক তো আপনি! তাজমহলে না পৌঁছতেই বার বার দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। আপনার সঙ্গে বেরিয়ে আমিও তো বিপদে পড়লাম দেখছি!

আমি বৌদির কথাই ভাবছিলুম। তাঁর বন্ধনের কথা, তাঁর ব্যর্থ জীবনের কথা। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠছিল তাঁর অন্তরের প্রসন্নতা। যে নারী তার জীবনের গরল বুকে লুকিয়ে রেখে মুখে শুধুই অমৃত পরিবেশন করে, তার সত্যকার বিচার কজনে করতে পারে! মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা তো সীমাবদ্ধ। এমন চরিত্র কে দেখেছে আমি জানি না। কোন বইয়েও পড়েছি কিনা হঠাৎ মনে করতে পারলুম না।

কথা কইছেন না যে?

বৌদি আমায় তাড়া দিলেন।

বললুম: কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলেছি। বলার কথা আর খুঁজে পাচ্ছিনে।

খিল খিল করে বৌদি হেসে উঠলেন। বললেন: এসব কথা তো লোকে তাজমহলে পৌঁছে বলে, যখন যমুনার জলের মতো জ্যোৎস্নার বান ডাকে তাজের বাগানের ওপর। টাঙ্গার ঝাঁকানিতেও যে আপনার কবিত্ব আসছে!

তাজমহলের কথা তো আমি ভাবছিনে বৌদি—

কথাটা আমায় তিনি শেষ করতে দিলেন না, বললেন: কী বিপদ! বেড়াতে বেরিয়ে আবার ভাবাভাবি কিসের!

বুঝতে পারলুম, আমার বলার কথা বৌদি বলতে দিলেন না।

কিন্তু নিজের বলার কথা বললেন তাজমহলে পৌঁছে।

চারিদিকে ঘুরে আমরা সব কিছুই দেখলুম। সবই তো জানা। কত কবিতা পড়েছি, কত বর্ণনা পড়েছি, পড়েছি কত আলোচনা। শাহজাহান আর মমতাজকে নিয়ে এমন কোন কথা বোধহয় নেই, যা কেউ না কেউ লিখে যাননি। সে আলোচনা আমরা করলুম না। ঘাসের ওপর বসে আমরা নিজেদের কথাই কইলুম। আমরা তো একা নই এখানে, কত মানুষই তো এমনি বসে বসে নানারকমের গল্প করছে। সবাই কি আর তাজমহলের কথাই বলছে!

কী ভাবছেন বলুন তো?

বৌদি আমাকে হুকুম করলেন।

বললুম: যা ভাবছি, তা বলবার সাহস নেই।

আপনি আমাকে ভয় পান?

বৌদি হেসে ফেললেন।

ভয় পাব কেন?: আমি উত্তর দিলুম: আপনি কি বাঘ না ভালুক?

তবে?

আমার মুখের দিকে চাইলেন ললিতা বৌদি।

বললুম: যা জানতে ইচ্ছে করছে তা বললে আপনি দুঃখ পাবেন, এই ভয়।

দুঃখ!: বৌদি হাসলেন: দুঃখ আমি পাইনে। দুঃখ কী, আমি তা ভুলে গেছি।

দুঃখ ভুলে গেছেনই বটে! বাজ পড়লে যেমন গাছ পোড়ে, গভীর দুঃখও তেমনি পাথর করে হৃদয়কে। ছোটখাট দুঃখ তখন আর দুঃখ বলে মনে হয় না। মনে হয়, ললিতা বৌদির আজ সেই অবস্থা। মুখের কথায় তাঁকে আঘাত দেব তেমন সামর্থ্য আমার নেই।

আমি ইতস্ততঃ করছিলুম।

বৌদি তাড়া দিলেন। বললেন: কী বলবেন বলুন না, সঙ্কোচ করছেন কেন?

বললুম : সঙ্কোচ করবার ব্যাপার বলেই করছি। মেয়েদের জীবনের কথা জানতে চাওয়া শুধু অশিষ্টতা নয়, ধৃষ্টতাও বটে। তবু আজ আপনার জীবনের কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে। আজকের কথা নয়, কালকেরও নয়, যেদিনের কথা আজও আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সেই দিনের কথা।

হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ললিতা বৌদি, তারপর সেই শব্দেই চমকে উঠলেন। কথা কইলেন না।

আমায় আপনি ক্ষমা করবেন বৌদি : আমি সামলে নিলুম নিজেকে : ইচ্ছে না থাকলে আপনি কিছুই বলবেন না।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল।

যমুনার তীর থেকে অল্প অল্প হাওয়া আসছে। গাছের পাতা দুলছে থেকে থেকে। আকাশে তারার মেলা, মাটিতে জ্যোৎস্নার ঢল, এখানে ওখানে মানুষের কথা, মিষ্টি হাসি। আমরা চুপ করে আছি।

এক সময় বৌদি বললেন : আমি আপনার কথা ভাবছি। কিছু না ভেবেচিন্তেই আপনি বোধ হয় রাজী হয়েছেন।

আমার পোষ্যপুত্র হবার প্রসঙ্গ উঠবে এ কথা আমি ভাবিনি। বললুম : ভাববার অবকাশ পাইনি।

তাই কি ? : বৌদি জানতে চাইলেন : না তার প্রয়োজনের কথা মনে আসেনি ?

স্বীকার করে বললুম : তাও বটে।

বৌদি বললেন : আমার শাশুড়ি কী বলেন জানেন ?

জানিনে।

আমি জবাব দিলুম।

বৌদি বললেন : অভিশপ্ত পরিবার। রোগে এমন হয় না, দুর্ঘটনাতেও না। আড়ালে কোন দেবতার কোপদৃষ্টি আছে, পূর্বজন্মের কোন পাপ।

এসবে আপনি বিশ্বাস করেন ?

আমি প্রশ্ন করলুম।

করতুম না : বৌদি উত্তর দিলেন : কিন্তু এখন সন্দেহ হয়।

বললুম : এ কি আপনার দুর্বলতা নয়?

হয়তো তাই : বৌদি বললেন : হয়তো কেন, সত্যিই তাই। আঘাত পেলে তো মানুষ দুর্বলই হয়। আমিও সংস্কার মানতাম না। এখন মানি।

হঠাৎ বৌদি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বললেন : আমার একটা কথা রাখবেন ঠাকুরপো?

কী সে কথা, আমি যেন তা অনুভব করতে পারলুম। বৌদি কি আমার হাত দুটো চেপে ধরবেন? আমার অস্বস্তি বোধ হল।

কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। যেমন বসে ছিলেন, তেমনি বসেই আমার উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বললুম : প্রতিশ্রুতি কি আমায় দিতেই হবে বৌদি?

না।

সংযত উত্তর পেলুম ললিতা বৌদির। একটু আঘাতও যেন পেলুম। মনে হল, আমার ওপর বৌদি যদি জোর করতেন, তা হলে সেই জোরই আমার ভাল লাগত।

বললুম : বলুন না, কী বলছিলেন আমাকে। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই আমি কথা রাখব।

থাক্ : বৌদি বললেন : ভুলে গিয়েছিলুম যে আপনাকে অনুরোধ করার অধিকার আমার নেই।

একটু হেসে বললেন : আপনি পোষ্যপুত্র হলে তবে আমাদের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে।

বৌদি : আমার উত্তর বুঝি আর্তনাদের মত শোনাল, তবু বললুম : সত্য কথা এমন করে বলবেন না।

বৌদি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন : চলুন, এবারে ফেরা যাক।

যমুনার পুল পেরিয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। তবু দেখতে পাচ্ছি শাহজাহানের তাজমহল। আর মনে পড়ছে ললিতা বৌদিকে। গরদের শাদা থান পরা বিধবা ললিতা বৌদি। ঐ তাজমহলের মতই শাদা সুন্দর ও পবিত্র। আমার স্মৃতির খাতায় নাম তাঁর পাকা হয়ে গেছে।

তাজমহল মিলিয়ে যেতেই আবার দিল্লীর কথা মনে পড়ল। মিস্টার ব্যানার্জির বাড়িতে আহার সেরে আমরা যখন ফিরে এলুম, নর্থ অ্যাভেন্যুর সরকারী কোয়ার্টার তখন থমথম করছে। রাণাকে আমরা নামতে বললুম না, তবু সে নামল।

বসবার ঘরে বাতি নেই। তাতেই বোধহয় একটু দমে গেল। বলল: অনেক রাত হয়েছে, আজ আর ওঁদের বিরক্ত করব না। চলি, কেমন!

বলে স্বাতির দিকে চাইল।

হাত জুড়ে স্বাতি তাকে নমস্কার করল। আমি বললুম: আসুন।

অন্যদিন হলে গাড়ি পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিয়ে আসতুম। কিন্তু আজ বড় ক্লান্ত মনে হল। দেহটাকে বয়ে বেড়ায় যে মন, সেই মনই বেশি ক্লান্ত হয়েছে।

রাস্তার ওপর গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতেই মামা বেরিয়ে এলেন। মামীও এলেন তাঁর পেছনে।

বললুম: এখন ভাল বোধ করছেন তো মামীমা?

বলেই নিজের ভুল বুঝতে পারলুম। অসুস্থতার জন্য যে মামী যাননি, সেই কথাটিই মনে বদ্ধমূল হয়ে ছিল। সত্য কথাটা ভুলে গেলুম একটা মুহূর্তের জন্য।

আমার উত্তর দিলেন মামা নিজে। বললেন: তুমিই হাসালে গোপাল, তুমিই হাসালে।

আমি লজ্জা পেলুম।

মামী এগিয়ে এসে বললেন: ওসব থাক্, এখন তোমাদের গল্প বল। কী খেলে কী দেখলে এইসব।

বললুম: স্বাতিকে জিজ্ঞেস করুন। যে খেয়েছে খুঁটে খুঁটে, আর দেখেছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

স্বাতি হঠাৎ হেসে উঠল। বলল: গোপালদার যে বিয়ে হচ্ছে মা।

ওমা, তাই নাকি!: মামী আশ্চর্য হলেন: তবে যে তুমি বলছিলে—

বলে মামার দিকে চাইলেন।

কী বলছিলুম আমি?

মামা হেসে উঠলেন।

মামী বললেন: গোপাল সব ভেস্তে দিল বলছিলে।

তা তুমি যাই বল: মামা আমার দিকে চেয়ে বললেন: ও কাজটা তুমি ভাল করনি।

কোন্‌টা মামাবাবু?

আমি জানতে চাইলুম।

মামা বললেন: নীতীশ হাজার হলেও একজন বয়স্ক ব্যক্তি। তাঁকে তোমার অমন করে বলা উচিত হয়নি।

মামা কোন্ কথাটির উল্লেখ করলেন, আমি বুঝতে পারলুম। কিন্তু স্বাতি পারল না। সে তখন উপস্থিত ছিল না। বলল: কী কথা গোপালদা?

বললুম: দিল্লী দেখা হল কিনা, সন্ধ্যেবেলায় মিস্টার ব্যানার্জি জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে সত্যি কথাই বলেছিলুম। দিল্লী যে দেখা হয়নি, দেখা হয়েছে দিল্লীর জাদুঘর আর চিড়িয়াখানা।

বুঝতে না পেরে তিনি বলেছিলেন, সেকি! অসাবধানতায় আমি বলে ফেললুম, ঠিকই বলছি। দিল্লীতে মানুষ দেখতে এখনও বাকি আছে।

মামা আপত্তি করে বললেন: কথা যাই বলে থাক, মানেটা তার অন্যরকম দাঁড়িয়েছিল। পরিচয় যাদের সঙ্গে হয়েছে তাদের তুমি মানুষ মনে কর না, এমনি একটা উদ্ধত ভাব।

আমিও আপত্তি করলুম, বললুম: না না, এ আপনি ভুল বলছেন। এমন কথা আমি বলতে চাইনি।

মামী বললেন: ভদ্রলোকের গরজ কিসের বলতে পার?

মামা বললেন: গরজ হবে না? অত বড় সম্পত্তির মালিক যে হবে, তার গোলাম হতেও নীতীশের আপত্তি হবে না।

শুধুই কি তাই?

মামী জানতে চাইলেন।

মামা একথার উত্তর দিলেন না।

মামী বললেন: মিত্রা মেয়েটা প্রথম যেদিন এসেছিল, বেশ একটু নাক উঁচু দেখেছিলাম, কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। কাল থেকে তাকে আর এক রকম দেখছি। আজ তো অন্য মেয়ে বলেই মনে হল।

স্বাতি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ছিল মায়ের দিকে। মামী বললেন: আমি তো কথাবার্তা বুঝি না। আমি তার নাক ভ্রূ আর কপাল দেখেই এইসব বলছি। এখন ওসব আমাদেরই মতন। চোখের চাউনিও আগের মতন তীক্ষ্ণ নয়।

আমি আরও একটু বলতে পারতুম। ওখলায় আমি তার হাসি দেখেছি, মিষ্টি হাসি। কিন্তু সে কথা বলতে পারলুম না।

মামার মুখে খানিকটা পুলকের চিহ্ন দেখে মামী হঠাৎ লজ্জা পেলেন। কিন্তু তার পরেই মামার পরিবর্তন লক্ষ্য করলুম। দেখতে দেখতেই ঝিমিয়ে গেলেন। তাঁর পুলক গেল মিলিয়ে।

স্বাতিও আর অপেক্ষা করল না। কথা না বলেই ভেতরে চলে গেল।

মামা আমায় বসতে বললেন। নিজেও বসলেন। বললেন: তোমাকে দুটো কথা বলবার জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি।

কিন্তু কথা না বলে মামা তাঁর পাইপ ধরাতে লাগলেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম কথা শোনবার।

পাইপ ধরিয়ে কিছু ধোঁয়া নিতেই মামার মুখ খুলল, বললেন: স্বাতির সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ আছে।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললুম: আমার সঙ্গে?

হ্যাঁ, তোমার সঙ্গেই: মামা উত্তর দিলেন: স্বাতির সম্বন্ধে কিছু ভেবে দেখেছ কি?

আমি? আমি ভাবব স্বাতির সম্বন্ধে?

মামীও বসে ছিলেন মামার পাশে। অসহায় ভাবে আমি মামীর দিকেই তাকালুম। কিন্তু মামী আমাকে সাহায্য করলেন না।

মামা বললেন: স্বাতিকে রাণা বিয়ে করতে চায়, নীতীশেরও সেই ইচ্ছে। পাত্র হিসেবে রাণা তো মন্দ নয়। কিন্তু স্বাতি আমার একমাত্র মেয়ে, সে কথা আমি কী করে ভুলি!

কিন্তু কেন ভুলতে হবে?

আমি প্রশ্ন করলুম।

উত্তর দিতে মামা ক্ষেপে উঠলেন, বললেন: চোখ বুজে ঘুমের ভান কোরো না গোপাল। তোমাকে স্নেহ করি বলে তোমার অর্বাচীনতার প্রশ্রয় আমি দিতে পারিনে।

তিরস্কার আমি মাথা পেতে নিলুম।

ঘন ঘন পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে বললেন: আমার কাছে সাহায্য নিতে তোমার কিসের আপত্তি? সরলাদির ছেলে না হয়ে তুমি আমার ছেলেও তো হতে পারতে!

তা পারতুম। কিন্তু বলতে পারলুম না যে এ সমস্যার সমাধান তাতে হত না, বরং জটিল হত, ধিক্কৃত হত সভ্য সমাজে।

মামা বললেন: তুমি চুপ করে থেকো না গোপাল, কিছু বল।

আমি কী বলব ভেবে পেলুম না। যা বললে মামা খুশী হন, তা বলতে পারি না। কন্যাকুমারীর সমুদ্রবেলায় বসে স্বাতির কাছে অঙ্গীকার করেছি, মামার কাছে সাহায্য নেব না। স্বাতির মনের কথা আমি বুঝি। যে সুযোগের অভাবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে আছে, সে সুযোগ আমি চেয়ে নেব না, কেড়ে নেব। আদর্শ থাকবে না শুধু কথায়, জীবনটাই আমার আদর্শ হয়ে উঠুক। পার্থিব সুখের বদলে স্বাতি আত্মিক তৃপ্তি চায়। সেই আশা থেকে তাকে বঞ্চিত করলে সে আমায় ক্ষমা করবে না। মামার প্রস্তাবে আমি রাজী হতে পারি না।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে মামা বললেন: বুঝেছি, তুমি আমার কাছে সাহায্য নেবে না। তুমি সাহায্য নেবে জ্ঞানশঙ্করের কাছে, অনাত্মীয়ের কাছে।

মামা উঠে গেলেন। মনে হল অস্পষ্ট ভাবে বলে গেলেন যে মেয়েকে তিনি বিধবা দেখতে পারবেন না।

মামী আরও কিছুক্ষণ বসে রইলেন, বললেন: ভাল করে তুমি ভেবে দেখো বাবা, স্বাতির সঙ্গেও কথা বল।

একটু থেমে বললেন: সবই তো তোমাদের, শুধু দুদিন আগে আর দুদিন পরে। আপত্তি করে তুমি আমাদের দুঃখ দিও না।

ভেবে দেখবার কিছুই নেই, তবু আমি মামীকে আশ্বাস দিলুম, বললুম: আচ্ছা ভেবে দেখি।

উৎসাহ পেয়ে মামী বললেন: আমরা বেঁচে থাকতে তোমরা কষ্ট করবে, এ কিছুতেই সইতে পারব না। সেই জন্যেই তো এত চিন্তা।

এবারে মামীও উঠে গেলেন।

অন্যদিনের মত বাইরেই আমার খাট পড়েছিল। জামা খুলে আমি বাইরেই শুয়ে পড়লুম।

রাত গভীর হয়নি। গভীর হল আমার চিন্তা। এ কোন্ সমস্যা আমার জীবনে আজ ঘনিয়ে উঠল। কত সুখী ছিলুম কয়েকটা মাস

আগে। উত্তরপাড়ায় আমার ছোট ঘরখানি, নটা কুড়ির লোকাল ট্রেন, ডালহৌসী স্কোয়ারের অফিস। তারপর ফিরে এসে কী অবাধ স্বাধীনতা। লাইব্রেরির রাশি রাশি বই, লাইব্রেরিয়ান মুকুন্দবাবু, হারানিধির হোটেল। কোথাও কোন সমস্যা নেই। পাহাড়ি নদীর মত তরতর করে বয়ে যাচ্ছিল আমার স্বাধীন জীবন। হঠাৎ একদিন হাওড়া স্টেশনে এঁদের সঙ্গে দেখা হল। এঁরা রামেশ্বর যাচ্ছিলেন। যাচ্ছিলেন কন্যাকুমারী। আমার পুজোর ছুটি সেদিন শুরু হয়েছিল, আমিও সঙ্গে গেলুম—তাঁদের চাকর রাম খেলাওনের বদলি হয়ে। সেই আমাদের পরিচয়। আর আজ কয়েকটা মাস পরে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে জীবন ঘিরে।

এই ভেবে আশ্চর্য লাগে যে সাধারণের ভেতর আমি অসাধারণ হয়ে উঠলুম কী করে? ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে কেন আমায় সিংহাসনে বসানো হচ্ছে? আমার মত মানুষে তো বাঙলা দেশ ছেয়ে আছে। কই, তাদের তো এমন সুযোগ আসছে না!

সুযোগই তো বলব। সুযোগ ছাড়া একে আর কী বলা যায়? আমি ভাবতে লাগলুম, এমন না হোক, সামান্য সুযোগও কেন সকলের ভাগ্যে জোটে না। একা না নিয়ে ভাগ করেই না হয় নেব। কিন্তু তাই বা আজ কোথায়!

শিরশির করে হাওয়া আসছিল দক্ষিণ থেকে বামে। খাটের নিচে কয়েকটা শুকনো পাতা খসখস করে উঠল। আমি চমকে উঠলুম। ভেবেছিলুম স্বাতির আঁচলের শব্দ। আমি কি তারই অপেক্ষায় জেগে আছি?

মনে হল, ঘরের ভেতর মামীর গলার স্বর শুনলুম। অস্পষ্ট শব্দ। চাপা গলার ভর্ৎসনার মত শোনাচ্ছে। মামী কি স্বাতিকে ভর্ৎসনা করছেন?

কিন্তু কেন করবেন। সে তো কোন অন্যায় করেনি। ভাবতে ভাল লাগল যে স্বাতি আমার কাছে আসছে, মামী সেই নির্দেশই

দিলেন স্বাতিকে। তিনি তো নিজেই বলেছিলেন, স্বাতির সঙ্গে কথা বলতে। তবে কেন তাকে আমার কাছে পাঠাবেন না?

মনে হল আজকের বাতাসে কিছু উত্তাপ আছে। উত্তাপ উঠছে নিচের জমি থেকেও। নয়া দিল্লীর নর্থ অ্যাভেন্যুএ সারাবছরই গরম থাকে। এখনও আছে। প্রতিদিন বাড়বে।

কিন্তু স্বাতি আসছে না কেন? এতক্ষণ তো তার আসা উচিত ছিল। রোজই তো সে আসে। আজ তার প্রয়োজন আছে বলেই কি সে আমায় এড়িয়ে যাচ্ছে? জানি না তার মনের কথা, তার ছলাকলাও বুঝিনে। আমি যে আজ বিপন্ন, শুধু এইটুকুই যেন বুঝতে পারছি।

ইচ্ছে হল, একবার উঠে গিয়ে স্বাতিকে ডেকে আনি। ডেকে এনে আমার ভাবনার ভার তারই ওপর চাপিয়ে দিই। আমি ভেবে মরব, আর সে আরামে ঘুমবে, এ আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না। সেও ভাবুক, সেও বুঝুক, সেও বলুক। আমাকে দেখুক তার নিজের মন দিয়ে।

আশেপাশের বাতিগুলো একটা একটা করে নিবে গেল। থেমে গেল চারিদিকের কোলাহল। নয়া দিল্লী ঘুমিয়ে পড়ছে। কয়েক ঘণ্টার মত আর তার সাড়া পাওয়া যাবে না।

স্বাতি তবু এল না।

২৩

সকাল বেলায় চাওলার ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙল, চোখ রগড়ে উঠে বসেই আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম।

তুমি এত সকালে ?

আমি প্রশ্ন করলুম।

ঠোঁটের ওপর তর্জনী চেপে চাওলা বলল : চুপ। সবাই জেগে যাবেন।

ভোরের আলোয় চারিদিক ঝকঝক করছে, কিন্তু জ্যোতির্ময়ের উদয় হয়নি। আশেপাশের আরও কয়েকখানা বাড়িতে চাদর মুড়ি দিয়ে আরও অনেকে শুয়ে আছেন। তাই দেখেই বুঝতে পারলুম যে ঘুম ভাঙতে আমার বেশি বিলম্ব হয়নি। চুপিচুপি চাওলা বলল : তুমি পালিয়ে গেছ কিনা দেখতে এসেছি।

পালাব কেন ?

আমি জানতে চাইলুম।

তা হলে কি আমারই ভুল হল ? : চাওলা উত্তর দিল : কিন্তু চাওলা তো সহজে ভুল করে না।

আমি তার গর্ব দেখে হাসলুম।

চাওলা বলল : হাসছ কেন ? আমি ঠিক কথাই বলছি। যে রকম পরিস্থিতির ভেতর পড়েছ, তাতে তোমার পালানোই উচিত ছিল। না পালিয়ে তুমি তোমার বোকামির পরিচয় দিয়েছ।

সেকি ?

আমি আমার বিস্ময় প্রকাশ করলুম।

চাওলা বলল : তুমি যে ইচ্ছে করে বোকা সাজছ। তোমাকে বোঝাই কী করে ?

বললুম : সত্যি বলছি, আমি এখনও বুঝতে পারছি না।

তবে কি রাণার অনুমান মিথ্যে ?

চাওলা জানতে চাইল।

রাণার অনুমানের কথা আমি জানি না, তাই সেটুকু শোনবার অপেক্ষা করতে লাগলুম।

চাওলা বলল : রাণা বলছিল যে তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে নাকি তোমাকে রাজী করাবার চেষ্টা চলছে।

বললুম : কিসে ?

বিয়েয় গো বিয়েয় : মুখভঙ্গী করে চাওলা উত্তর দিল : মিত্রা নাকি তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। এতদিন পরে সে প্রথম পুরুষ মানুষ দেখেছে।

তাই নাকি !

আমি একটু হেসে নিলুম।

চাওলা আমার পাশে আর একটু ঘেঁষে বসল। বলল : একটা কথা বলবে ?

বললুম : বল।

চাওলা বলল : কাল তুমি বলেছিলে তোমার এক আত্মীয় আছে, যার সঙ্গে পরামর্শ না করে তুমি রাজী হতে পারছ না। কে সেই আত্মীয় বলবে ?

তার আগে তুমি একটা উত্তর দেবে ?

আমি প্রশ্ন করলুম।

নিশ্চয়ই : চাওলা উত্তর দিল : চাওলা কোন কথা লুকোয় না, লুকোবার প্রয়োজন মনে করে না।

এও একটা গর্বের কথা। আমি আবার একটু হাসলুম। তারপর বললুম : এসব খবর তোমায় কে দিলে ?

চাওলা হেসে উত্তর দিল : ও বাড়িতে চর রেখেছি। তার কাছ থেকেই সব সংবাদ পাই।

তা তো বুঝতেই পারছি : আমি জবাব দিলুম : কিন্তু সেই চরটি কে ?

শুনলে আশ্চর্য হবে না তো ?

বেশ গম্ভীর হয়ে চাওলা প্রশ্ন করল।

আমিও স্পষ্ট উত্তর দিলুম : না।

স্থির দৃষ্টিতে চাওলা আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর বলল : রাণা।

রাণা !

বিস্ময়ে আমি দুচোখ বিস্ফারিত করলুম।

চাওলা হেসে বলল : আশ্চর্য হচ্ছ কেন ? রাণা নিজে এ প্রস্তাব করেছে বলে ? সে তো ওর নিজের স্বার্থে। মেয়ের বিয়ে না দিয়ে মিস্টার ব্যানার্জি তাঁর ছেলের বিয়ে দেবেন না।

কেন ?

আমি প্রশ্ন করলুম।

সে তুমিই ভাল বুঝবে : চাওলা উত্তর দিল : বাঙলা দেশে এই নাকি রীতি। মেয়ে পার না করে ছেলের বাপেরা নাকি কথাই কন না। দরকার হলে মেয়ের খাতিরে খোঁড়া বউও ঘরে তোলেন।

আমি হাসলুম তার কথার ধরনে। আশ্চর্যও হলুম। বললুম : অনেক খবর রাখ দেখছি।

কিন্তু চাওলা নিজের প্রশ্নের কথা ভোলেনি। বলল : এবারে আমার কথার জবাব দাও।

আমাকে থেমে থাকতে দেখে বলল : তোমার একমাত্র আত্মীয়টি কে ?

ভবী ভোলবার নয়। বললুম : তোমার কী মনে হয় ?

সেকথার উত্তর না দিয়ে চাওলা বলল : মিস্টার গোস্বামী তোমার কেমন মামা ? খুব নিকট আত্মীয় কি ?

তুমি সত্যিই বুদ্ধিমান : আমি উত্তর দিলুম : আমাদের চেয়ে ঢের বেশি বুদ্ধি রাখ।

চাওলা হাসছিল। বলল : কিন্তু দুঃখ কী জানো? ভগবান নামে সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটি দুটো জিনিস একসঙ্গে দেন না— বুদ্ধি আর ভাগ্য, বা রূপ আর হৃদয়। যার বুদ্ধি দেন বেশি, তার ভাগ্য করেন ভোঁতা। আর রূপ ঢেলে দিলে হৃদয়টা কেড়ে নেন।

মনে রাখবার মত কথা। মিত্রাকে চাওলা এই চোখেই দেখে। বললুম : ব্যতিক্রম না থাকলে কোন নিয়মই সম্পূর্ণ নয়। তোমাকে এই কথাটি শুধু মনে রাখতে অনুরোধ করি।

চাওলা হেসে বলল : দুর্বলের ঐটুকু তো আশ্বাস।

দুর্বলের কেন, সবলেরও। তোমারও থাকা উচিত।

আমি উত্তর দিলুম।

চাওলা বলল : আমি তো তোমার মত ভীরু নই, সত্য বলতে ভয় পাইনে। মিত্রার আশা আমি আজও ছাড়িনি। কেন ছাড়িনি জানো?

কেন?

আমি প্রশ্ন করলুম।

চাওলা বলল : পেছনে তুমি যে আত্মীয়ের ডাক শুনছ, সেও তাই শুনছে। তোমার অনুভূতি স্পষ্ট বলে তুমি তা বুঝতে পারছ, সে পারছে না। আজ না পারলেও কাল পারবে, এই আমার বিশ্বাস।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। চাওলা বলল : তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না এই কথা, না?

আশ্চর্য লাগছে।

আমি উত্তর দিলুম।

চাওলা বলল : লাগবে বৈকি। যতক্ষণ তুমি কোন সিদ্ধান্ত না নিচ্ছ, ততক্ষণই লাগবে। তারপর স্বীকার করবে আমার কথা।

ভালবাসা তো বুদ্ধির কথা নয়, যুক্তিরও নয়। ভালবাসা অনুভবের কথা, বিশ্বাসের কথা।

সত্যি কথা।

আমি জবাব দিলুম।

খুশী হয়ে চাওলা বলল : আমার আর একটা প্রশ্ন আছে।

বললুম : বল।

চাওলা একটু সঙ্কোচ করে বলল : কিছু স্থির করেছ?

বললুম : না।

আরও কিছু শোনবার অপেক্ষা করে চাওলা বলল : তোমার আত্মীয় কী বলেন?

বিপদ তো সেইখানেই : আমি জবাব দিলুম : তার মুখে কথা নেই, ব্যবহারে প্রভেদ নেই, মনে কী আছে তা জানিনে।

চাওলা গম্ভীর হয়ে রইল খানিকক্ষণ, কিন্তু মিত্রার সম্বন্ধে আমার মনোভাব কী তা জিজ্ঞেস করল না। বড় স্বস্তি পেলুম তাতে।

আমাকে একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

এবারে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম।

অন্যমনস্কভাবে চাওলা জবাব দিল : বল।

বললুম : আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

এক নিমেষে চাওলার অন্যমনস্কতা ভেঙে গেল। হেসে উঠল উচ্চস্বরে। বললুম : কী হল?

তুমি আমায় কী সাহায্য করবে?

চাওলা উত্তর দিল।

আমি লজ্জা পেলুম অপরিমিত। বললুম : এত অপদার্থ আমি?

চাওলা হেসে বলল : ঠিক উল্টো। কাজে তুমি আমায় অপদার্থ প্রমাণ করে দিয়েছ। আমি আজ দু তিন বছরে যা পারলাম না তুমি দু তিন দিনে তাই করলে।

তবে কেন ভাবছ যে সাহায্য করতে পারব না ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম।

চাওলা বলল : মিত্রাকে কিছু অনুরোধ করবে তো। আমার প্রতি সদয় হতে বলবে ?

বললুম : বললে দোষ কী!

ছিছি : চাওলা উত্তর দিল : আমায় তা হলে যমুনায় ডুবে মরতে হবে।

বললুম : আমি যদি বিয়ে না করি ?

চাওলা বলল : আমার জন্যে না করলে আমার উপকার হবে না। হবে আর কারও। অর্থাৎ হাতি জিরাফে যখন গলা জড়াজড়ি করে বলবে আপ খাইয়ে, আপ খাইয়ে, তখন ফল খেয়ে যাবে বাঁদরে।

আমি হেসে ফেললুম তার কথার ধরনে। বললুম : তবে কী করতে পারি বল।

চাওলা বলল : কিছুই না, শুধু সত্যি কথাটা বললেই আমার উপকার হবে।

কী কথা বল তো ?

আমি প্রশ্ন করলুম।

আর ভূমিকা না করে চাওলা বলল : স্বাতিকে তুমি ভালবাস ?

সমস্ত শরীরটা আমার কেঁপে উঠল। ভোরের বাতাসে শীত তখনও লেগে আছে।

চাওলার সন্ধানী দৃষ্টির সামনে আমি ধরা পড়ে গেলুম। হেসে বলল : থাক্, ওতেই হবে। আমার উত্তর আমি পেয়ে গেছি। মুখের উত্তর শুনে কী করব!

অত্যন্ত প্রসন্ন মেজাজে চাওলা উঠে দাঁড়াল। বলল : চলি এবারে। ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম, ক্ষমা কোরো।

হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে দিলুম। বললুম : নিজের কাজ সেরে তুমি চলে যাবে, তা হবে না। আমাদেরও কিছু কাজ আছে।

আপত্তি না করে চাওলা বসে পড়ল।

বললুম: আমি পালিয়েছি কিনা দেখতে এসেছিলে। কিন্তু কেন পালাব ভেবেছিলে তা তো বললে না।

লোকে পালায় কেন? ভয় পেলেই তো পালায়।

চাওলা উত্তর দিল।

আমি হেসে ফেললুম, বললুম: ভয় পাবার আবার কী হল? আমি কি বাঘের হাতে পড়েছি? না ভালুকের?

চাওলা বলল: বল কি? নারী কি বাঘ-ভালুকের বাড়া নয়?

বলেই চাওলা আঁৎকে উঠল।

বললুম: কী হল?

কিন্তু সেকথার উত্তর না দিয়েই সে উঠে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলুম যে দু পেয়ালা চা হাতে নিয়ে স্বাতি এদিকেই আসছে। প্রসন্ন তার দৃষ্টি। মুখে স্মিত হাসি। উদ্বেগের চিহ্ন নেই কোনখানে।

চাওলা নমস্কার করল। উত্তরে স্বাতি বলল: আজ দিনটা আমাদের ভাল যাবে।

কেন?: আমি জানতে চাইলুম।

কেন আবার? স্বাতি উত্তর দিল: সকালেই আজ মিস্টার চাওলার মুখ দেখলাম।

তবেই হয়েছে: চাওলা লজ্জিত হল: আমি মানুষটাই অপয়া। আমার মুখ দেখে বিপদ না ঘটে। আজ না হয় শিবের মাথায় একটা বেশি বেলপাতা চড়াবেন।

আমিও হাসলুম।

স্বাতি বলল: গোপালদার বেড টিটা আজ মারা গেল।

এবারে চাওলা প্রশ্ন করল: কেন?

কেন আবার?: স্বাতি জবাব দিল: সকাল বেলায় চোখ বুঁজে বুঁজে চা খান, আজ আর তা হল না।

চাওলা আশ্চর্য হয়ে বলল : আপনি রোজ এই চা জোগান ?

স্বাতি বলল : কী করি বলুন, এই চাটুকু না পেলে সারাদিন মনটা এঁর অপ্রসন্ন হয়ে থাকে।

তাই বলে এই আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে হবে ?

চাওলা চটে উঠল।

স্বাতি বলল : দুদিনের জন্যে এসেছেন, বাড়ি ফিরে বদনাম করবেন যে!

চাওলা বলল : শুনেছি তো একলা থাকেন, সেখানে এই কাজটি কে করে।

স্বাতি বলল : বোধহয় কোন চাকর-বাকর।

হেসে বললুম : ওসব বালাই নেই, তবে চা-টা পাই।

দুজনেই আমার মুখের দিকে তাকাল। বললুম : মোড়ের ওপর হারানিধির চায়ের দোকান। তার সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে। দোকানের একটা ছোকরা আসে চা নিয়ে। মাথার জানলার কাছে তিপাই আছে, হাত বাড়িয়ে একটা ভাঁড় রাখে, শীতের দিনে দু ভাঁড়, বাদলার দিনেও।

দুজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠল।

স্বাতি বলল : মুখ হাত ধুয়ে টেবিলে চল। বাবাও আজ উঠে পড়েছেন।

বললুম : বল কি, মামাবাবু তো এত সকালে ওঠেন না।

স্বাতি বলল : আজ উঠেছেন। ঘরের ভেতর পায়চারি করছেন জোরে জোরে।

রাতে কি তিনি ঘুমন নি? মনে মনেই আমি ভাবলুম। স্বাতি ফিরে গেছে ঘরের ভেতরে।

চাওলা বলল : আর একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

কী কথা ?

আমি প্রশ্ন করলুম।

চাওলা বলল : তোমার মামা মামী কি তোমাদের কথা জানেন না ? তাঁরা কেন চুপ করে আছেন ?

বললুম : না থেকে উপায় কী ? সমাজে তাঁদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। একটা সামান্য কেরানীর সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দেওয়া চলে না।

চাওলা এ কথা স্বীকার করল, বলল : এ মনোভাব শীঘ্র আমাদের যাবে না। কিন্তু—

কিন্তু কী ?

আমি জানতে চাইলুম।

চাওলা বলল : তাঁদের তো অনেক সম্পত্তি আছে শুনেছি, ব্যবসাও আছে। আর মেয়ে ঐ একটি।

তাতে আমার পদমর্যাদা তো বাড়ে না।

তার কথার মাঝেই আমি মন্তব্য করলুম।

চাওলা বলল : আমি অন্য কথা বলছি। বলছি, তোমার আর কেরানী থাকার কী প্রয়োজন ? আমার মত একটা বিজনেসম্যান হতে পার। বিজনেস বাঁ হাতের না রাতের, তা নাই বা কাউকে বললে।

চাওলার বলার ভঙ্গীটি ভাল। না হেসে থাকা যায় না। বললুম : সে চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন।

তুমি ছেড়ে দিলে ?

চাওলা জানতে চাইল।

বললুম : ছেড়ে দিইনি। তাঁদের সে প্রস্তাব আমি গ্রহণ করিনি।

কেন ?

বললুম : আমার আদর্শে বাধল।

আর কিছু ?

বললুম : স্বাতি আমার দারিদ্র্যকে ভয় পায় না। ভালবাসে আমার আদর্শকে। মামার দান নিয়ে স্বাতির চোখে নিজেকে ছোট করতে পারলুম না।

তবে এবারে কেন করলে ?

চাওলা প্রশ্ন করল।

বললুম : তুমি এলাহাবাদের কথা বলছ ? জ্ঞানশঙ্করবাবুর কথা ?

সহসা এর উত্তর দিতে পারলুম না।

চাওলা বলল : বুঝেছি।

আমি বললুম : না বোঝনি তুমি।

চাওলা যে বুঝেছে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করল। বলল : একসঙ্গে দুটো চাওনি, রাজত্ব আর রাজকন্যা। রাজকন্যার দৌলতে রাজা, এই চিন্তার ভেতর একটা মানসিক গ্লানি আছে।

বাধা দিয়ে আমি বললুম : আমি জানি, তুমি এই ভুল করবে। যারা নিতান্ত সংসারী তারাই এইসব ভাবে।

চাওলা বিচলিত হল না, বলল : তুমি ঠিকই বলেছ। প্রয়োজন-বোধের ব্যাপারে আমি একটু বেশি প্র্যাকটিকাল, এবং আমার বিশ্বাস যে আমি কিছু হারাব না। আমার দাবীর ভেতর দৃঢ়তা আছে।

আমার ঠিক উল্টো : আমি উত্তর দিলুম : আমার ভেতর দৃঢ়তারই একান্ত অভাব। পাওয়া জিনিসও আমায় হয়তো হারাতে হবে।

চাওলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল : এসব আলোচনার শেষ নেই। তার চেয়ে আজ চলি।

বললুম : আমাকেও নিয়ে চল।

চাওলা আশ্চর্য হল, বলল : কোথায় যাবে ?

কলকাতায়।

অসতর্কভাবে আমি উত্তর দিলুম।

সে কি ! কবে ফিরবে, কেন ফিরবে ?

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করল চাওলা।

বললুম : এই গোলমালের ভেতর থেকে আমি পালাতে চাই।

মিষ্টি হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে স্বাতি এল কাছে, বলল : পরে পালাবে, তার আগে চা খেয়ে নাও।

চায়ের টেবিলে বসে নিজেকে বড় অসহায় মনে হল, বড় ঝিমিয়ে গেছি। স্বাতির নিশ্চিন্ত আচরণই সবচেয়ে বেশি পীড়া দিচ্ছে। রাণাকে সে বিয়ে করবে করুক, কিন্তু অতীতটা তার জন্য মুছে যাবে ? মনটাকে তৈরি করতেও কিছু সময় নেবে না ?

পরিজের প্লেটটা টেনে নিয়ে মামা প্রথম কথা কইলেন, বললেন আমাকে : ব্যবহারে প্রকাশ কর যে তোমার একটা আদর্শ আছে। কিন্তু সেই আদর্শটা কী আজও বলনি।

আমিও তা জানি না : আমি জবাব দিলুম : আর জানি না বলেই আমার শান্তি নেই।

মামার দৃষ্টিতে কিছু বিস্ময় দেখলুম, তাই যুক্তি দিয়ে নিজের কথাটা প্রমাণের চেষ্টা করলুম : দেশে আজ নানারকমের আদর্শ, সংঘাত দেখি আদর্শের সঙ্গে আদর্শের। তাদের ভেতর ত্রুটি আছে বলেই তো সংঘাত।

দুধ আর চিনি মিলিয়ে মামা পরিজ মুখে তুলছিলেন। চাওলা চুপ করে সব শুনছিল। বাঙলায় কথা সে কিছু বোঝে।

বললুম : এমন একটা আদর্শের দরকার যা সবার শ্রেয় হবে, প্রিয় হবে। সংঘাত বাধবে না কারও সঙ্গে, সমস্ত আদর্শের লোক তাকে আপন বলে গ্রহণ করবে।

তা কি সম্ভব ? : চাওলা প্রশ্ন করল।

কেন সম্ভব নয় : আমি উত্তর দিলুম : মানুষের কল্যাণ যদি লক্ষ্য হয় তো মানুষ তা বুঝবে না ?

আমার কথার ভেতর খানিকটা আবেগ এসে পড়ছিল। নিজেকে সামলে নিলুম।

চাওলা হাসল, বলল : সব আদর্শের লক্ষ্যই তো মানুষের কল্যাণ, তবু কেন আদর্শের সংঘাত ?

তারপর নিজেই উত্তর দিল, বলল: কল্যাণের ধারণা সবার সমান নয়। আর এই কল্যাণ সাধনের পথও অনেক, রোজই তো নতুন কথা শুনছি।

আমি কী ভাবছিলুম জানি না। বললুম: আজ আমার ছুটি চাই মামাবাবু।

সেকি!

মামা আশ্চর্য হলেন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি।

বললুম: সত্যিই, আজ সকালের গাড়িতেই আমি ফিরতে চাই। বোধহয় বেলা এগারটায় দিল্লী ছাড়ে তুফান এক্সপ্রেস।

মামী টেবিলে ছিলেন না, স্বাতি স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাল।

মামার মুখ আজ অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বললেন: হুঁ।

২৪

কাঠের বেঞ্চিতে বসে ঢুলতে ঢুলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম মনে নেই। পাশের ভদ্রলোক আমায় ঠেলে জাগিয়ে দিলেন: একটু সামলে বসুন। পড়ে যাবেন।

সোজা হয়ে বসে বললুম: কতদূর এলুম আমরা?

ভদ্রলোক মাড়ওয়ারী। হিন্দীতেই উত্তর দিলেন: কথা কইলেন শেষ পর্যন্ত!

ওঁদের আশ্চর্য হবারই কথা। গাড়িতে উঠে অবধি আমি কথা কইনি। কার সঙ্গে কইব? কীইবা কইব?

আমি উত্তর দিলুম না দেখে নিজেই বললেন: কানপুর পেরিয়ে গেছি, ফতেপুরও। এলাহাবাদ পৌঁছতে আর দেরী নেই।

এলাহাবাদ! আমি চমকে উঠলুম। আমার এলাহাবাদের

টিকিট, এলাহাবাদে নামতে হবে আমাকে। যেতে হবে জ্ঞানশঙ্কর-বাবুর বাড়ি। সেই কুকুর আর চন্দ্রমল্লিকার মধ্যে। সেই বৈচিত্র্যহীন নিষ্প্রাণ টানাটানির মধ্যে।

মন্দ কি! আমার মনে হল। উত্তরপাড়া আর ডালহৌসী স্কোয়ারের চেয়ে এ খারাপ কি? মুকুন্দ বাবুর লাইব্রেরির জন্য সেখানে বেঁচে ছিলুম। এখানে কর্তার লাইব্রেরি আছে। সেখানে কোনও বই না পেলে দুঃখ করতে হত, এখানে তা কেনবার সঙ্গতি হবে।

এই জীবন!

বুকের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠল।

তারপর হয়তো মিত্রা আসবে। কিংবা তারই মত আর কেউ। বুদ্ধির জীবন, তর্কের জীবন। কৃত্রিম জীবন। হৃদয়টাকে লুকিয়ে বেড়াতে হবে। পাছে তার দুর্বলতা কারও কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেই ভয়ে। সভ্যযুগে সভ্য হয়েই থাকতে হবে। মন জানাজানি তো বন্য যুগের রীতি।

পাশের ভদ্রলোক বেশিক্ষণ চুপ করে রইলেন না। বললেন: কানপুরে তো ঘুমিয়েই রইলেন। এলাহাবাদে কিছু খেয়ে নেবেন।

খাবার আমার সঙ্গেই ছিল। কিন্তু খাবার ইচ্ছা ছিল না। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বললুম: আচ্ছা।

এলাহাবাদ আসছে। জ্ঞানশঙ্করবাবুর এলাহাবাদ, সেখানে লাইব্রেরি আছে। আর আছে কুকুর আর চন্দ্রমল্লিকা। আরও কিছু আছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম।

কালিন্দী যমুনা! যে যমুনা দিল্লীতে দেখেছি, দেখেছি বৃন্দাবন ও আগ্রায়, সেই যমুনা! জ্ঞানশঙ্করবাবু যে যমুনা দেখেছিলেন যমুনোত্তরীতে, সেই যমুনা। শীতের শেষে শীর্ণ হয়ে আছে তার ধারা। তবু কালিন্দী নীল। দূর্বাদলশ্যামের মত প্রসন্ন নয়, নীলকণ্ঠের মত ভয়ার্ত। শরীরের ভেতর শিরশির করে উঠল ভয়ের বিষ।

শীত করছে ?

পাশের ভদ্রলোক আমায় প্রশ্ন করলেন।

শীত! তা একটু করছে বৈকি।

আমি জবাব দিলুম।

ভদ্রলোক বললেন: তা যা বলেছেন! শেষ রাতে বেশ শীত করে।

শেষ রাতে আমিও একখানি চাদর টেনে দিতুম। এই চাদরখানি দিতে স্বাতি কোনদিন ভুলত না। বলত: বাইরে শোও, একটু ঢেকে শুয়ো।

শেষ রাতে চাদর ঢেকে আমি তার স্নেহের স্পর্শ পেতুম। বাইরের দূরত্ব যতই থাক, মনে হত মনের দূরত্ব আমাদের কমে আসছে। কিন্তু—

রাণার কথা হঠাৎ মনে পড়ল। তাকে বিয়ে করতে হবে জেনে স্বাতি মুষড়ে পড়েছিল। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হতেই তার এই পরিবর্তন দেখেছিলুম। কিন্তু সে যেন ক্ষণিকের, পরে তার আচরণে আর কোন প্রভেদ দেখলুম না। সহজভাবেই তার ভাগ্যকে সে যেন মেনে নিল।

সত্যিই কি মেনে নিল ? মেনে নিয়েছে বৈকি! কোন প্রতিবাদ তো সে জানায়নি!

গভীর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। দু'পাশের ঝোপঝাড়ের ওপর বিজলির আলো পড়েছে, তার বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঐখানেই কি পৃথিবীর শেষ ? দৃষ্টিপথের বাইরে কি আর কিছু নেই ? মনের চোখ মেলে কি এর বেশি কিছু দেখা যায় না ?

হঠাৎ মনে হয়ে যায়, চোখের কাজ যেখানে শেষ, মনের কাজ সেখানে শুরু। তার বিচরণের ক্ষেত্র অবাধ। আমার দৃষ্টিও যেন স্বচ্ছ হয়ে গেল। মনে হল, স্বাতিকে আমি ভুল বুঝেছি। নীরব

থেকে সে তার নিশ্চিন্ততার পরিচয় দিয়েছে, তার নির্ভরতার, তার দৃঢ়তার। তাকে ভুল বুঝলে নিজেকে ভুল বোঝা হবে।

দিল্লী ছাড়ার সংকল্প যখন নিয়েছি, হাতে তখন সময় ছিল না। রাণা মিত্রাদের খবর দিতে পারিনি। খবর দেবার ইচ্ছাও ছিল না। মামা আশ্চর্য হয়েছিলেন, মামী বিশ্বাস করেননি, হেসেছিল স্বাতি।

বললুম: হাসছ কেন?

তার উত্তরেও স্বাতি হেসেছিল। বড় মিষ্টি হাসি, কিন্তু আমার পৌরুষে যেন আঘাত লাগে। জোর করে আমি তার উত্তর নিয়েছিলুম। হাসতে হাসতেই বলল: এত অল্পেই ভয় পেয়ে গেলে গোপালদা? কবে শক্ত হবে?

উঃ, কী সাংঘাতিক মেয়ে! ঠিক আমার দুর্বলতার জায়গাটা ধরে ফেলেছে। তবু আপত্তি করলুম: কে বললে আমি ভয় পেয়েছি?

তোমার মনের কথাও আমায় জিজ্ঞেস করে জানতে হবে!

হাসতে হাসতেই স্বাতি সরে গেল।

তবু আমি আমার মত পরিবর্তন করলুম না।

স্টেশনে পৌঁছে দিতে এলেন মামা-মামী। স্বাতিও এল। প্রথম শ্রেণীর টিকিট কাটলুম না, কাটলুম তৃতীয় শ্রেণীর। মামা আশ্চর্য হলেন, বললেন: এখনও এই থার্ড ক্লাসে চড়বে!

বললুম: চিরদিন যাতে এই ক্লাসে চড়তে পারি, সেই আশীর্বাদ আপনি করুন।

মামা আরও একটু বিস্মিত হলেন।

স্বাতি বলল: কোথাকার টিকিট কাটলে?

এলাহাবাদের।

আমি উত্তর দিলুম।

স্বাতি হাসল।

বললুম: হাসলে যে?

নিজের কর্তব্য স্থির করতে এত দেরী হয় তোমার!

কোথায় দেরী হল ?

আমি জানতে চাইলুম।

এর উত্তরে স্বাতি শুধুই হাসল।

পাশের ভদ্রলোক হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠলেন, বললেন: এলাহাবাদ এসে গেলাম।

আমিও চমকে উঠলুম, বললুম: তাই নাকি!

দেখছেন না: ভদ্রলোক জবাব দিলেন: বামরৌলি এয়ারোড্রোমের আলো।

দক্ষিণের জানালা দিয়ে সেই আলো দেখলুম। তারপরেই আবার গভীর অন্ধকার। এলাহাবাদে কি অন্ধকার বেশি?

ভদ্রলোক নিজের বিছানা বাক্স সামলাতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন: আপনি তো অনেক দূর যাবেন?

আমি?

আমারও তো এলাহাবাদের টিকিট। কিন্তু—

হ্যাঁ আপনি!

ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

কাঠগড়ার কয়েদীর মত বুকের ভেতরটা আমার ঢিপ ঢিপ করছে। পাথরের মত ভারী মনে হচ্ছে দেহটা।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। হঠাৎ কিছু ভেবে না পেয়ে বললুম: উতোরপাড়া।

ভদ্রলোক কী বুঝলেন জানি না। নিষ্কৃতি দিলেন আমাকে।

কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা তাতে কমল না। গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছে। যাত্রীদের অনেকেই এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। দরজার দিকেও এগিয়ে গেছেন অনেকে।

পেটের ভেতরটা আমার মুচড়ে উঠল। একরকমের অদ্ভুত যন্ত্রণা

বোধ করলুম। সেই যন্ত্রণা বুকের ভেতর দিয়ে গলা অবধি ঠেলে উঠল। কেমন এলোমেলো হয়ে গেল আমার চিন্তার ধারা।

চোখ বন্ধ করে দেখলুম, যমুনার ধারা নামছে বন্দরপুঁছ পর্বতের গা বেয়ে। মহাদেবের ত্রিশূলের মত তিনটি ধারা এসে মিলিত হয়েছে যমুনোত্তরীতে। তারপর পাঞ্জাবের ভেতর দিয়ে পানিপথ প্রান্তরের পূর্ব দিয়ে দিল্লীর গা ঘেঁষে বৃন্দাবনের পা ধুইয়ে আগ্রার মনোহরণ করে নেমে আসছে। একদা আরও একটি শহর ছিল যমুনার তীরে। কৌশাম্বী। আজ তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

এলাহাবাদে নামলে আমিও কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব না। সেই যমুনার ধারা কি আমার জীবনের ওপর দিয়েও বয়ে যাবে না? স্বাতি আমাকে পরিত্যাগ করবে ঘৃণায়। আদর্শভ্রষ্ট পুরুষকে সে তো ঘৃণাই করে। মামীও আমার মুখ দর্শন করবেন না। মামার সংস্কারে তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস। অভিশপ্ত পরিবারভুক্ত হয়ে আমার জীবন যে সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, তাতে তাঁদের সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বদলে কিছু পাবও—অর্থ, প্রতিপত্তি, হয়তো মিত্রাকেও পাব। আর পাব একটা কৃত্রিম জীবন।

যদি না নামি, যদি এ সমস্তকে অস্বীকার করে চলে যাই, তা হলে কী পাব জানিনে। কিছুই কি পাব না?

কিন্তু আর ভাববার সময় নেই। গাড়ি এসে এলাহাবাদের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে। কত লোক উঠছে কত নামছে, সেদিকে আমার দৃষ্টি গেল না। আমার শরীরে আর যেন শক্তি নেই, বেঞ্চির সঙ্গে সেঁটে গেছে দুর্বল দেহটা। বড় অসহায় মনে হল নিজেকে, চারিদিকে চেয়ে কোনখান থেকে কোন ভরসা পেলুম না।

দিল্লীতে গাড়ি ছাড়বার আগে স্বাতি যেন কী বলেছিল। মনে আসছে না। কিন্তু কেন মনে আসছে না? ভাল লেগেছিল সেই কথাটি। মনে হয়েছিল, আমার কর্তব্য আমি স্থির করে ফেলেছি, ভবিষ্যতের সমস্যা আমার সরল হয়ে গেছে।

কিন্তু আশ্চর্য। কাজের সময়েই তা ভুলে গেলুম। ডায়েরিতে কেন লিখে রাখলুম না। এমন প্রয়োজনীয় কথা কি কেউ না লিখে রাখে!

বড় কর্কশ শব্দে স্টেশনের ঘণ্টা পড়ল। বাঁশি বাজল। আবার ঘণ্টা, আবার বাঁশি। ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনলুম। এলাহাবাদের আলোকিত প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে ট্রেন আবার অন্ধকারে যাত্রা শুরু করল। একেবারে অন্ধকার নয়। এখানে ওখানে আলো ছড়িয়ে আছে। আলো জ্বলছে নিচের রাস্তায়। রাস্তার লোকচলাচল একেবারে শেষ হয়নি। হঠাৎ মনে হয় আমার হৃৎপিণ্ডটাও একেবারে থেমে যায়নি। অল্পক্ষণের জন্য হয়তো একটু থেমে গিয়েছিল, গাড়ির সঙ্গে সে যন্ত্রটাও এখন চলছে।

শব্দ করে ট্রেন উঠল পুলের ওপর। যমুনার পুল। শেষ পুল যমুনার ওপর। আর একটু এগিয়ে যমুনা গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। কিন্তু আমি কি যমুনার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছি?

জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করলুম। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে যমুনার জলের ওপর। কালিন্দী যমুনা। ধীর মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। কত জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, আমার জানা নেই। আমারও ওপর দিয়ে বইত। আমি কি পালিয়ে আমার প্রাণ বাঁচালুম!

তবে আমি এলাহাবাদের টিকিট কেন কেটেছিলুম? ভয় তো আগেই আমার পাওয়া উচিত ছিল। ভয় পেয়েই যদি পালিয়ে যাব তো আগেই কেন মনস্থির করলুম না!

স্বাতি ঠিকই বলেছিল। নিজের কর্তব্য স্থির করতে বড় দেরী হয় আমার। দিল্লীর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি আপত্তি করেছিলুম: কোথায় দেরী হল?

এর উত্তরে স্বাতি শুধুই হাসল।

ট্রেন ছাড়তে তখন আর দেরী নেই। মামা মামীকে প্রণামটা আমি সেরে নিলুম।

স্বাতি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার কাছে গেলুম। বললুম: তুমি কিছু বলবে না?

স্বাতি হাসল।

হাসি নয়: আমি তাকে বললুম: তোমার কি কিছুই বলবার নেই? কিছু জানবার, কিছু শোনবার—

এর উত্তরেও স্বাতি হাসল। ভারি মিষ্টি হাসি।

আমি তার মুখের দিকে চাইলুম।

গোপালদা: অত্যন্ত অস্পষ্ট ভাবে স্বাতি জবাব দিল: তোমার মন কি কোন কথা দেয়নি আমার কাছে, যে আজ মুখের কথা শোনবার প্রয়োজন হবে!

কি আশ্চর্য! চাওলাও বলেছে এই কথা। এরা কি আমার মনটাও দেখতে পাচ্ছে, না নিজেদের মনের ছায়া দেখছে আমার মনের ওপর!

পুলের ওপর শব্দের তরঙ্গ হল শেষ। কঠিন মাটির ওপর আমরা নেমে এলুম।

আমার মন কি সত্যিই স্বাতিকে কোনও কথা দিয়েছে!